প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক : সানুশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ বালি-দুর্গাপুর
জিলা : হাওড়া

মুদ্রক : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার
২০৪, আচার্য্য শীল লেন
কলকাতা-১

মন এক মন্তর

সায়ন্তনীল-কে

দাদুন

মন-এর কথা

কাজের ধর্মাক্ত জীবন যখন প্রায় শেষ হয়েছে ভাবনার মমাক্ত মরসুম ধীর গতি প্রবেশের সুযোগ পায়। অনেকটাই যেন দিকচক্রবালে অপেক্ষারত নির্ভার অকেজো সাদা মেঘেদের নীল আকাশের প্রশস্ত আঙিনায় হথগতি পদচারণার মতো — শান্ত শারদ আকাশ-আঙিনায়। অথবা পূর্ণকূল ধীর-প্রবাহ নদী-বক্ষে টুকরো-টুকরো ভাসমান গতি-প্রতাক্ষহীন পানাদের মতো — তরাভাদের তরঙ্গ প্রবাহিনীর আদিগন্ত প্রসারে।

সেই সব ভাবনাদের — অনুভাবনাদের — সাজিয়ে গুছিয়ে একত্র করে এই মন এক সময় এরা চাই কাজের শেষে বসে অকাজের, আবার কর্মহীন জীবনারম্ভের শুরুতে বসে বাজে কথার আলপনাও বটে। অকাজের বসে এরা বিরক্ত করলেও বিদ্ধ করতে পারবে না, বাজে বসে এদের বাদ্দিয়ে করে দিতেও বাধা থাকবে না। বাকি রইলো আলপনা-অংশ। চক-পিঁড়ি-অংশ মুছে গেলেও কল্প-অনুভব অংশ যদি মনের আকাশ পায় তাহলে কৃতকৃতার্থ বোধ করব।

আলাদা করে কারো কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম না। কৃতজ্ঞ আমি সকলের কাছে — জীবনের কাছে, প্রত্যেক আপনজনের কাছে, সমস্ত অনাপনদের কাছে। আমার অতীতকে তারা গড়ে দিয়েছে, বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে আর ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে চলেছে। তখনও, এখনও।

অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

॥ ভূমিকা ॥

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য এক বছরের মাথায় আর একবার সাহিত্যের আসরে উপস্থিত একগুচ্ছ গল্পকের সম্ভার সাজিয়ে, 'মন এক মন্তর' গ্রন্থটি এর মধ্যে একটি। এই একটি রমণীয় রচনার সঙ্কলন।

গ্রন্থটিতে সর্বমোট তেত্রিশটি রচনা স্থান পেয়েছে। সবকটি রচনাই মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ বাস্তব-কল্পনা এবং স্ব-বিরোধকে স্পর্শ ক'রে ক'রে পল্লবিত। শত তুচ্ছতা ও উপেক্ষার মধ্যে যে অজস্র ঘটনা ও ভাবনা আমাদের সম্মুখে অনবরত প্রবাহিত, লেখকের রসিক কল্পনা তাদের এক একটিকে অবলম্বন করে রূপরাবণ্য স্নিগ্ধ এক একটি প্রতিমার সৃষ্টি করেছেন। বিষয়বস্তু ও লেখনভঙ্গি অনুসারে লেখাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, রমণীয় বর্ণনা-প্রধান [ট্রেনযাত্রী (লোকাল ও মেল)]; দুই, প্রত্যক্ষ কিন্তু রাষ্ট্রিক সামাজিক বিষয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ [শিক্ষার ভগাই ও অশিক্ষার মাধাই, মন মুখ মুখোস ইত্যাদি]; তিন, অনুভব জগতের গভীর কিছু কথা কৌতুকের সঙ্গে রশ্মি ফেলে পর্যবেক্ষণ [হারানোর ভয়, আমার আমি, আমি তুমি ও সে, মন এক মন্তর ইত্যাদি]। বাকি কিছু রচনা আবার উপরে বর্ণিত একাধিক বিভাগ মিলিয়ে মিশিয়ে। কখনও মৃদু কৌতুকে, কখনও তীক্ষ্ণ-তির্যক কটাক্ষে, কখনও সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্দেশে লেখকের ভাষা সর্বক্ষেত্রেই স্থির-লক্ষ্য, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

পেশায় দর্শনের অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য রচনাগুলির চয়নে দার্শনিক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর যে রাখবেন এটা প্রত্যাশিতই। কিন্তু লেখাগুলি পড়তে পড়তে সব কিছু ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠকের উত্তরণ ঘটে এক মহত্তর অনুভাবনায় যা এ-যুগের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের অন্ধকারকে চিরে চিরে যেন নিয়ে যায়, কোনও ইতিবাচক তাৎপর্যের দিকে, আশান্বিত পাঠকের তখন মনে হতে পারে — সম্ভবতঃ এ-পথেই মিলে যেতে পারে তার জিজ্ঞাসার উত্তর, মেটে যেতে পারে তার আর্তির উপশম।

এ-যুগে সব কিছুই পণ্যের আদলে ক্রীত হবার প্রতিযোগিতায় সামিল। অবিসংবাদিত ক্ষমতার অধিকারী প্রচার-মাধ্যমের কাণ্ডারীদের তাই বিরামহীন ব্যস্ততা। এই সুযোগে তাদের দাক্ষিণ্যের সিংহভাগ কেড়ে নেয় সেইসবের ওপর যেগুলি তাৎক্ষণিক উল্লাসের ঝাউইবাজির মত সহজেই বিকোয়। সৎপ্রচেষ্টার নিরিখে তুলনামূলকভাবে সংকুচিত হয়ে আসা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নাগরিক আসরে আর একটি নতুন সংযোজন পাঠকদের আনন্দ-বর্ধনে সক্ষম হবে আশা রাখি...।

সুনীল আচার্য

সূচীপত্র

আমার আমি ১
General rules the Army ২
অন্যায় যখন ভালো লেগে ৩
আশার বিস্ফোরণ ৫
অ-প্রীতি উপহার ৭
আচ্ছাদনপটী পরাচ্ছাদনপটী ৮
কানকথা ও পরিবেশদূষণ ১০
সুস্থ শিশু ১২
মানুষের সংখ্যা সমস্যা ১৩
জল চাই ১৫
কানকথা পাঁচকথা ১৭
ভয়ভূত ১৮
সুবিধাবাদী ২১
জন-পরিবার ও অ-জনপরিবার ২৩
মা সংসার ২৫
শোষণ ২৭
শিক্ষার জন্যাই অশিক্ষার মাধ্যাই (১) ২৯
শিক্ষার জন্যাই ও অশিক্ষার মাধ্যাই (২) ৩২
বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-শিক্ষার ৩৪
শিশুবিভ্রম ৩৬
বিজ্ঞান-কথা ও কথায় বিজ্ঞান ৩৮
প্রেম ৪১
সহজ কঠিন ৪৩
ট্রেনযাত্রী (লোকাল) ৪৯
ট্রেনযাত্রী (মেল) ৫৬
ঘাম ৬৫
ঘরের টান আর মনের ডাক ৬৮
হারানোর ভয় ৭৫
আমি তুমি ও সে ৭৯
মন এক মন্থর ৯২
মন-মুখ-মুখোশ ৯৪
আমির খোঁজে বিশ্বকে ৯৪
মুখোশের ক্রমবিকাশ ৯৬
সমাজ-সংসার-সভ্যতার অবসান ১০৪
মুখোশের অন্তরালে সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা ১২৩
গণমাধ্যমের নন্দনকাননে ১৩৯
মুখোশের আমি ও আমার মুখোশ ১৪৩
অনুসিদ্ধান্ত ১৪৪

আমার আমি :

ইদানিং একটা বিষম ভাবনায় পড়েছি। ভাবনাটা আমার 'আমি'-কে নিয়ে। জানি যে এই ভাবনাটা আমার একার ব্যাপার নয়, সকলের ব্যাপার। সমস্যা বলে দেখলে এ একটা বিরাট সমস্যা। আর সমস্যা মনে না করলে কোন সমস্যাই নেই। বাতাস থাকাটা কোনও সমস্যা নয়, নিয়ত নিশ্চিত শ্বাস গ্রহণ স্বাভাবিক নিয়মেই অব্যাহত। কিন্তু ওটা বন্ধ হবার উপক্রম হলেই সমস্যাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না — হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে, বুকের বাঁ দিকে হাত চলে যায়। আর তখনই দৌড় পড়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সন্ধানে। 'আমি'-টাও অনেকটা তেমনি। ওটা স্বাভাবিক ভাবেই, প্রাকৃতিক নিয়মেই, এতো পর্যাপ্ত এতো গভীর যে ওই 'আমির' মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাই, 'ওর' থাকাটা কোন সমস্যাই তৈরি করে না। কিন্তু সেই 'আমি'-টি যখন মার খেতে থাকে, শীর্ণ-ক্ষুণ্ণ হতে থাকে, অস্বীকারের প্রহারে জর্জরিত হয়, তখনই বুকের বাঁ দিকে হাত চলে যায়। আমি-টা যখন কমে আসে বা একেবারেই নেই হয়ে যায় তখন টের পাই যে ওই আমি দখল করে করেই পুষ্ট হয়েছি এতোদিন।

'আমি' টা কিন্তু কোনও রবিনসন ক্রুসোর সমস্যা নয়। সমাজ-সংসার থেকে দূরে দ্বীপের একাকিত্বে বসে সে আমির তাপ ও চাপ থেকে মুক্ত। সেখানে গাছ-পালা পাথর-পাহাড় নদী-ঝরনা আছে। কিন্তু তার আসেপাশে কোনও 'আমি' নেই বলে তার নিজের আমি-টা ডাল-পালা ছাড়তে পারছে না। আমরা সকলেই তো আমি-র জঙ্গলে বাস করি। আমি'র বৃক্ষের আড়ালে সমাজ পরিবারের আমি-জঙ্গলটি আমরা দেখতে পাই না। আমার আমি, ছেলের আমি, মেয়ের আমি, স্বামীর আমি, স্ত্রীর আমি,-এই এত সব আমির সতেজ কাণ্ড আর সজীব পত্র-পল্লবের আড়ালে অন্য আমি গুলোর হারিয়ে যাওয়াটা প্রায় স্বাভাবিকই। হারিয়ে যাওয়াটা কোন আমিই পছন্দ করে না। রাজনৈতিক নেতাদের ঘাড়ে এই দোষটা আমরা অনায়াসে চাপিয়ে দিতে চাই বটে কিন্তু আসলে আমরা সকলেই তো সেই গুরুভার বয়ে চলি সারাজীবন, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করি না।

আর এই সদাসতর্ক চেষ্টার বীজের মধ্যেই গৃহ-ভূমিকম্পের অঙ্কুরটি প্রয়োজনীয় তাপ, আর্দ্রতা, আর জীবন-অক্সিজেন পেয়ে যায়। সংসারের নানা সমস্যায় তাপের পারাটি কাঁচের ধমনি বেয়ে বাড়তে থাকে আর্দ্রতা প্রায়শই কাঁচের শ্লেষ্মা আর চোখের জলে রূপ পায় এবং সব শেষে আমির মাত্রাতিরিক্ত পুচ্ছতাড়নায় নাজেহাল পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা একান্ত কোণে ফোঁস ফোঁস করে পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি আর কার্বন ডাই অক্সাইডের বাড়-বাড়ন্ত ঘটায়। আমি'র তাড়না তাই বড় তাড়না।

অফিসে-দপ্তরে, কলে-কারখানায়, জমিতে-খামারে এবং ঘরে-বাইরে, সর্বত্রই এই আমি-র তাড়নায় জীবন পুচ্ছাহত! বড়-আমি ছোট-আমি করে এই আমির জঙ্গলে খই পাওয়া যাবে না। কারণ আপেক্ষিকতার নীতি এখানেও সমান প্রযোজ্য। সব আমিই তাই এক-একটি নিষ্টোস আমি। অন্য সমাজ-সংসারের বৃহৎ বিলিয়ার্ড বোর্ডে এই আমির বল-গুলো ঘুরপাক খায় আর নিজ-নিজ-দেহে ঘষিয়ে ঘষিয়ে পালিশ লাগায়, চক্ চক্ করে ওঠে।

যত পালিশ লাগে তত দামী চেয়ার খোঁজে এই আমি-গুলো। চেয়ার তো ক্ষমতার প্রতিভূ। স্থান চাই, অধিকার চাই। গৃহ-সংসারে, মন্দিরে-মসজিদে, অফিসে-দপ্তরে, বিদ্যালয়ে-কলেজে,

মাঠে-ময়দানে, পাড়াতে-কমিটিতে, সমাজে-রাষ্ট্রে। আমি মানেই চেয়ার, চেয়ার মানেই আমিত্ব সর্বস্ব।

কোনো কারণে যখন এই আমি মেটিয়ে পড়ে, অনেক কারণেই তা হতে পারে, তখনই বাধে মহা গণ্ডগোল। সুস্থ-স্বাভাবিক আমি নিয়ে সহজে ঘর করা যায়, কিন্তু আহত-আমি, ভগ্ন-বিকৃত-আমি, সব সময়েই ভয়াবহ ঘা-পড়-তেড় ঘাপসের মধ্যে তুমা। শরীরের ব্যাধিকে টীকাটুকা ইনজেকশন দিয়ে মিটিও বা নিরাময় করা সম্ভব, মনের আহত-আমির-ব্যাধিকে কোন্ ওষুধে নির্বিষ করা যাবে?

আমার আহত-আমি নিয়ে সারাজীবনই ওষুধের সন্ধান করেছি। পেয়েছি যে সে কথা বলতে পারি না। এখন মেটিয়ে পড়া বুড়ো আমি নিয়ে হয়েছে আমার যত সমস্যা। সমস্যা থাকলে তার সমাধান একদিন না একদিন দেখা দেবেই—এই আশায় দিন গুণে চলেছি। সব রোগের ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে, আমি রোগের ওষুধ হবে না?

The General Rules the Army :

পৃথিবীর ভূমণ্ডলের পরিমাণগত পরিসরকে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল বলে জানা গেছে। আমাদের জ্ঞানের জগতে অনুমান-প্রত্যক্ষের পরিমাণগত বিভাগটি কিন্তু অত সহজে প্রকাশ করা যায় নি। নানা মুনির নানা মত আসর গরম করেই রেখেছে, রাখছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে দেখে-শুনে জেনে-বুঝে এটা সাব্যস্ত করা যায় যে সেখানেও তিন ভাগ অনুমান, একভাগ মাত্র প্রত্যক্ষ। অবশ্য নির্ভেজাল প্রত্যক্ষ বলে কিন্তু আদৌ আছে কিনা সে এক সন্দেহের বিষয়। সব প্রত্যক্ষের সঙ্গেই তো গোয়ালার দুধের মতো, কিঞ্চিদধিক অনুমান-জ্ঞানের-অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের-মিশ্রণ থেকেই যায়। থেকে যে যায় তার সবথেকে বড় প্রমাণটি লুকিয়ে থাকে 'ভুল করেছি'-র অনুশোচনা হয়ে ভবিষ্যতের 'প্রত্যক্ষ' বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে। দেখে-শুনেই তো যা করার তা করে থাকি, কিন্তু তবুও 'কি ভুলই তখন করেছি' বলে আক্ষেপ করি কেন? চোখের কামেরায় যা দেখেছি বা কানের 'কর্ক্লিয়ায়' যা শুনেছি তার তো কোনও ইতর বিশেষ হবার কথা নয়! [একমাত্র ব্যতিক্রম 'কানেদেখা'-র বেলায়।] তবে সেই দেখা-শোনার কোন্ অংশের জন্যে বিরক্তি-অনুতাপ? অনুমান অংশের জন্যে নয় কি?

যুক্তি শাস্ত্রে বা ন্যায় শাস্ত্রে বহুবিধ দোষের খতিয়ান সবিস্তারে দেওয়া আছে। অনুমান করতে বসে এই সব দোষ আমাদের আক্রমণ করে। তাদের স্বতন্ত্র নামকরণও সেই সেই শাস্ত্রে উল্লেখ করে দিয়ে থাকে। আমরা, যারা সাধারণজন, তাদের অত নামে কোনও দরকার পড়ে না। সত্যেমিথ্যার দুধ ছেঁকা হিসেবকে আমরা ওঁদের মতো পাঁচাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র পর্যন্ত পড়াতে দিতে রাজি নই, যদিও কখনও-সখনও সত্য-মিথ্যার চেনা-রেখাটিকে 'সন্দেহজনক'-এর ডাইমেনশন দিতে রাজি হতেও পারি। কিন্তু সন্দেহ বড়পাকটা জীবনের চলার পথে বাঁধার মতো ঠাকে বলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাকে সুদূরে সরিয়ে দিয়ে সত্য-মিথ্যার দ্বৈত-ভূমিতেই বিচরণ করতে পছন্দ করি। [যদিচ বুদ্ধিশাস্ত্রে, দর্শনবিজ্ঞানে সেই সন্দেহ-কেই সুদূরে যথাসম্ভব আঁকড়ে থাকার প্রবণতা সর্বাধিক, তখনেই ওঁদের জীবন-কাঠি-মরণ-কাঠি।]

তাই the General rules the Army ইত্যাদি অনুমানে নৈয়ায়িক তর্জনী উত্তোলন করে সোজাকে সিধে করে বসালেন। কিন্তু আমার সবিস্তারে এবং শত শত উদাহরণে প্রত্যক্ষ জানি যে

the wife rules the General কতো অকাট্য সত্য! এবং সেই অনুমানের সিদ্ধান্তটি therefore the wife rules the Army প্রায় ব্যতিক্রমহীন বাস্তব সত্য। ঐ general -এর গৃহ-বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ হয় গৃহে অনুপস্থিতি করে আর হাউনিতে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার অধিকাংশই পরিচালিত হয় গৃহের চোখে-কাণে-অনুভবে প্রভাবিত হয়ে। গৃহে তিনি রাজার মতো দেখেন-শোনেন-জানেন, গৃহিনীর মুখেন-কর্ণেন-চক্ষুসা; গৃহে তিনি গৃহিনীর projector-এ passive দর্শক। আমরা সকলেই এক একজন General. Army আমাদের গৃহ-পরিবার-পরিজন। আমাদের পোশাকে-আশাকে মেজেন-রিবনের ঝকঝকে তকমা-আঁটা। পুরুষ শাসিত সমাজের শিরোপা-আঁটা পাগড়ি-মাথায় আমরা এক এক জন গৃহ-দারোয়ান মাত্র! সারাদিন মাঠে ফসলের আরাধনা করে বাড়ি ফিরে দিনান্ত অনুপস্থিতি-সময়ের মাবতীয় গার্হস্থ্য-জ্ঞান আমরা wife-এর কাছে সংগ্রহ করি, কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সেরে ডিগ্রি-অক্সফোর্ড থেকে Degree সংগ্রহ করে, সর্বভারতীয় পরীক্ষার বেড়াজাল পার হয়ে দপ্তরের তকমা ছাতিতে টান টান ঝুলিয়ে আমরা যখন দিনান্তে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করি তখন আসলে আমরা গৃহ-দ্বারে পাহারায় বসি মাত্র।

বসি এবং সিদ্ধান্ত টাকি! Computer-এ যেমন তথ্য feed করানো হয়, আমাদের মনেও তেমনি তথ্য feed করানো হয়। গৃহে আমরা অনিবার্য ভাবেই আট-দশ-বারো ঘণ্টা অনুপস্থিত থাকি। সেই সময়ের 'Army'-বিষয়ক মাবতীয় তথ্য গৃহিনীর প্রত্যক্ষে থাকে। আমরা 'প্রকৃতির' স্বভাব-সিদ্ধ 'মিচরী-পানা'-র সহযোগে সেই প্রত্যক্ষ-সমূহকে 'না-চিবিয়েই' নাড়াচাড়া করে নিজ-নিজ saliva ছাড়াই গলধঃ করি, পুরুষ computer-এ ভরে নেই এবং ঘোঁকে-মোচড় দিয়ে সিদ্ধান্ত টাকি! অন্য কেউই নয় আমরা নিজে নিজেই যেন এক একটি robot বনে যাই। তাহলে? The wife rules the Army-সিদ্ধান্তে দোষ কোথায়?

দু-একজন তার্কিক বলে বসবেন: যে সব গৃহিনীরাও আট-দশ ঘণ্টা স্কুলে-কলেজে অফিসে-কাছারিতে কাটান তাদের ক্ষেত্রে feeding-bottle টি কোথায়? তাঁরাও তো অনুপস্থিত থাকেন? দুটি কথায় শেষ হবে মনে হয়। এক, পুরুষদের পকেটে কোথাও 'আহারী' পোষ মানে কী? গৃহিনীদের অবশ্যই পোষা থাকে। তারা হাত চালায় দ্রুত, চোখ ঘোরায় দ্রুততর তালে। মালকিন এলে মুখ খোলে! দুই, আমের অনুচ্ছেদের '' চিহ্নগুলো তবে কেন দিয়েছি! সাংখ্য দর্শনে যেমন জীবন-দর্শনেও তেমনি পুরুষ নিষ্ক্রিয়, ভোক্তা মাত্র, প্রকৃতিই সক্রিয়, ছলা কলায় পারঙ্গম, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মক এবং Freud অন্তর্নিহিতবিস্তারেন!

সংসারের stage-এ পুতুলের নড়চড়াই প্রত্যক্ষ, দৃশ্যমান। সুতোর খবর প্রকাশ্য নয়। প্রকাশ যোগ্যই নয় কারণ সে ক্ষেত্রে 'পাঁচালি' অশুদ্ধ হয়ে যাবার সমূহ ভয় থাকে যে! তাই প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ, অনুমানও প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়, প্রকাশ পায়।

General শুদ্ধ Army ruled হবে wife-সুতোয় — এই তো পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের বিধি-লিপি। যে সেই সুতোয় 'নড়ে না' তাকে, পরের সেই একজনের মতো, নেড়ে দেখুন। প্রাণ আছে কি?

অভাব যখন আলো দেয়:

জীবনে দুটি সত্য চিরন্তন। জন্ম আর মৃত্যু। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি অনিবার্য জড়িত।

সমাজের বাবধান ব্যক্তি নির্ভর, বংশগতির গুণ-লক্ষণ-বাহী ডি. এন. এ নির্ভর, জীবন-যাপন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নির্ভর হলেও সকল জীবনই একটা সময়ান্তে অন্ত যেতে বাধ্য। প্রাণ বা আত্মা, নিজের স্বল্প-বা-দীর্ঘ দিনের নিত্য সঙ্গী, প্রাণের চাইতে প্রিয় দেহখানিকে জীর্ণ-বসনের মতো অকাতরে বা সকাতরে পরিত্যাগ করে কোথায় কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় ফেলে রেখে যায়। চির বিদায়।

মৃত্যু কি এবং কেন, মৃত্যুর পরে কি আছে বা মৃত্যু কি দেহের না আত্মার না উভয়েরই-এই সব জটিল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বিষয় আমার বুদ্ধির অগম্য, আমার কল্পনেও অসম্ভব। অতি সাধারণ দৈনন্দিন চেতনায় যা আমরা সকলেই বুঝি তা এই যে মৃত্যু একটা অভাব সৃষ্টি করে। একটা চির-অভাব। এবং এও বুঝি যে এই অভাবটা কোনও নেতিবাচক শূন্যতা নয়, অস্তিত্ব দ্যোতক অভাব-উপস্থিতি। এই অনুভবের সত্যটুকু, এই যে চলে গিয়েও থেকে যাওয়ার ব্যক্তিগত তাৎপর্য-টি এবং, সামাজিকভাবে, মৃত্যুর উপলব্ধিটুকু ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপস্থিত থাকে, তাকে নিয়েই আমার ভাবনা, আমার বিচার।

আমরা যারা বেঁচে থাকি তারা তো প্রতিদিনের পথ কাজে আর সহস্র প্রকারের মধ্যে থেকেই মানি। প্রতিনিয়তই থেকে যাচ্ছি। এবং আমাদের বেশিরভাগ অংশই এই থেকে-যাওয়াটাকে প্রমাণ করি 'নেই' হয়ে যাওয়াটাকে অপ্রমাণ করে। আমরা যে আছি তার একটিই কারণ। আমরা প্রথাসিদ্ধ মতে মৃত বলে ঘোষিত হয়ে যাই নি। অন্য ভাবেও এই সত্য, এই বেঁচে থাকার সত্যটি-প্রমাণিত হয়। আমরা অনেকেই পরিবারের, সমাজের, ও স্বজন পরিজনের কাছে মূর্তিমান উপদ্রবের মতো, সাক্ষাৎ বিরক্তির মতো, সামনা-সামনি দুশ্চিন্তার মতো প্রতিভাত। অনেকের কাছেই আমরা অনেকেই 'কেন মরল হয় না' গোছের একটা বিস্ময় হয়ে বেঁচে থাকি। আর সেখানেই আমাদের 'বেঁচে আছি'-র প্রমাণটিও সোচ্চারে ঘোষিত। আর অনেকের কাছেই বা বলি কেন? অধিকাংশ অনেকেই নিজের কাছেই তো অনেক সময় এই 'কেন মরল হয় না?'-র জীবন বাঁচি!

এই যে বেঁচে মরে থাকা এর না আছে কোনও বয়স না আছে সময় অসময়। আবার এই জীবকুলের গতানুগতিক প্রবাহে সম্পর্কও কোন নিয়ামক নয়—মাতা-কন্যা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী। দিন যাপনের গ্লানি, প্রাণ ধারণের কায়-ক্লেশ নখদন্ত সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা-প্রতিহিংসা, অভাব-অনটন, অন্যায়-মার, চাকরি, ইন্টাই-এক-আউই-ক্লোজার, এবং হাজারো সামাজিক-অসামাজিক পীড়ন, ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদির সহস্র ধারা আমাদের দৈনন্দিন 'আছি'-টাকেই 'কে-আর-আছি!' করে দেয়।

এ-সব ক্ষেত্রে আমরা থেকেও 'নেই' হয়ে যাই। কিন্তু এর উল্টোটা যখন ঘটে তখন অভাবটুকুই জীবন্ত উপস্থিতি বলে মনে হয়: 'সে যদি থাকত!', 'অমুক থাকলে এমনটি হত না', 'আজ বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে'-ইত্যাদি স্মরণ তো যাঁরা নেই তাঁদের অভাবটাকেই জাগ্রত উপস্থিতিতে চেনে আনা, সম্মানিত করা। যাঁরা চলে গিয়েও সরে যান না, বার বার মনের দ্বারে হানা দেন, তাঁরা 'নেই' হয়ে গিয়েও তো 'থেকে' যান। মৃত্যুতেও অমৃতের স্বাদটুকু রেখে যান। এঁরা আমাদের পরম আপনজনের দলে পড়েন। এই অমৃত-পথিকদের বেলাতেও সম্পর্ক কোনও নিয়ামক নয় — মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, নেতা-ভ্রাতা, কবি-সাহিত্যিক, গুরু-পুরোহিত। আমাদের

মন্ত্রণাকাতর অনুভবে ঐরা আশার বাণী বয়ে আনেন, বিগত বর্তমানকে ভবিষ্যৎ-মুখী করে তোলেন, অবশ মনে বল সঞ্চার করেন। দূরে চলে গিয়েও ঐরা কাছের হয়ে বেঁচে থাকেন, মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েও ঐরা আলোর রোশনাইটুকু ধরে রাখেন। ঐদের অভাবটুকুই যেন বেশি করে ঐদের উপস্থিতিকে সজীব করে তোলে।

বর্তমানের বাঁচাতলোকে তো আমরা সকলেই অতীত করে চলেছি। সেই অতীত যদি সামনের জন্যে কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, ভবিষ্যৎ হয়ে হাজির হতে পারে, তাহলেই বাঁচাটুকু সত্যি হয়। এটা মানুষের অধিকারের মধ্যেই পড়ে, জনম-মরণের জান্তব জীবনের এলাকায় পড়ে না।

ব্যক্তি-সম্পর্কে, পরিবার বৃত্তে, সমাজের পটভূমিতে যাঁরা পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেন তাঁরাই তাঁদের অভাবটুকুকে অভাবের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারেন। অন্যথা মৃত্যুতেই নির্মম ছেদ চিরস্থায়ী।

আশার বিস্ফোরণ :

কবি আশাকে কুহকিনী বলেছেন। খুবই সত্যিকথা বলেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ কথাটি বলেন নি। কারণ বোধহয় এই যে কবিদের 'সত্য ভাষণের' দায় থাকে না, অনুভবের সুন্দরকে মনোমুগ্ধকর ছন্দ-বদ্ধ প্রকাশের প্রেরণা থাকে মাত্র। সেই সুন্দর বেদনার রসে আপ্লুত অথবা বিষাদের সুরে ঝংকৃত হতে পারে, একার উপলব্ধিকে বহুজনের করে ঝরাতে পারে অথবা বহুজনের অনুভবকে সর্বজনের করে চিরায়ত করতেও পারে। সেই কাব্যের সুন্দর, বেদনার বা বিষাদের সুন্দর, বাস্তব জীবনের সুন্দর থেকে একেবারেই আলাদা।

বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন বসন-বরণে সুন্দর কতোটা স্থান জুড়ে থাকে আর অসুন্দরের বস্তুতান্ত্রিক মোটাদাগের সুতোর টানাপোড়েন কতোটা ক্ষেত্র অধিকার করে থাকে তা যাঁরা প্রতিনিয়ত নিজেরাই নাকু হয়ে বুনে চলেছেন তাঁরাই জানেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এক একটি আশা-মুখ নাকু। আমরা পেটের অন্দরে বস্তুজগতের ক্ষিদে নিয়ে আশার সুতোটি মুখের সামনে তীর-চিহ্ন করে আগু-পিছু ছোটা ছুটি করি। সারা জীবনই করি। আশা আমাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র, কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি, ভবিষ্যতের কুহু-ডাক। এ-বিষয় কবির সঙ্গে আমরা একমত। এটা সত্যও বটে সুন্দরও বটে।

কবি কিন্তু আশার কথাটা বলেন নি, বলেন নি বিষয়ীর মনের ভারসাম্যহীন অবস্থার কথা। "অতি-আশা সর্বনাশা"। এই আতিশয্যতা শুধু পরিমাণগতই নয় গুণগত ভাবেও বুঝতে হবে। অতি-আশা অনায়াসেই আমাদের অনেককেই phantasy-র জগতে ঘুরপাক খাওয়াতে পারে, চাই কি, ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে 'রাঢ়ীর' রাস্তা প্রশস্ত করে তুলতে পারে, তুলেও থাকে। তখন সর্বনাশের আর বাকি থাকে কি? সেই অবস্থার একমাত্র redeeming feature এই যে সর্বনাশকে নাশক বলে মনে করার মতো অবস্থাও থাকে না, আবার নতুন কোনও সচেতন আশারও কুঁড়ি ফোটে না। সবই মিটে যায়।

সেই অনির্বচনীয় 'সুখ' সকলের 'ভাগ্যে' জোটে না তাই আশা নিয়ে আশৈশব সকলেরই দুঃখের আর শেষ নেই, শেষ থাকে না। দৈহিক পীড়ন-বেদনা, জরা-মরণ-ইত্যাদি নিয়ে ঘর করা

অনিবার্য, এবং তার জন্যে, সে সবের জন্যে, বহুবিধ উপচারের ব্যবস্থাও আছে, যা অনায়াসে প্রাপ্য। আশার পীড়ন মর্মান্তিকতার নায়ক এবং তার কোন উপচার অনায়াসে প্রাপ্য নয়। তাই বিষাক্ত আশা চিত্ত পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়। সে বিষাক্তই করে না, বিপন্নও করে তোলে। আশা কেবলমাত্র মননের দিকেই তার তীরচিহ্নটি নির্দিষ্ট করে রাখে না, সে ভিতরের দিকেও তার আঘাত-মুখটিকে ঘুরিয়ে ধরে। আঘাত বিস্ফোরণের মাত্রা পেয়ে মৃত্যুমন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠতে পারে, অনেকের জীবনে উঠেও থাকে। তাই আশা সম্মুখ-দৃষ্টিও বটে, পশ্চাৎ-আঘাতও বটে।

আশায় বাঁচে চাষা। তবে চাষা মরে কিসে? আর কেবলমাত্র 'চাষা'-ই কেন? শিশু তার মায়ের আশায় বাঁচে না? যুবক চাকরির আশায়, তার result-এর আশায়, ব্যবসায়ী মুনাফার আশায়, মা-বাবা সন্তানের আশায়, 'বড়বাবু' উন্নতির আশায় আর বৃদ্ধ দীর্ঘজীবনের আশায়? কাসিনোর চক্র-ব্যূহে অথবা লটারির কাউন্টার-কয়েন বুকে নিয়ে আকাশ-কুসুম-দৃষ্টি আমাদের ভিড় কি দিন দিন বেড়েই চলেছে না? ঘোড়ার খুরের দ্রুত ধাবমান শব্দ কি আমাদের অনেকের হৃদয়ে দ্রুততম ওঠা-পড়ার কারণ ঘটায় না? আমরা শাস্ত হই সর্বস্বান্ত হয়ে, ধ্বংস গিয়ে বৃদ্ধ-জীবন যাপন করি, অদৃষ্টে করাঘাত করে গৃহ-কারাগারে দেহবন্দিশালায় নিজেদের বন্দি করে রাখি, আশাকে কবরে পাঠাই।

আশার সঙ্গে প্রত্যাশা ওতপ্রোত জড়িত। পুত্র-কন্যা মায়ের কাছে আশা করে, মা প্রত্যাশা করেন। স্বামী স্ত্রীর কাছে এবং স্ত্রী স্বামীর কাছে কিছু-থেকে-অনেক-কিছু আশা করেন, প্রত্যাশাও করেন। তেমনি বন্ধুর কাছে বন্ধু, ভাই-এর কাছে ভাই, প্রতিবেশীর কাছে প্রতিবেশী। এমন কি ট্রেনে-ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, আশা-প্রত্যাশার তাপ সৃষ্টিকারী বৃত্ত-থেকে-বৃত্তান্তর আবর্তনের শিখাগুলি এক মন থেকে অন্য মনে অহরহই ছুটো ছুটি করে তাপকে উত্তাপে, উত্তাপকে অগ্নিকাণ্ডে এবং অগ্নিকাণ্ডকে বিস্ফোরণের দিকে নিয়ে চলেছে। আর তাই আশার মৃত্যুমুখ মানুষ চলনে বাস্তব জীবনের বহু বয়নে যে আস্তরণ তৈরি হচ্ছে তাতে সত্যতার অন্তরালটি শতছিন্ন হয়েই দেখা দিচ্ছে। প্রত্যয় না হয় ঘর থেকে দুই পা ফেলে একবার দেখুনই না কি দশা ধরা পড়ে — বাজারে, ট্রেনে, শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশনে আর কলকাতার যাবতীয় চলার পথের পথে-পথে।

এখানেই বিষয়-বিষয়ী-কথার তাৎপর্য। মনের মধ্যে শত-শত আশার বীজ স্বতঃই অঙ্কুরিত হয়ে চলে। যার যার আশা তো সম্পূর্ণই তার তার একেবারেই নিজের ব্যাপার, একেবারে Private এবং Subjective. কিন্তু বিষয়ীর মনের একান্ত গভীরে উৎসারিত হয়েও প্রত্যাশার কেন্দ্রটিকে কিন্তু আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বসি। গোল বাধে সেখানেই এবং তৎক্ষণাৎ। অন্যের মনের গভীরে যে আশার অঙ্কুর, যে প্রত্যাশার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-পরিসর, তার দিকে দৃষ্টি দেবার মতো চোখ কোথায় আমাদের? নিজেকে নিয়ে বাস্ত আমরা অপরের আশা-প্রত্যাশায় একেবারেই ভাবিত নই। তাই বিষয়ী-বিষয়ে আশার অনিবার্য পীড়নে অগ্ন্যুৎপাত-বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদেরও বিপন্ন করি অপরকেও তো সেই আগুনে পুড়িয়ে মারি।

Extinguisher কোথায় পাবো? আশার বীজের অন্তরে যে DNA RNA আছে তাদের যদি বীজতার আর জলতার Cylinder এ সুরক্ষিত রাখা যায়?

অ-প্রীতি-উপহার ঃ

প্রীতির সঙ্গে অপরকে কোনও কিছু দেওয়াকে উপহার বলা হয়। প্রীতি একটি অনুভবযোগ্য মানসিক বিষয়, উপহার বা দ্রব্যসামগ্রী অবশ্যই দৃশ্যমান। প্রীতিপূর্বক দান কর্মকাণ্ডে প্রীতি অবশ্যই দানের prefix, কোনও উপসর্গ নয়, প্রাক্-প্রেরণা মাত্র, উত্তরান্ত শব্দার্থকে অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্যে নয়। কিন্তু 'উপহার' ব্যাপারটি সামাজিকতার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারায় কেমন ধীরে ধীরে নিশ্চিত 'উপসর্গ' হয়ে দেখা দিল তার ইতিহাস আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে এ-কথা অবশ্যই জানি যে উপঢৌকন থেকে ধাপে ধাপে 'সওগাত', 'ভেট' হয়ে একদিন প্রীতি-উপহারের সোনা-জল ছাপ থেকে মুক্ত হয়ে 'উপহার' আমাদের বর্তমান বেসমান জীবনে একটি উপসর্গ হয়েই দেখা দিয়েছে। উচ্চবিত্ত সমাজে যা ছিল উপঢৌকন তা সর্বজনবাঞ্ছিত হয়ে লাল জরোয়া-মসলিনের আড়ালকে চোখ-ঝলসানো করে, নতমস্তক দানকারী থেকে উন্নীত-উন্নত উপহারের দ্বারে পৌঁছোতো। সে ছিল রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার, সম্রাট-বাদশাদের অধিকার। সেই পর্যায়ে দাতা-গ্রহীতার নিম্ন-উচ্চ শির-সম্পর্কটি দ্রব্যসম্ভারের গুণ-পরিমাণ নির্ধারণ করে দিত।

বিশেষ কৃষ্টির বাতাবরণে সওগাতের চলন ছিল স্বাভাবিক। এটা তা-বড় তা-বড় সমাজ-প্রধান থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত প্রকরণে সমান সচল ছিল। ভেট-এর রীতিটি বহু-প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজে ইংরেজদের কৃষ্টির আওয়াজ যেন ভেট-কে প্রায় সর্বজনীন করে তুলেছিল। বিশেষ বিশেষ দিনে বা অনুষ্ঠানে ভেট-প্রদান যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

আমরা যে উপহারের বিষয়ে ভাবিত তা নিরন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দান। মধ্যবিত্ত সমাজ সব সমাজেরই মূল ধারা, মূল ভাবের ধারক, এবং মূল ধারণার ভক্তি-বাহক। তাই দেখতে পাই উপঢৌকনের মোড়ক, সওগাতের সহবত, ভেট-পর্বের বারোমাসে-তেরো-পার্বণ-মানসিকতার সবই কেমন এক স্রোতে এসে উপহারের মোহনাতে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। উপঢৌকনের নত-গ্রীব ভঙ্গিটি বাদ গেছে, সওগাতের অন্তরঙ্গ-অনুভবটুকু ছাঁটাই হয়ে গেছে আর ভেট-পর্বের জো-হুজুর লাজুক-লাজুক ভাবটাও বেমালুম উবে গেছে। যোগ-বিয়োগ করে, কাট-ছাঁট করে, অভিব্যক্তির মধ্যবিত্ত উত্তরণটি প্রীতি-উপহার হয়ে জন্মদিনে-উপনয়নে, বিবাহে-বৌভাতে এবং বহুতর 'সাল-গিরা'-য় সহাস্য হাসিরা দিচ্ছে।

সহাস্য বটেই, তবে সেই হাসিটি ঘন কালো মেঘের পাশের আলোর কারিকুরি কিনা তা সঠিক বুঝে ওঠা ভার। কোনও মাসে একাধিক উপহারের সনদ বয়ে envelope গুলো যখন একে একে মাসান্ত ঘড়ায়-তোলা-জলের সীমিত আয়ের ভঙ্গুর দেহখানিকে আঘাত করতে থাকে তখন মুখে হাসিটি অনেক মূল্যে আটকে রাখতে হয়। এই অনেক মূল্যের মধ্যেও আবার প্রধান হয়ে দেখাদেয় যদি envelope বাহিত সনদটি স্ত্রীর সম্পর্কের দিক-নির্দেশ করে। অর্ধাঙ্গিনীর প্রীতিভাজনের জন্যে উপহারের মূল্য ও মর্যাদা নিরপেক্ষ বা আয়-অপেক্ষ থাকে না, ব্যক্তি-সাপেক্ষ হয়ে দেখা দেয়। উপসর্গ আর কাকে বলে তাহলে?

সাধারণভাবে বলা যায় যে মধ্যবিত্ত সমাজে উপহারের প্রীতি অংশ অনেক দিন হল উঠে গেছে; এখন তাই সকলেই 'উপহার' ক্রয় করেন, বহন করেন এবং প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, উপহার এখন

এমন একটি অস্ত্র হয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সমাজদেহে চলাচল করছে যা দ্বি-ধার — মেতেও কাটে আসতেও কাটে — শাঁখের করাত। একে উপহার ফেরতে চাইলেও ওপড়ানো যায় না, নিজতে গেলে রক্তক্ষরণ ঘটে। কেন? তাই তবে বলি।

প্রীতি-উপহারের প্রীতি-দেহে মনের আনন্দের দিকটি, অন্তরের অভিজ্ঞানের প্রাপ্তিটি হেঁটে গিয়ে ব্যবসায়িক investment-বোধটি জায়গা জুড়ে বসে আছে। এখন উপহার-দ্রব্য ক্রয় করার সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ আনন্দের কথা ভাবিনা, প্রাপকের ঠিকানা — মান-সম্মান-অর্থকৌলিন্য বিচার করি। দাতার মনোবাঞ্ছার চাইতে গ্রহীতার মূল্য-মূল্যায়ন প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া, আমার বাড়িতে-পরিবারে যখন অনুরূপ অনুষ্ঠান হবে তখন আজকের গ্রহীতা হয়ে দাঁড়াবেন দাতা। তাই ভবিষ্যতের speculation অনিবার্য ছায়া ফেলে। তৃতীয়ত, আমরা অনেকেই তো নিমন্ত্রিত তালিকা লিপিবদ্ধ করার সময়ে, সাধারণভাবে মনে মনে, কিন্তু একত্রে স্বামীস্ত্রীতে নিরিবিলিতে প্রাপ্য তালিকার একটা কাল্পনিক হিসেব নিকেশ করে ফেলি! রক্তহীন মধ্যবিত্ত পরিবার-দেহ থেকে যতখানি রক্ত অনুষ্ঠান-সমাপনে ঝরে যাবে তার সঙ্গে প্রতিতুলনা করি কতখানি 'বেনো'-রক্ত ঘরে ঢুকবে তার।

এই যে প্রতিতুলনার প্রতিবর্ত হিসেব নিকেশ এ-থেকে মুক্তির পথ আমাদের নেই। কারণ মাঝপথে উপহারের স্রোতধারাটি যদি নীতিগত সিদ্ধান্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে একটা মুদিখানাকে হঠাৎই বন্ধ করে দিয়ে বাজারে ছড়ানো ধার-দেনা হাতছাড়া করার মতো সর্বনেশে ব্যাপার হবে না? কতো জনকেই তো কতো উপহার invest করা হয়ে আছে, এখন যদি দোকান বন্ধ করে দিয়ে বলি 'আর না' 'অনুষ্ঠান ঘরোয়া করবো', 'উপহার নেবো না' — তাহলে লোকসানের একশেষ হবে না? তাই উপহার চলছে, চলবে। দোকান চললেই একদিন বাজারের ধার উঠে আসবে, আসবেই।

কিন্তু ততদিনে যে আরও ধার পড়ে যাবে? Investment বেড়ে যাবে? উপহারের debit-credit হিসেবে আমরা কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না—অঙ্কের ভাল করা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না। আর জীবন কোন দার্শনিক বিষয় নয়, নখে-দন্তে বেঁচে থাকা সংগ্রামের নাম। তাই নীতি বা যাথার্থ, ঔচিত্য বা যোগ্যযোগ্যতা মুনি-ঋষি-বৃদ্ধদের বিচারের বিষয় হতে পারে, জীবন-যৌবন-ধন-মান নিয়ে যে অবস্থান সেখানে নৈব নৈব চ।

আত্মনেপদী-পরস্মৈপদী :

আমরা সারাজীবনই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অহম্-এর মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় অবস্থান বিন্দু। মাঝে-মধ্যে আমরা সকলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাইরে বিচরণ করি কিন্তু কখনই সেই মূল আত্ম-বিন্দুটির গৃহকোণকে ভুলি না। আমাদের শৈশব তাই কখনই প্রায় কাটতে চায় না। শিশুর যেমন মায়ের আঁচলটুকু সব পাওয়ার শেষ পাওয়া, সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি, আমাদেরও তেমনি ওই অহম্-বিন্দুটি, আত্ম-কেন্দ্র-টি।

শিশু তার সুদীর্ঘ জীবনে তিনবার আঁচল পাল্টায়। 'আঁচল' এই জন্যে যে প্রত্যেকবারই একটি নারীকে কেন্দ্র করে সে নিজেকে মেলে। শৈশবে মা, যৌবনে স্ত্রী এবং বার্ধক্যে বধূমাতা বা কন্যা।

না, পুরুষ-পক্ষপাতের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না, কন্যারূপে-রা শৈশবে মা, যৌবনে স্ত্রী-থেকে-মা-হয়ে এবং বার্ধক্যে পরিবারের কেন্দ্র-অক্ষটি হয়ে নিজ-নিজ অস্তিত্বের কেন্দ্রমুখটিকে সজীব সেচন দেয় আর আঁচলটি করে কাছে টানে, পুত্রকে-কন্যাকে, স্বামীকে-শ্বশুরকে। পুরুষরা বাইরে যায় আর ফিরে ফিরে আসে গৃহকোণের স্বস্তিতে। সেই খানেই সে তার অহম্-এর তৃপ্তি খুঁজে নেয় নিজের মতো করে। নারীদের জগৎ সেই গৃহকোণটিকে আত্মসাৎ করে, আত্মতৃপ্তিতে। একজন অপরের আঁচলে নিজেকে খোঁজে, অন্যজন নিজের আঁচলেই অহম্-কে খুঁজে পায়।

আমরা জীবনের উষাকাল থেকেই শুরু করি সংগ্রহ করতে। পুতুল-মার্বেল দিয়ে যে সংগ্রহ-যাত্রার শুরু তা শেষ পর্যন্ত গাড়ি-বাড়িতে দিবা-দ্বিপ্রহরের আলো পায়। স্তূপাকৃতি সেই সংগ্রহশালার কেন্দ্র বিন্দুটিতে থেকেই আমরা পরিধি পরিমাপ করতে তখনও ব্যস্ত থাকি। এখানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। অহম্-এর বেলুনটির ঘেরাটোপে নিজ-নিজ সম্পন্ন-সংগ্রহের বর্ণসুষমা দেখতে দেখতে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলি আর অপরের সংগ্রহের প্রতি-তুলনায় সেই বেলুনে চাপ-শক্তির যোগানটি অব্যাহত রাখি। আত্মনেপদী অবস্থানের এটাই শেষ ঘাঁটি কারণ এর পরেই শুরু হয় পরস্মৈপদী যাত্রা। সারা জীবনের স্তূপাকৃতি সংগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন মনে হবে কি করা যায় এই স্তূপকে নিয়ে? এ-এক বিষম দ্বন্দ্ব। কূল-কিনারাহীন। সংগ্রহের স্তূপের পাশাপাশি তখন শূন্যতার গহ্বর দেখা দিতে থাকে যে।

সর্বহারা গোলাপী তার সারাজীবনের সংগ্রহকে একটি ছিন্ন-মলিন কাপড়ের বোচকা করে সর্বক্ষণ আগলে বেড়াল। তার পর একদিন সে তার 'সকল' আগলা ফেলে রেখে চোখ বন্ধ করল। অথবা, শহরের পথপ্রান্তে আকাশ-ছাদ আজীবন-গৃহে (!) ভিক্ষাবৃত্তির সমস্ত সম্বল সন্তর্পণে রক্ষা করে, লক্ষ টাকার স্তূপে মাথাটি রেখে, ভিখারীটি যখন মুষ্টি আলগা করে পড়ে রইল, তখন তার শীর্ণ দেহ কোটরাগত চোখ, তার সম্পন্নতায় ধিককার ধ্বনিটি হয়েই দেখা দেয় না কি? নরেনবাবু উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দেহের প্রতিবিন্দু রক্ত-ঘাম আর মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্থান-পতনকে একাগ্র করে ইঁট-কাঠ-সিমেন্টের ভাষায় রূপান্তর করলেন। ছেলে-পড়া বেলায় প্রাসাদোপম বাসস্থানটির মধ্যে অহম্-এর পূর্ণ-অনুভবে সমৃদ্ধ হয়ে হঠাৎই একদিন দেখলেন ছেলে-মেয়েরা যে-যার অহম্-এর তাড়নায় নরেনবাবুর মতোই স্বতন্ত্র সংগ্রহের বেদিমূলে নিবেদিত-প্রাণ। তখন তিনিও, গোলাপী-ভিখারীর মতো, শূন্য কক্ষ থেকে শূন্য কক্ষে মাথাখাকে অন্ধের মতো হাতড়িয়ে ফিরছেন। বাসস্থান নির্জন শূন্যস্থান, ঘরের বাতাস তখন আর অক্সিজেনের যোগান না দিয়ে হাহাকারের দীর্ঘশ্বাস ছড়াচ্ছে। তাহলে?

আত্মনেপদী জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় তাহলে হঠাৎই একদিন অর্থহীন সংগ্রহ মত্ততায় কেটে গেল বলে মনে হবে না কি? পরস্মৈপদী হবার মতো সময় আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তখন? আর তখন তড়িঘড়ি করতে গিয়ে, ভুলের পর ভুল করে সেই ভুলের স্তূপের আড়ালে হারিয়ে যাবো না তো? তখন নিজ নিজ অহম্-এর বদলে স্ব-স্ব অদৃষ্টকে খুঁজে নেবো কাকুতি করার জন্যে, ঈশ্বরের সন্ধানে মঠে-মন্দিরে অন্বেষণ চালাব কৃতকর্মের দায়ভাগ স্থাপন করার মতো কক্ষের সন্ধানে, অথবা পুত্র-কন্যাদের স্বার্থান্ধ অহম্-কেন্দ্রিক মানসিকতাকে দোষ দেবো গৃহের শূন্যতাকে বন্ধ্যা করার জন্য।

চোখ বন্ধ করার আগে, মুষ্টিকে চির-আলগা করে দেবার আগে, আর সংগ্রহ-কক্ষের শূন্যতায়

হাহাকার শুনিত হবার পূর্বেই অহম্-এর বদলে নিজ নিজ চিত্তটিকে সচেতন করে তুললে কেমন হয়? জীবনের আজীবন সংগ্রহকে বস্তুকেন্দ্রিক বৃত্তাকার চেহারা না দিয়ে, সবটুকুকেই আত্মনেপদী না করে, চিত্তকেন্দ্রিক সম্পন্নতা দিলে, পরস্মৈপদী করে তুললে কেমন হয়? অনালোকে হাত দিয়ে চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দেবার আগেই সেই অন্ধ-দৃষ্টি হতে পারলে বালিসের তলায় শ্মশান-সংগ্রাম ঘটবে না মনে হয়।

কানকথা ও পরিবেশ দূষণ ঃ

পরিবেশ দূষণ নিয়ে এখন বিশ্বময় হৈ হৈ চলেছে। আবহাওয়া অদূর ভবিষ্যতে গরম হয়ে যাবার ভয়ে এখন সর্বত্র পরিবেশ নিয়ে আবহাওয়াকে গরম করে রাখা হচ্ছে। একেবারে যাকে বলে সরগরম অবস্থা। ক্ষুধার জ্বালা জোটাতে সকালে উনুনে 'আঁচ' দিলেন তো পাশের বাড়িতে একাধিক জানালায় খড়খড়িগুলো খটাখট শব্দ করে বন্ধ হতে লাগল, একাধিক কণ্ঠে বিরূপ-ধ্বনি ধ্বংকৃত হয়ে গেল! gulf এলাকায় সেই ধোঁয়াই আকাশ-মাখা হয়ে বিশ্বের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মস্তিষ্কগুলোকে একঠাঁই করে ফেলল। উৎস আলাদা, তাই সেই দূষণ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ঘনকৃষ্ণ দুশ্চিন্তা হয়ে হন্তারক চেহারায় প্রকট হল। চরাচরে 'সেল-সেল' রব উঠল।

আধুনিক সভ্যতা তো কলে কারখানায় দানবকে লালন করে যেয়ে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সবাই ছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রকৃতি নির্দেশিত এলাকায় সীমাবদ্ধ। সার্বিক সংহতিতে, সামঞ্জস্যে, টোলাটি পড়ার উপায় ছিল না। এখন প্রকৃতি নয়, সভ্য-সভ্যতর-সভ্যতম মানুষই, খোদার উপর না হলেও, প্রকৃতির উপর খোদকারি করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। ভোগের হাঁ বোজাতে গ্রামের আর পাহাড়-প্রান্তরের সবুজ 'দেশ' ছাড়া হয়ে শহরের দিকে পড়ি মরি ছুটে যাচ্ছে, শহরগুলো ক্রমশই গজাচ্ছে, প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে বেড়ে চলেছে আর সেই ফাঁকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হাঁপানিতে ভুগতে শুরু করেছে। কলকারখানার অবিশুদ্ধ-অ-পরিশুদ্ধ মল-মূত্র-ধূত পৃথিবীর বুকে জমা হয়ে হয়ে খাদ্য-পানীয়-পুষ্টিতে টান ধরাচ্ছে আর সেই সব দানবের দূষিত ধোঁয়া-ধুলো-নিশ্বাসে পৃথিবীর আকাশে আলো আর অক্সিজেনের অভাব দেখা দিচ্ছে।

গ্রীন লাইফ থেকে শুরু করে green effect পর্যন্ত সবকিছুই বাইরের পরিবেশকে নিয়ে ব্যস্ত। ভেতরটা যে মানুষের দূষণের মার খেয়ে খেয়ে কবেই মরে গেছে, বা মৃতপ্রায় অবস্থায় কায়ক্লেশে, কোনমতে, বেঁচে আছে, তার কথা কেউতো কি তেমন করে বলছে না! অভ্যাস হয়ে গেছে বলে? জৈব বাঁচাটাকে প্রত্যক্ষ বুঝি কিন্তু মানসিক বাঁচাটা তেমন করে বোঝার দরকার হয় না বলে? চিত্তের ঔদার্য আর হৃদয়ের গভীরতা ব্যাপার গুলো অত্যন্ত abstract বলে? অথবা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো সত্য-শিব-সুন্দর খোঁচা মারে না বলে? স্ব-চেতনা আর বিবেকবোধকে তবে সোনার অলঙ্কারের মতো Locker-জাত করা হয়ে গেছে অনেকদিনই? এবং অলংকরণের জন্যে immitation এর দর্শনধারি জিনিসেই চিত্তের মনোহরণের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে? তাই বোধহয় জৈবিক Pollution টের পাই বলেই আমরা সোচ্চার, ইন্দ্রিয়গণ revolt করে। মানসিক Pollution টের পাবার মতো মনটাই অবশিষ্ট নেই, তাই প্রতিবাদও নেই।

মনকে দূষিত করে কে এবং কারা, কি এবং কিভাবে? সব প্রশ্নের সারাংসার উত্তর

'কানকথা'। ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-সংঘাত, মারামারি-কাটাকাটি এ সব বড় বড় ঘটনা-দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে চিমটি-কাটা, চুল-টানা, কান কামড়ে দেওয়া অথবা পিঠে-কিল-দিয়ে পালানো পর্যন্ত ব্যাপার-স্যাপার সবই সামনা সামনি ঘটে। রক্তের চাপ, হৃদয়ের তাপ আর মুষ্টি-বদ্ধ-হাতে জড়তা সবই এক সময়ে, এবং সম্ভবত খুবই দ্রুত, কমে যায়। পরস্পরের জীবন যাপন পরিবেশটি মধ্যেই রকমের দূষিত হতে পারে না বা দূষিত অবস্থায় দীর্ঘদিন পরস্পরের শ্বাসকষ্টের এবং প্রাণধারণের পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হতে পারে না। সামনা-সামনি বলেই Pollution-এর Scope থাকে না, গড়ে ওঠারই সুযোগ পায় না। মিল হয়ে গেলে ঝগড়া-বিবাদ অতীত হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়। মিল না হলে বুঝতে হবে নিজের প্রয়োজনটাই অস্বীকৃত, এবং তাই সেক্ষেত্রেও অতীত হয়ে যায় এবং একদিন নখদন্তের তীব্রতা হারিয়ে বেমালুম হারিয়ে যায়।

কিন্তু কানকথা? সে-যে back-stab, শুধু পেছনে আঘাতই নয় অজ্ঞাত-উৎস-আঘাত। ছুরা-বন্দুক হাতে back-stab থেকে কানকথার এখানে এক মারাত্মক প্রভেদ। ক বলে খ-এর কানে গোপনে, খ উত্তেজিত হয়, ক সেই উত্তেজনায় সদাসর্বদা, কখনও শুষ্ক কখনও ভিজে কাঠের ইন্ধন জোগাতে থাকে, মার খায় গ বা ঘ। টের পাবার জো নেই, পদ্ধতি নেই। সুতো কোথায় কে জানে, কে সেই সুতোয় মন্ত্র সংযোজন করে তা থাকে অন্ধকারে, কিন্তু খড়গের আঘাত সপাটে মাথা খোঁতা করে দেয় গ বা ঘ এর। তার পরেও আছে gangrene-এর সম্ভাবনা। কানকথা, স্ব সত্যার্থেই বিষ-কথা। ভালো কথা মাত্রেই কানেকথা, মন্দ কথাই সর্বদা কানকথা!

কানকথা দূষিত করে একে-ওকে-তাকে এবং বহুজনের গৃহ-পরিবার পরিজনকে। কান কথার বিষ উৎসটি থাকে ক-এর motive এ, intention-এ আর কানকথার উর্বর ক্ষেত্রটি থাকে শ্রোতার নেশাগ্রস্থ মনের গভীরে, চারপাশে এবং কখনও কখনও একেবারে মনের সদা-উপরিতলে। কানকথা তাই বীজের ধর্ম নিয়ে রোপিত হয়, বনস্পতির স্বভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে আর সংসারে অরণ্যের সৃজনকে ত্বরান্বিত করে। বক্তার লোকের চাইতে শ্রোতা এই গৃহ-সংসারের মানস-পরিবেশকে বেশি দূষিত করে। কারণ সে বলে সে একার কেরামতিতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ-দূষণ সম্ভব করে তুলতে পারবে না ভেবেই অপরের কানকে খোঁজে। এবং খোঁজার সময় নিশ্চিত হয়েই বিষবাষ্প উদ্গিরণ করে যেন শ্রোতা যে কোনও ভাবে-বা-কারণেই হোক কুমারী-জমির মতোই উর্বরা এবং সুফলপ্রসূ থাকে! প্রাণিজগতে শিকারকে যেমন হুলের injection-দ্বারা মৃতপ্রায় করে তারপরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গর্তে, মানুষের মধ্যে কানকথা-বক্তারাও তেমনি শ্রোতা-শিকারকে প্রয়োজনীয় ছলাকলা ব্যবহারে বধ্যভূমিতে স্থাপন করে নেয়। এবং এই কানা-কানি কানকথার ফলে সম্পর্ক ভাঙে, সংসার বিপর্যস্ত হয়; পরিবারে ধ্বস নামে। এর ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়, শ্রেণী সংগ্রামে আগুনের ফুলকি ছোটে, জাতিতে জাতিতে ধ্বংসের দামামা বেজে ওঠে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়, পিতা-পুত্রে বাক্যালাপ হয় না, মাতা-কন্যা উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধে পরিণত হয়। ভাইয়ের সঙ্গে ভাই-এর শত্রুতা রক্তারক্তিতে পৌঁছোয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর কাজিয়া লেগে যায়, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয় এবং দাদা-অধিকাণ্ড-বোমা-পাইপগান জলজ্বল জন্তুটিক অধিকার করে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়। পরিবেশ দূষণ নয়?

কানকথা, চামচেবাজি, লাগানো-ভাঙানো, কান-ভাঙানো, কানে তোলা—এ-সব একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কারণ উদ্দেশ্যের মোড়কে ব্যক্তি-স্বার্থটিই থাকে পরতে পরতে একঠাঁই। শুভচেতনাটি,

intelligence, spying ইত্যাদি অন্য বর্গের ব্যাপার, কারণ সেখানে ছোট-বড় মানসিক স্বার্থ-থেকে এবং, বিতীয়ত, সেখানে খবর সংগ্রহটাই মূল। কানকথায় অপরের মনকে ভূমিত করা, বিষাক্ত করা, এক দিকে (অবশ্যই ক-এর স্বার্থের পূরণের দিকে) হেলিয়ে দেবার বাসনাটি মুখ্য।

কান না পাতলে কান কথার কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফোটে না। কানপাতলা না হলে কান কথার জন্মই হত না। তাই দেখবেন শিল্পী রাজনীতির দিকে, পত্রী বিত্তের দিকে, পিতা-ভ্রাতা-জ্যেঠা-খুড়োর পেশার চাকরিটির দিকে কেমন একমনে ঘাড়টি হেলিয়ে দিয়ে কানকে পাতলা করে রাখছেন। নেতারা চামচের দিকে, চাষকারূপী মোল্লা-পুরুত-ফাদাররা আলখাল্লা-নামাবলি-জোব্বার নিচে কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে আছেন করজোড় সামনে বসা আশ্রিত-বন্ধুতের মুখ চেয়ে প্রবল-যন্ত্রটিকে নিঃশর্ত সমর্পণ করে। মহান্ত-মহাপুরুষ-স্বামীজীরাও বাদ যাবেন না তো অন্যের কথায় কি লাভ?

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আগুন জ্বলেছে উঠেছিল, ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত হয়ে আকাশ থেকে বিষ-বৃষ্টিকে টেনে এনেছিল, radiation ক'জন পুরুষকে পঙ্গুত্ব দান করেছিল। মধ্য এশিয়ায় এই সেদিন প্রায় অনুরূপ মহানাশযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এ-সবই তো রাজনীতি-রণনীতি-ব্যবসা বাজার-প্রীতির দান। সভ্যতার জয়যাত্রায় অমৃতের সন্ধানে ওইটুকু গরল তো কারো-না-কারো কণ্ঠে স্থান পাবেই! তবুও তাই নিয়ে এতো হৈ-চৈ। কিন্তু গৃহ-বিশ্ব-জীবন থেকে শুরু করে সমস্তের সর্বস্তরে যে সর্বনাশা মানসিক দূষণ অনবরত চলছে, ব্যক্তি-চিত্ত থেকে জাতির অন্তর পর্যন্ত যে দূষণ জরা-ব্যাধি-পঙ্গুত্ব-মরণের প্রবাহ টেনে আনছে তার কি হবে? কান কথার শেষ কি কানে, না কথায়, না কান-পাতলা কানে? কোথায় অস্ত্রোপচার সঠিক হবে?

সুপ্ত শিশু :

শিশুর মাঝে ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের পিতা। প্রকৃতপক্ষে এই কবি মোমবাতি শুধু যে পিতাই লুকিয়ে থাকে শিশুর অন্তরে তা নয়, সমাজ-সভ্যতা এবং যা কিছুই মানুষের মহান অধিকার সে সবই সুপ্ত থাকে শিশুর অন্তরে। এটা সত্যের একদিক। অন্যদিকে, সকল পিতার অন্তরেও একটি করে শিশু লুকিয়ে থাকে, সব বয়সের সব ব্যক্তির মনের কোথায়ও না কোথায়ও একটি শিশু-মন সুপ্ত থেকে যায়। থেকে যায় সারা জীবনই। কর্কশ-কঠিন জীবনের প্রতিপথে সেই শিশুচেতনা সুযোগ পেলেই প্রকাশের জন্যে উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে বারে বারেই গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা চলে। এই চেষ্টার সফলতাই জীবনে 'সাফল্য' এনে দেয়, কারণ জীবনের দায় জল্লাদের মতো খোল খোল রক্তাভ-দৃষ্টি, আর দায়িত্ববোধ নামে-চশমা-পরাকেশ, তিমির-দৃষ্টি পেয়াদার মতো নিষ্করুণ। সেখানে জাগতিক সাফল্য পেতে হলে অন্তরের মনিকোঠায় অপেক্ষারত শিশু-মনটিকে একেবারেই পগারপার করে দিতে হয়।

কিন্তু সাফল্যের মতো সফলতা ক'জনে পায়? আমরা, যারা শত-সহস্র সাধারণের দলে, সফলতাকে যারা সাফল্যের সঙ্গে ধারণ করে কখনই পাই না, তারা যে তা পাই না তার কারণও সেই শিশুটির সদা-উপস্থিতি। সরলতা শিশুর সাধারণ গুণ, অবুঝ তার মন, অভিজ্ঞতার গলি পড়ে পড়ে তার মনটি পার্থিব সম্পদের ফসল ফলানোর মতো উর্বর নয়। বিশ্বাসের অনতিক্রম বৃত্তটিতে কৃতপ্রেত দৈত্য-দানবের পাশাপাশি মানুষের প্রতি বিশ্বাসটিও মৃদু-মন্দ আন্দোলিত হতে থাকে। বিশ্বাসী ব্যক্তি

সূচের ছিদ্রপথে পথ খুঁজে পায়। বিশ্বাসে কৃষ্ণ এবং ঈশ্বর মেলে, বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল ইত্যাদি ঘোষণার মধ্যে মানুষের মনের গভীরে যে শিশুটি থাকে তাকেই বাঁচিয়ে রাখার, উচ্চে দেবার, চিরায়ত করার বাসনাটি প্রকাশ পায়। যারা জানে তারা বোঝে যে মানুষকে বিশ্বাস করা পাপ, সন্দেহই সত্য-সন্ধানের প্রধান হাতিয়ার, বক্র-কুঞ্চিত দৃষ্টিই সত্য-সাধন দৃষ্টি। এরা কেউ-কেটা হবার জন্যে জন্মায়, শিশুমেধ-যজ্ঞে এরা বিশ্বাসী আর সরলতাকে আহুতি দিয়ে পরম-চক্রবর্তীত্ব পায়।

এই চক্রবর্তীরা সমাজের সব স্তরে উচ্চস্থান অধিকার করে সদাই নিম্নদৃষ্টি। অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শত-কোটি অ-চক্রবর্তীরা যে জীবনে বিশ্বাস না-হারিয়েই বাঁচতে চায়, আশার হাতছানিতে আরবার ভেরর প্রতি অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়, সুন্দরের জন্যে অনেক পার্থিব বিষয়কে অবহেলা ক'রে বসে? এদের কি হবে? এরা যে বিশ্বাস ক'রে অপরকে টাকা ধার দেয়, বাড়ি ভাড়া দেয়, বই পড়তে দেয়? এরা যে অপরিচিতকেও বিশ্বাস ক'রে বন্ধু বলে মনে করে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়? এরা 'বন্ধুর' আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে গল্প করে, আড্ডা জমায়, ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়, ব্যবসায়ে ধার দেয়, নিজের অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে, বাড়ি-ঘর-সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে, এমন কি রাজনৈতিক নেতাকে বিশ্বাস করে ভোটও দেয়। এরা সরল বিশ্বাসে শিক্ষকের কাছে পুত্র-কন্যার শিক্ষা-ভার ন্যস্ত করে, ডাক্তারকে বিশ্বাস ক'রে রোগীকে ওষুধ খাওয়ায়, হাসপাতালে বিশ্বাস ক'রে অসুস্থকে নিয়ে যায়, নেতাকে বিশ্বাস ক'রে চাকরির দরখাস্ত জমা দেয়, মুদি-কে বিশ্বাস ক'রে সঠিক দ্রব্য এবং ওজনে আস্থা রাখে এবং রাষ্ট্র নেতার বক্তৃতা শুনে দুধে-ভাতের ভবিষ্যৎ আর রামরাজত্বের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল দেখে।

এ-সবই যে 'কাঁহাবে উত্তর যাইবে দক্ষিণ' নীতিতে গোড় খাওয়া সে-তথ্য সেই দু'একজনেই জানে। অন্য সকলে জানেও না বোঝেও না। যদিও বা এই শত-সহস্রের সেই জানা-বোঝার সুযোগ ঘটে, (প্রতিনিয়তই ঘটে, সহস্রবারই ঘটে,) তা সত্ত্বেও এদের মনের গভীরে ওত পেতে বসে থাকা সেই শিশুটির ক্যাটাগরিটিক সারল্য-রসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সেই বোধোদয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বড়'র মার বড়-মার। কবির ভাষায় ছোট'র মার অবশ্যই ভয়ানক, কিন্তু সে 'ছোট' আমাদের শিশু নয়, মনের মধ্যে সুপ্ত শিশুটি অবশ্যই নয়। এদের ভাগ্যে, আমাদের জন্যে, বড়'র মারটাই রীতিসিদ্ধ।

এই সুপ্ত শিশুটিই যদি যাতো নাইর গোড়া তাহলে চাপকানীতি প্রয়োগ করে বাক্তি-বৃক্ষের গোড়ায় চিনি-রূপ ফসিডল ঢালাই কেমন হয়?

মানুষের সংখ্যা সমস্যা ঃ

'যা থাকলে মানুষ মানুষ, না থাকলে মানুষ মানুষ নয় 'তাই মনুষ্যত্ব', বঙ্কিমের এই স্বরূপ নির্দেশ মেনে নিলে মনুষ্য জনসংখ্যার সমস্যা এক নিমেষেই সমাধান হয়ে যাবে। যাবে, কারণ মানুষ হিসেবে আর কয়জন আমাদের মধ্যে স্বীকারযোগ্য টিকে থাকবে? সম্রাটের দায়ত্ব না হয়েও মনুষ্য জনসংখ্যার সমাধান সম্ভব। যে কোনও পিতাকে প্রশ্ন করুন দেখবেন নির্ভেজাল উত্তর দৌড়ে বেরুবে। ছেলেটা বা ছেলেগুলো মানুষ হল না, মানুষ করতে পারলাম না। যবে থেকে মানুষের মনে মানুষ বিষয়ে মূল্যায়ন সত্তাভিত্তিক দানা বেঁধে উঠেছে, মানুষ হতে গেলে মনুষ্যত্বের হিটেমেটাও

যে নরদেহে আবশ্যিক, এই বোধ যবে থেকে ব্যক্তিমনে প্রভাব ফেলেছে তবে থেকেই আমাদের সকল পিতৃ-পিতামহরা ছেলেমেয়েরা যে মানুষ হল না তা টের পেয়ে যাচ্ছেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন। ছেলে মেয়েরা যতদিন তরুণ-যুবক কালের সীমায় আটকা থাকে, থাকতে বাধ্য হয়, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে, ততদিনই তাদের দেহ-মনে পিতৃদত্ত এই অভিজ্ঞানপত্রটি সদাসর্বদাই ঘোষণার মতো জেগে থাকে। এক কথায় কোনও সন্তানই পিতা-মাতার দৃষ্টিতে সঠিক মানুষ নয়, মানুষ হল না।

স্ববিরোধটুকু স্বতঃই অন্যের চোখে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু কখনই নিজের চোখে, মা-বাবার নিজের চোখে, ধরা পড়ে না। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহকে মানুষ ছিলেন ধরে নিলে—ধরে নেওয়াই যাক যেমন অংকে-বিজ্ঞানে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে,—তার চোখে তস্য-পুত্র 'অমানুষ'। কিন্তু এই 'অমানুষ'-টিই তার সন্তানকে 'মানুষ' করতে পারেন না। নিম্নধাপ 'সরল-অংকের' সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলে আমরা তো সব অমানুষরা অমানুষ বলে ধিকৃত হতে বাধ্য। কিন্তু তা হয় না। হয় না কারণ অতীতের মানুষরা, পিতামাতারা, গোটা চল্লিশেক কালান্তরের পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই 'মানুষের' পর্যায়ে পৌঁছে যেতেন, অথবা, বলা উচিত, অন্যকে নিজের সন্তানদের অমানুষ বলার অধিকার সীমায় প্রবেশ করে যেতেন। এখনও অনেক ক্ষেত্রেই সেই সীমা থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাটা আর একটু ও-পারের দিকে সরে গেছে এই মাত্র!

অবশ্য কবি কণ্ঠের ধ্বনি নিয়ে 'মানুষ আমরা, নহিতো মেষ', বলে, প্রতিবাদ জানাতে পারি, কিন্তু মাতা পিতার মূল্যায়ন-ধারণায় প্রতিবাদের ধাক্কা লাগলে তারা আমাদের মনুষ্যত্বহীনতাকে বিশেষণে বিশেষিত করার অধিকতর কারণ খুঁজে পাবেন অবশ্যই। তাই মতদ্বৈধ মেনে নিয়ে বিশেষণের অনাবশ্যক বোঝার হাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে। তারুণ্যের সচেতনকে না জেনেও সব সন্তানরাই line of least resistance-কে ছোট বেলা থেকেই দু হাতে আঁকড়ে থাকে। এখানেও সেই স্ববিরোধ। সন্তান যদি ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন শিরদাঁড়ায় গাঁথিয়ে ফেলে তাহলে মা-বাবা সেই স্বতন্ত্রতাকে ধৃষ্টতা বলে মনে করেন, আবার মতদ্বৈধ মানাতাকে মেরুদণ্ডহীনতা বলে গাল পাড়েন মনে মনে। তবে ব্যতিক্রম আছে: বাইরে মেরুদণ্ড খাড়া রাখা আর ঘরে বিনত থাকা বোধহয় কাম্য, মাতা পিতার কাছেই কাম্য, মনুষ্যত্বের নিকষ সেক্ষেত্রে সত্যাসত্য নয়, সম্পর্কের ব্যাপার!

বাল্যকালে সব মা-বাবারাই সন্তানদের গাড়ি-ঘোড়া চড়ার সহজতম পথটি যেমন ধরিয়ে দেন তেমনি আরও শত-শত হিতোপদেশ দিতে দিতে কর্ণের প্রাণান্ত করেন যার অধিকাংশই বড় হতে হতে সন্তানরা 'কেতাবী' আখ্যা দিয়ে জীবনের তুষারে স্থানান্তরিত করে রাখে। ফেলে দেয় বলা যাবে না কারণ, সেই সব উপদেশের প্রতিটি এবং সংযোজনসহ আরও কিছু কিছু, সময় হলেই, স্ব স্ব সন্তানদের কর্ণে প্রবিষ্ট করতে সকাল সন্ধ্যা হিতোপদেশের স্তবগান করে থাকেন। Tradition সমানেই চলে, এবং সুশিক্ষিত তোতার মতো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সেই সু-শিক্ষার পাঁচালি বহমান থাকে।

একপুরুষ থেকে অন্য পুরুষের প্রবাহ ধারায় স্ববিরোধ ধরা পড়ার সুযোগ ঘটে না। আসলে প্রত্যেক মা-বাবা যা চান ছেলে মেয়েরা তা হতে পারে না। হতে পারে না তার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণই হল এই যে মা-বাবা কি চান তাই তাদের মনের মধ্যে বেশ পরিষ্কার উপলব্ধ নয়! যা তাঁরা চান না সেগুলোই যেন চোখে খোঁচা দিতে থাকে আর তাই মনে কষ্ট বোধ পাঁজরে ওঠে অনুষ

হয় না।

দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল এই যে সব ঠাকুমার কাছে অমানুষ বাবারা by-implication আপন মানুষ-বোধে নিজের সন্তানকে মানুষ করে তুলতে গিয়ে সন্তানের মনে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে দিতে পারেন। এখানে মহাজনদের কথা বাদ দিয়ে পড়তে হবে, ব্যতিক্রম হিসেবে।

Ration-এর দোকান-দৃষ্টিতে মানুষ তো সংখ্যা সমস্যায় জর্জর; rational বঙ্কিম দৃষ্টিতেও সংখ্যা সমস্যা হতে-গোনা যায় মতো। অর্থাৎ সমস্যা বিপরীত, সংখ্যাধিক্যের এবং সংখ্যাল্পতার। এই বিবিধ সমস্যার চক্র-বূহে মানুষ আর মনুষ্যত্ব সমান আটকে গেছে!

ঘর চাই ঃ

মহাশূন্যের পুঞ্জ প্রভাতে আকাশে বাতাসে যে 'দেহি! দেহি!' ধ্বনিটি আকৃতি হয়ে অনুরণিত হয়, বিশ্বচরাচরের উমাকিরণের মতো ছড়িয়ে পড়ে, সেই বিদ্যাং দেহি, ধনং দেহি, সুখং দেহি-সমূহ প্রাসঙ্গে আমাদের সকলের মনের গভীর থেকেই শত-সহস্র চাই-চাই-এর উৎসারণ-উচ্চারণ। ভবদূতের অনুষ্ঠার সঙ্কলন চাই-চাই দিয়ে আমাদের যে যাত্রা শুরু সেই যাত্রাই সমাপ্ত হয় নিরুচ্চার হা-মুখ-প্রসারী গলাজলের ম্রিয়মান চাহিদায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই শত-এক 'চাই'-এর পিছুতাড়া করে ফেরা আমাদের বিধিলিপি। এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই করে করে চাওয়াটাকেই একসময়ে মোক্ষ করে বসি। চাই-এর হা-মুখটি ঠিকই খোলা থাকে, চাওয়ার বিষয়টা শুধু পাল্টে পাল্টে যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘর-চাই-এর বেলায়। সকলেই আমরা ঘর চাই। স্থানকালপাত্র পাল্টে যায়, ঘরের অর্থ পাল্টায় কিন্তু ঘর-চাই-এর ধ্বনিটি একই থেকে যায়।

ছেলে বেলায় মা-বাবার সঙ্গে যেখানেই যাই না কেন বারে বারেই বলে উঠি 'মা ঘরে চল'। মাঠে-ঘাটে, আত্মীয়-স্বজন-গৃহে, চিড়িয়াখানা-বনভোজনে যেখানেই যাবে সেখানেই 'অশান্তি, দু-দণ্ড বসার উপায় নেই'। কেন? না সেই 'মা, বাড়ি চল, ঘরে চল!' ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করতে গিয়ে সকলেরই তো এই অ-সামাজিক বিপদ ঘণ্টা-দুঘণ্টা পার করতে দেয় না। শিশুদের ঘর চাই। ঘর ওদের কাছে অবশ্যই মাকে একা একা করে পাওয়ার নাম, নৈকট্যের উষ্ণতাকে আঁচলে-মুখ গুঁজে সর্বদেহে নিঃসপত্ন উপভোগের অনুভব। তাই ওরা গৃহ নয় ঘর চায়, মাকে চায়।

তার পরেই তো ওরা একা-দোক্কার ঘর চায়, ঘর বানায়, ঘর দখল করে। লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে এই চাওয়াগুলো প্রকাশ পায়। বাসের এই ঘর চাওয়াও কোন গৃহ-চাওয়া নয়, জন্মকে অনুভব করা, সত্য করে হিসেব কষা মাত্র।

যৌবন সোজাসুজিই ঘর চায়, ঘরের জন্যে উতলা হয়। এই ঘর খোঁজাটা প্রাণিজগতের নিজস্ব ধারায় বিষময় ঘটে চলেছে। কেউ মাটির তলায় গর্ত করে ঘর চায়, কেউ গাছের কোটরে-ডালে-পাতায়, কেউ পাহাড়ের গর্তে-গুহায়-কন্দরে। মোট কথা ঘর চাই সকল যৌবনেরই। আর সকলেই দিনান্ত পরিশ্রমে সকল সংগ্রহকে একঠাঁই করে নিজ-নিজ ঘর-চাওয়াটাকে একান্ত করে তোলে। একান্তও করে একাকিত্বের আড়ালও খোঁজে। এই ঘর চাওয়া কোন গৃহ নয়, ঘর নয়, এই

চাওয়ার মধ্যে উদ্ভিদ-জগতের স-উদ্ভিদ দ্বৈত-নৈকট্যের তন্ময় হওয়ার বাসনাটি মনোময় হয়ে উঠতে চায়। গৃহ নয়, গৃহ-কোণ, ঘর নয় ঘর বসানোর আকাঙ্ক্ষা, নিরুদ্দেশ নয় উদ্দেশ-দৃষ্টি নিটোল একতানেই এই সময়ের ঘর চাই-এর মূল চেতনা। ঘর এখন চাই, এবং অবশ্যই চাই। এই উত্তাল চাওয়ার প্লাবনে যদি ঝড় ওঠে, ঘর ভাঙে, বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবুও ঘর চাই, চাইই চাই।

এই ঘরের চেতনার টানে ঘরের মধ্যে ঘরের জন্ম ঘটে। যৌথ পরিবারের পটভূমিতে ঘরের-মধ্যে-ঘরের সহাবস্থানের ব্যবস্থা ছিল, এখন একক ঘরের চাহিদা-সর্বস্বতায় অস্বস্তিকর অসহাবস্থানের অনুভব প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক সত্য। এই ঘর চাওয়া কোনও আঁচল-বিহান বরণ ডালার অভিষেকে সমাদৃত নয়, marriage registrar-এর dotted line-এ সই-সাবুদ করা। সেখানে গৃহদ্বারে কচি কলা গাছের সবুজ-আহ্বান আর microphone-এ ধ্বনিত সানাই-এর সুরে অভিনন্দন উচ্চারিত সেখানেও ঘর চাই-এর উন্মাদনা দু'চার দিন-মাস-বছরের হিসেবে বাঁধা। সূর্য আমাদের জীবনে পূর্বে উদিত কিন্তু জীবন আমাদের পশ্চিমে দৃষ্টি-নিবদ্ধ। তাই ঘর চাই-এর উষা-বোধ এবং প্রভাত-দৃষ্টি ভাঙে করে আমরা পশ্চিম-বোধ আর সন্ধ্যা-দৃষ্টিতে মশগুল হয়ে আছি। যৌবনের 'ঘর চাই' চাই এখন flat-চাইতে স্থির হয়ে গেছে। আর এই গেছে বলেই আজ চারদিকে flat-এর হাহাকার, Promoter দের রবরবা, জমির মালিকদের কপালে-করাঘাত-কিন্তু-পকেটে জনার্দন !

কিন্তু জীবনের দ্বিপ্রহরে কেষ্ট পেয়ে সব বয়স্কদেরই যে 'ঘর চাই ঘর চাই' বলে হাপিত্যেশ সে তো ঘরের জন্যে নয় 'গৃহের' তাগিদে। সারাজীবন গৃহ-হীন থেকে, চাকরি-ব্যবসায়-পেশাদারিতে ছুটোছুটি করে করে, পড়ন্ত বেলায় গৃহের টানটুকু যেন সকলকেই পীড়ন করে। অবসর জীবনে গৃহ-হীন অবস্থান সুখেরও নয় স্বস্তিরও নয়। তাই চলে গৃহের অন্বেষণ। একটুখানি সবুজ, একটু রোদ ঝলমল বারান্দা, জন-না-চোঁয়ানো এক টুকরো ছাদ, দু'চারটে ফুটন্ত ফুল, দুটো পাখির সকাল সন্ধ্যা তীক্ষ্ণ মধুর শিস, অনাদৃত গৃহিণীর সদাব্যস্ত নৈকট্য আর ছেলে পুলে, নাতি-নাতনীদের সাদর-সোহাগ। নিষ্কর্মা অবসর জীবনের সন্ধানে সরস উৎসটি যে গৃহ, গৃহ-কোণ, গৃহকোণের নৈকট্য, তাই যেন 'ঘর চাই' বোধের মূলে।

এই সময়ে বয়স্কদের জন্য এক রকমের 'ঘর-চাই'-তে পেয়ে বসে। শুধুই ঘর নয়, ঘরের সঙ্গে একটি বর-ও চাই। কন্যা থাকলেই ঘর-বরের চাহিদায় দিনের বিশ্রাম চলে যায় বন্ধু-বান্ধবের কাছে অনুনয়-বিনয়ে আর রাতের ঘুম ছুটে যায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনোত্তর চিঠিপত্রের বিচার-বিশ্লেষণে। নিজের জন্যে যেমন ঘর চাই, গৃহকোণ চাই কন্যার জন্যেও তেমনি ঘর চাই, বর চাই তাড়া করে ফেরে।

এবং এ-বয়সে যখন হাঁটুতে বাতের আক্রমণ আর কোমরে 'সাইটিকার' বাধাকে পাকাপাকি ঘর বাঁধতে দিয়ে 'তেমাথা' জীবনের শুরু করি তখন হঠাৎই দেখতে পাই যে সে-ঘর এতো দিনে তৈরি করে তুলেছি তা আসলে একটি তাসের ঘর। ছেলে মেয়েতে মিলে সেই ঘরের অন্তর্জলির ব্যবস্থা করে রেখেছে। ঘরে ঘরে পাঠানো মেয়ের ঘরের বর্তমান অবস্থাও তার মেয়ে আসা পুতুল ঘরের মতোই ঘতভী, তদ্রূপ অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

অনেকেই আমরা এই অবস্থায় গৃহ-ত্যাগ করি। পরিজনেরা তখন আমাদের 'ঘরটির দোষ দেয়, আত্মজরাও অনুরূপ প্রত্যাশাপন্ন দেখেন। অনেকে গৃহ-হারা জীবন যাপন করি গৃহের মধ্যে

থেকেও। আপনজনেরা তখন আমাদের মতি-স্মৃতি-ভ্রংশ অবস্থা ঘোষণা করে, 'তুমি চুপ কর!' বলে নিদান হাঁকে। তখন বুঝে পাই না দীর্ঘ চেষ্টা আর আজীবন সাধনার উপসংহারে যে ঘরটিকে গৃহ বলে মনে করেছি তা আসলে গৃহবাস না বৃক্ষতল-পথপ্রান্ত!

এবং তখন মনে হয় আসল গৃহ বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সে অবশ্যই অন্য কোথায় অন্য কোনও স্থানে। যে গৃহ ছেড়ে আমরা সকলেই একদিন এই জীবনের যাত্রাপথের প্রথম স্টেশনটিকে মাতৃগর্ভের অভ্যন্তরে খুঁজে পেয়েছিলাম, সেই গৃহই বোধহয় শ্মশান-ঘাটের শেষ স্টেশন হয়ে পরজন্মে চলে গেছে, অজানা- অচেনা কোন্ নিরুদ্দেশের পথে।

সারা জীবনই ঘর চাই ঘর চাই করে ঘরকে হারাই। আর হারাতে হারাতেই একদিন স্বপ্নে নিজের ঘরের সন্ধান পাই। এটাই কি বিধিলিপি? এটাই কি জীবন বিধি?

কানকথা—পাঁচ কথা :

ছোটবেলায় শুনেছি মেয়ে নই মেলে (দলে, group-এ, company-তে), বউ নই ঘাটে আর ছেলে নই মাঠে (সেই দলে ইত্যাদি)। অত কথা তখন বুঝেছি বলতে পারি না। আর এখন গ্রামবাংলায় 'মেলে'-ঘাটে-মাঠে থাকলেও শহরে অন্তত ঘাটের মধ্যেই অভাব। জল তোলা, থালা বাসন মাজা, কাপড় কাচা এবং স্নান করা এখন ঘরের ভেতরেই ঘাটে থাকে। তাই ঘাটে এখন ঘরের মাঝে এসে 'ঝি-কাজের-লোক'-এর ধারায় প্রয়োজন-পূরণ করে চলেছে।

আশ-কথা পাশ-কথা, গল্পগাছা অলস সময়ের কথা। কিন্তু দ্রুতচলমান জীবনে, জীবন-মাঠের মতো এক-বা-দু-কামরার চৌড়-বাউন্ডারি আবাসে বাইরের জীবন — ঘাটের কলতান-জীবন— ঝি-চাকরের মেনো জল বেয়েই প্রবেশের পথ পায়। সেই জলের স্রোতটি যে ঝরনার মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তা তো নয়, 'ভগীরথ'-দের মনের ধোঁয়ার পাঁক-পানা-শ্যাওলার কেচ্ছা-কাহিনী-কেলেঙ্কারির আগম ঘটে অনিবার্য। সেই সব বিশ্ব তথ্যের সঙ্গে ঝাল-নুন-মশলা মেশে হাতের ভঙ্গিতে, চোখের ইঙ্গিতে আর কণ্ঠের চিস্-চিস্ sub-vocal উচ্চারণে। বাড়ির বৌ-ঝি-গিন্নীরা এই বেনোজলের আকর্ষণে বিবশ বোধ করেন, নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অনাবশ্যক নোংরা-জলের প্রবাহে চিত্তকে কলুষিত করে ফেলেন।

এই পাঁচকথা-কানকথায় পাড়া-প্রতিবেশীদের বিষয়ে বহুতর তথ্য এবং অগাধ জ্ঞান সংগ্রহ হয়। তথ্য ও জ্ঞান না কেচ্ছা ও অজ্ঞান তা কে জানবে? তাছাড়া এ-বাড়ির বৌ-ঝি-রা কখনও কি নিশ্চিত হতে পারেন যে ও বাড়ির ওদের কথা যখন গল্প গল্প করে এ-বাড়িতে প্রচার হয় তখন এ-বাড়ির কথাও সে বাড়িতে উপুর করা হচ্ছে না? Communication gap মানুষের জীবনে যতখানি ক্ষতি করতে পারে—যদি ক্ষতি করতেই পারে—তার চাইতে সহস্রগুণ বেশি ক্ষতি—'যদি' নেই এখানে—এই সব অনাকাঙ্ক্ষিত-মাধ্যম communicator-রা করে থাকেন। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ যেমন অনিবার্য by-product, এবং সেই effluents যেমন fluently জলে-স্থলে-আকাশে বিষ ছড়ায়, pollute করে, সমাজের মধ্যকার প্রতিবেশী মনের মাধ্যমীয় বর্জ্য-পদার্থ - cathartic effluents - এই সব 'ঠিকে-মন' মাধ্যম করে এ বাড়ি - ও বাড়িতে নালা-প্রবাহ ঘটায়, pollute করে।

Pollutants সমূহকে re-cycling করার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক বলেই তা অবাবহার্য থেকে ব্যবহারের জন্য দেয়। সমাজ-মানসের pollutants re-cycled হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নয়, উদ্দেশ্যের motivation-এ। এবং তাই সেখানে যোজ্য জগের আবর্ত পাককে আরও পঙ্কিল করে তোলে, পৃথিবীকে অধিকতর দূষণাক্রান্ত করে তোলে। কারখানী (শক্তিচালিত) ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে উঠে যেতে দেখে তার নিজের মনের ভাবনা দিয়ে এক রকম করে অর্থারোপ করে নিয়েছিল। মনের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ-অপকারইচ্ছার ধোঁয়া-কুণ্ডলীগুলো ঘুরে ঘুরে একমন থেকে অন্যমনে পৌঁছায়, আকাশ পায় না। দৃষ্টিকে এরা আচ্ছন্ন করে রাখে তাই দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে, কর্ণকে এরা পাতলা করে তোলে তাই পরনিন্দাও মধুর বলে মনে হয়। এই দূষণ তাই men-o-sphere থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গতি পায় না, মনো-sphere এই দূষণকে দূরতর করে যায়!

আর মালিন্য যখন একবার মনের গভীরে উপ্ত হয়ে যায় তখন সেই মনোমালিন্য যাবতীয় বাহ্যিকতে অনুভবে, গ্রাহ্যতা প্রত্যক্ষে আর সামাজিক মূল্যায়নে refraction ঘটাতে থাকে। ছক্ক-দৃষ্টি মার খায়, সত্য-দৃষ্টি বনবাসে যায়। জীবন থেকে সহজ হারিয়ে যায়, পরিবারের মিলন ক্ষেত্রটি মলিনতায় ভরে ওঠে, সমাজের সংহতিতে হত্যাকারীর কৃপাণ অকৃপণ ঝলসে ওঠে।

বিচারকের দৃষ্টিকে সমদৃষ্টি করার জন্যে কালো পট্টির আড়াল টানা হয়ে থাকে। প্রতীক। যেন চোখ খোলা থাকলে সম-দৃষ্টি হবার সম্ভাবনাই থাকে না! এ বড় অন্যায়, ন্যায়ের মূর্তিতে এহেন অন্যায় প্রতীক কেন আরোপ করা হল কে জানে? এ-তো সম-দৃষ্টির নয় সম-অদৃষ্টির, অন্ধকারের, প্রতীক মাত্র। cupid কে blind করে paint করায় এমন অন্যায় ঘটে না, প্রেমের দৃষ্টি চক্ষু-কোটরে অবস্থান করে না, অন্তরের গভীরে তার আলোর উৎসটি দৃষ্টিময় থাকে। বিচারকের কান খোলা কেন? উভয় পক্ষের বক্তব্য সম-মূল্য গ্রহণ করার জন্যে? খুনীরও কিছু বক্তব্য থাকে, তাই? উকিল-ব্যারিস্টারদের যাবতীয় সত্য-মিথ্যার polluted আলকথা-পালকথা-আইনকথাকে বিচারক নিয়ম-আইন-বিধানের ছাকনিতে filter করে নিতে যাবেন কেন? একটা ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবিশ্বাস, দৃষ্টির প্রতি, আর অন্য একটির প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাসের কারণ?

যদি মেনে নিতেই হয় তাহলে ব্যক্তি জীবনে, পরিবার জীবনে এবং সমাজ-জীবনে এমন একটা ছাকনির ব্যবস্থা করলেই তো হয়। সেই ছাকনিটা কি? বিধি-বিধানের লেখাজোখা দিয়ে এই ক্ষেত্রে ছাকনি বানানো অসম্ভব। তা হলে? রুচি-বোধ কেমন হয়? অতীতের জানা চেনার মূল্যায়নকে কুলোর বাতাস না দিয়ে আঁচলে বাঁধলে কেমন হয়? আমি-তুমির উত্তম-মধ্যম সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয়-পুরুষের Third Person-কে প্রবেশের Pass-Port-visa না দিলেই তো অনেক কঠিন সহজ হয়ে যেতে পারে। Pollution বন্ধ করতে সর্বোত্তম পথই তো Pollution ঘটতে না দেওয়া।

ভয়ভূত :

আগে একদিন আমাদের 'আমি'-কে নিয়ে সমস্যার কথা বলেছি। সেই আমাদের আমি

আমাদের আদরেরও বটে ভয়েরও বটে। কিন্তু 'আমি'-র যে ভয় তার চেয়েও ভয় 'ভয়ের ভয়'। আমরা সকলেই কম বেশি ভিতু। ছোট বেলায় রাক্ষস খোক্ষসের, দৈত্য-দানোর, ভূত-প্রেতের ভয় আমাদের মজ্জায় ঢুকে যায় সেই ভয় আর সারাজীবনে তাড়াতে পারি না। অস্তিত্বের গভীর গোপনে সেই ভয়-ভাবনা যেন একেবারেই লেপ্টে যায়। মনে হয় ভবিষ্যৎ জীবনের হাজারো ভয়ের যে বাড়ে-বংশে সমৃদ্ধি তা সেই বাল্যের বীজের কেরামতি।

প্রাণিজগতে সব চাইতে দুর্বল বলতে মানুষকেই বোঝায়। সে শরীরেও দুর্বল, মনেও দুর্বল। তাইতো সে সব চাইতে হিংস্র, মনে মনে। Law of Compensation. সব দুর্বলতাই দুর্বলতাকে ঢাকতে অধিক হিংস্রতার আশ্রয় নেয়। প্রাণিজগতেও আছে, মানুষের সমাজে সর্বাধিক। ঘাটতি-পূরণের নীতিতে পড়ে পাওয়া মনকে সে সংগ্রামে, টিকে থাকার সংগ্রামে, যথাসম্ভব কাজে লাগায়। এতে দোষের কিছুই নেই কারণ বেঁচে-বর্তে থাকার অধিকার সকলেরই সমান।

কিন্তু দোষের হয় তখনই যখন অপ্রয়োজনেই সে সেই হিংস্রতাকে সংসারের মধ্যে অকারণে টেনে আনে। অবশ্য একেবারে অকারণে নয়, কারণ অকারণে তো এই বিশ্বে কোন কিছুই ঘটে না, ঘটতে পারে না। ভয়ের কারণে। ভূতের ভয়ের জন্যে যেমন একটা আস্ত ভূতের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না, ভাবনায় ভূতের সম্ভাবনা থাকলেই যথেষ্ট হয়, তেমনি গৃহে-পরিবারে প্রকৃত ভয় আদৌ জরুরী নয়, ভেবে নিলেই হল যে ভয় একটা সামনে ওত পেতে বসে আছে। এবং তাহলেই অসহিষ্ণু হিংস্রতা প্রকাশ বৈধ হয়ে গেল।

ছেলে পড়াশুনা করছে না? আড্ডায় সময় নষ্ট করছে? রাশন তোলা, গম ভাঙানো অথবা হঠাৎ প্রয়োজনে চা-চিনি-মুদি মেতে চায় না? অবশ্যই অন্য ছেলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হচ্ছে! দলের ভূত ওর ঘাড়ে চেপেছে। লাগাও ধমক, চালাও চাবুক, দৃঢ় হাতে ধর শাসনের দণ্ড! মেয়ে আনুষ্ঠান করছে? কলেজ যেতে নদীর ধারে যাচ্ছে? Class room এর চার দেওয়ালের চাইতে উন্মুক্ত আকাশ বীথিতে বেশি মন টানছে, Notes লেখার বদলে রঙিন কাগজে গোটা গোটা শব্দ সাজাচ্ছে? তাহলে তো কোনো বাউণ্ডুলে ভূতের খপ্পরে পড়েছে। ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হবার আগেই তাকে নজর বন্দি করে রাখ। কলেজ ছাড়িয়ে দাও, রান্নাঘরের দড়ি-দড়া-হাতা-খুন্তিতে তার উদ্বৃত্ত সময়কে বেঁধে ফেল, চাই কি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছেড়ে দাও। ঘাড় থেকে নামাতে পারলে সম্ভাব্য ভূত অপরের ঘাড়কেই খুঁজে নেবে!

প্রতিনিয়ত আমরা নিজ নিজ ঘাড়ে হাত বুলোই আর পরখ করি ভয়ের ভূত কোনও ফাঁকে আমাদের ঘাড়-টি না মটকাতে পারে! ছেলের চাল চলন পছন্দ নয়? চাকরি-বাকরি করছে কিন্তু মাসান্তে মধ্যযোগ্য হাত-উপুড় করছে না? বেশি রাতে ফেরে পায়ে গন্ধদ্রব্যের ঘোষণা বয়ে? চুটা চরিত্রির করে পাড়েলের ঘেরাটোপে সানাই-এর সুরে তার ঘাড়ে জীবনসাথী চাপিয়ে দাও। তখন হারানোর ভয় থেকে বাঁচা গেলেও ছেলে যে ঘরে ফিরল তা জানা গেল কি? তাই দু-চার দিন যেতে না যেতেই আবার ভয়, সেই হারানোর ভয়। মাকে সাথী বলে ছুড়ে দেওয়া হল সেই অদ্বিতীয়া যে ঘাড়ে চেপে বসল না তার স্থিরতা কোথায়? এ-বারে আর ঘাড় মটকানো ভূত নয়, হতে পারে একেবারে রক্ত-চোষা ভূত! আর ছেলে তখন দীর্ঘ ইতিহাস বিজড়িত পুরোনো মা-বাবার কাছে একজোড়া নোতুন, আনকোরা নোতুন, সদাহাস্যময়-ময়ী প্রিয়তাষী-ভামিনী বাবা-মা পেয়ে অতীতের ভূত ছেড়ে ভবিষ্যের দিকে আভূমি-প্রণত ঝুঁকবে না তার ঠিক আছে কি? তখন? তখন ওজা-বৈদ্য

পাওয়া যাবে কোথায়?

মেয়ে ঘরে যতদিন ছিল ততদিন তার মায়ের ঘুম ছিল না। আপনি সর্বস্বান্ত-প্রায় হয়ে তাকে নোতুন ঠিকানায় ঘরবাসী করে দিলেন কিন্তু দুশ্চিন্তায় ভূতটি সদাসর্বদার জন্যে জড়বৎ করে দিবস রজনী কি হয় - কি হয় করে কাটিয়েছেন। কাটায়েন নয়, কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। মেয়ের চিন্তা-চেতনা-অনুভবের অতীত-ভূতটি নোতুন সংসারে মানিয়ে নিতে পারল কিনা, বৈবাহিক মহাশয় যে সকল ইচ্ছা পুত্র-মাধ্যম পূরণ করতে মনস্থ করে রেখেছিলেন সে সকল মনস্কামনা তার মন ছেড়ে কখনই আপনার কন্যার হাত ধরে আপনার ঘাড়ে চাপছে কিনা, জানাটা যাবজ্জীবনের অতীত ভূত আর বর্তমানের স্বভাব গোমড়া-মুখ ভূত হয়ে আপনাদের শয়নে-স্বপনে ভয় দেখাবে কিনা—এ মতো কাটো শত ভয় আপনার ঘাড়কেই শাওড়া গাছ ভেবে দীর্ঘ-চেপে বসতে পারে, নই নড়ন-চড়ন নই-কিন্তু! অন্য ভাবনে স্পনডিলিসিস, আপনি জানেন ওঝা চাই!

সকলের পুত্র-কন্যা থাকে না। এ-সব ভূত তাই তাদের ঘাড়ের জন্যে ঘাপটি মারার সুযোগই পায় না। কিন্তু তাদের জন্যে আছে 'আই-কুড়ি' ভূত, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সামনে না-আসার দাবি নিয়ে 'অওত-অওতী' ভূত। সে-সব ভূত ঘাড়ের বদলে মনের গভীরে বাসা বেঁধে বসে থাকে, নড়নে-চড়নেই খোঁচা মারে আর রাতের গভীরে বালিশকে লবনাক্ত করে তোলে: ছাড় নেই কারো।

অনেকের ছেলেমেয়েই তো বিদেশ-বিভূঁই-এ প্রবাসী জীবন কাটায়। তারা কি মুক্ত? একেবারেই নয়। সেখানে আছে বিদেশি ভূত, সাহেব-মেম ভূত। অনেকে এদের বলেন স্পেন্স ভূত। শোওয়া গাছের ওঁদের ভাষা বোঝা যায়। ওঁরা প্রধানতই 'মাছ' চায়, Protein-এর সিংহভাগ থাকে অখাদ্য বাতিতে। কিন্তু এই সব স্পেন্স ভূত প্রধানত আমিষ-ভোজী—পুত্র-কন্যাদের বেমালুম হজমে ওদের তৃপ্তি। সন্তান তাড়া করে হাহুতাশ ছাড়া এ-ভূতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।

এতক্ষণ যত ভূতের কথা বললাম তারা সবই বাইরের ভূত। এদের জন্মস্থান অবশ্যই ভয়ের উর্বরা জমিতে, কিন্তু আক্রমণ লক্ষ্যটি আপনি। কিন্তু সব ভূতের মধ্যে ঘাতক ভূত হল 'মনদ' ভূত, (মন দ্বারা দান কৃত, মনদ) ভূত। মনস্তত্ত্ব বলতে পারেন। এ-টি নিজ নিজ মনের গভীরে ভয়ের গর্ভে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের ঔরসে জন্ম নেয়, অথবা স্নেহে লালিত পালিত হয় এবং সুযোগ পেলেই জীবনের রস-রক্ত-প্রাণবায়ু নিঃশেষে শুষে নেয়। ব্যক্তি মানুষকেই এই ভূতে পেলে ছিবড়ে করে ছাড়ে। বনের ভূতে বড়জোর ঘাড় মটকায়, মনের ভূত প্রাণ-মটকায়, প্রাণ নিঙড়ায়, তান পুড়িয়ে কয়লা করে খাক করে ছাড়ে।

ভয়ের জমিতে প্রধান প্রধান ভূত-ফসলের কথাই এতক্ষণ বলা হল। খারিফ এবং অন্যান্য ফসলের মতো হাজারো ভূতের সম্ভাবনা থেকে গেল। তারা জন্মায়, থাকে এবং সময় সুযোগ মতো খোঁচা মারে, বিরক্ত করে এবং বাঁচতায় কামড়ায়। ট্রামে-বাসে, হাট-বাজারে, অফিসে-দপ্তরে, স্বজন-পরিজন গৃহে, সিনেমা-থিয়েটার হলে এমন কি স্কুলে-কলেজে এই সব খারিফ-ভূতেরা সদা সর্বদাই আনাগোনা করে। প্রতিনিয়তই তো তা আমরা টের পাই পায়ের পাতা-মর্দনে, দাম-ভাব-ওজনের কারচুপিতে, করাপশন-নেপটিজম-এর রমরমায়, পরনিন্দা-পরচর্চায় এবং সহজে কিস্তিমাতের মানসিকতায়। এই সব খারিফ-ভূতের আঁচড়ে-কামড়ে ওঝা-বৈদ্যের দরকার হয় না এই যা রক্ষে। এদের দাঁতের আর নখের চিহ্ন নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি।

সুবিধাবাদী ঃ

হিতোপদেশ আছে কানাকে কানা, পঙ্গুকে পঙ্গু এবং কালাকে কানে কালা বলবে না। এই উপদেশের কারন সহজেই বোঝা যায়। কোটি কোটি স্বাভাবিক সবাঙ্গ মানুষের মধ্যে ভগ্ন-বা-ভাঙাবিড়ম্বিত কতিপয়কে তাদের বিড়ম্বনার বিষয়টিকে নির্দেশ করলে বেদনাটুকু বাড়ে বই কমে না। সত্য কখন অকারণ অপ্রিয় হয়ে তা সত্য হয়েও অসুন্দর-কথন হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, যে তথ্য অস্তিত্বের মধ্যে বিতাপনের মতো সর্বজন বিদিত এবং যে অকরুণ সত্য ভাগ্য-লাঞ্ছিত সেই সেই আংশিক পঙ্গুত্ব-বাহী ব্যক্তিরা নিজেরা অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবেই জানে, তার উল্লেখ উপরন্তু অতি-কথনের দায়েও দুষ্ট।

কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে যা বিতাপনের মতো চোখের সামনে জলজল করে ভেসে থাকে না, স্বভাবের গভীরে সুপ্ত থাকে। এবং এই সব দোষের মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তিগত, কিছু আছে সামান্য, সকলের মধ্যেই সমান ভাবে উপস্থিত। মাত্রাগত তফাত অবশ্যই থাকতে পারে, থাকেও, প্রকাশের ক্ষেত্রে। কিন্তু তলগত ভাবে আমরা সকলেই সেই স্বভাবের শরিক, সমানভাবেই। এমন অনেক দোষের মধ্যে সুবিধাবাদী মনোভাব একটি সার্বিক মানব-স্বভাব।

কানাকে কানা বললে সে বাধা পায়, সেই-বলাটা অসুন্দর হয় এবং, হিতোপদেশ অনুযায়ী, কুরুচির প্রকাশ বলে মনে করা হয়। অথচ সুবিধাবাদীকে, অর্থাৎ যে কোনও ব্যক্তিকেই, সুবিধাবাদী বললে সে উত্তেজিত হয়, সেই বলাটা মনোবৈজ্ঞানিক হয় এবং সামাজিক মূল্যায়ন অনুযায়ী কোদালকে কোদাল বলে ঘোষণা করার দায় ঘাড়ে চাপে! কোথায়ও কি এমন কোন উপদেশ আছে যে স্বার্থপরকে স্বার্থপর, পরনিন্দুককে পরনিন্দুক এবং সুবিধাবাদীকে সুবিধাবাদী বলা উচিত নয়? বলা নেই, কিন্তু আমরা বলি না। কেন? না সেই সুবিধাবাদী মনোভাব! সত্যি কথা বলে নিজের আখের নষ্ট করাটা মূর্খের কাজ! অর্থাৎ সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে তবেই সত্যকথন বিধেয়! তবেই বুঝুন!

হ্যাঁ, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অনেকেই আছেন যাঁরা নিজেদের ভাল-মন্দ সুবিধা-অসুবিধা নির্বিচারে যা সত্য বলে মনে করেন তাই অ-কাতরে বলে বসেন। এঁরা যে তা বলতে পারেন তার কারন এঁদের 'নিজ' বলে স্ব-চেতনাটিই খোয়া গেছে—এঁরা বিভিন্ন স্তরের এবং কারনের পাগল। আত্ম নেই বলেই এঁরা আত্মসর্বস্ব হতে পারেন না।

মানিকের মগজের তার দ্রব্য অপরের আত্মসাৎ করা চুরি, অপরের অজ্ঞাতে বা ধোঁকা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার নাম সুবিধাবাদ। প্রথম আইনগত অপরাধ, সুবিধাবাদ সর্বজন-অনুসৃত পদ্ধতি। প্রথমটির প্রতিরোধের জন্য প্রশাসন আছে, আইন আছে এবং বিচার বিভাগের দায়-দায়িত্ব আছে। দ্বিতীয়টি সদাসর্বদা এবং সর্বত্রই সমানে ঘটে চলেছে বলে আইনও নেই, বিচারের ব্যবস্থাও নেই। যা আছে তা নৈতিকতা, moral sanction. তাই অপরকে বোকা বানাতে পারলে অপরাধ যদি কিছু ঘটেই তাহলে তার দায়ভাগ সেই বোকাতে বর্তায়, 'বুদ্ধিমানে' নয়। আর যদি কখনও কেউ সেই সুবিধাবাদীর দিকে সামাজিক-নৈতিক আঙুল তুলে নায়কে ভাবা

দিতে চায় তাহলেই সমূহ বিপদ। ঝগড়া-তর্ক-মনোমালিন্য। সুবিধাবাদের প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনও exhibit পেশ করার মতো বস্তু থাকে না, যা থাকে তা অনুমান, মানসিক বিশ্লেষণ এবং যুক্তি পরম্পরা। এ সবই আপেক্ষিক, এবং non-tangible. উত্তেজনার কারণ এখানেই।

সকল সুবিধাবাদী তত্ত্বের দিক থেকে শংকর বেপাত্তা, ব্রহ্ম-ও-মায়াবাদে বিশ্বাসী এবং তথ্যের দিক থেকে চার্বাক বস্তুতান্ত্রিকতায় আস্থাবান। সর্বজনের স্বার্থবিষয়ে মায়াবাদের প্রাধান্য, নিজের সুবিধা বিষয়ে পূর্ণ ব্যক্তিগত সুখবাদী-gross egoistic hedonist. আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে ত্যাগই মুক্তির পথ, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্রহ্মদৃষ্টিই জীবনের মোক্ষ প্রাপ্তির সম্যক উপায়। অপর দিকে জাগতিক—ব্যক্তিগত আত্মা বিষয়ক ক্ষেত্রে সর্ব-সুবিধা-সংগ্রহই সার্থকতার মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ। এই দ্বিমুখী জীবনদর্শনই সুবিধাবাদের মূল প্রকৃতি।

আপন আপন ঘর ঘর, যে না বোঝে সে বর্বর! এটা মূল প্রত্যয়। এই আপন বোধ আমাদের শিশুকাল থেকেই প্রত্যেককে নিজ নিজ cocoon-এর মধ্যে, ভাঁটি পোকার ভাঁটির মধ্যে, সহস্রসূত্রে জড়িয়ে ফেলে। নিস্তার নেই, বাইরে নেই, পরিত্রাণ নেই। এটি আমাদের জাগতিক জীবন অস্তিত্বের পরম দান, পরমার্থকেন্দ্রিক মানবীয় মূল্যবোধের উন্নত-সত্তা চেতনার কাছে তাই সুবিধাবাদ ধিক্কৃত, ঘৃণিত, উপেক্ষিত। এই ধিক্কার ধ্বনিটি যতক্ষণ নিজের কাছে নিজের মধ্যে থাকে ততক্ষণ নগণ্যই হোক সহ্য করা যায়, অপরে যখন আঙুল তোলে তখনই উত্তেজনা, বিপন্নবোধ এবং প্রতি আক্রমণ ধেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এই সুবিধাবাদের কোনোক্রম সর্বত্র প্রসারী। এমন কি সন্তান বিষয়ে মায়ের মনেও এই সুবিধাবাদের কোনোক্রম স্থান পায়! (উত্তেজনার কারণ নেই, বিচারের অবকাশ আছে!) প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি সন্তান-ক্রম মায়ের স্নেহ-প্রস্রবণের ইতর বিশেষ ঘটায়, পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তান তাঁর মনে বিভেদ-বিভিন্নতার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে না কি? চোখ-কান খোলা থাকলে সকলেই প্রত্যয় যাবেন। আর একবার যদি মাতা-সন্তানের মতো প্রীতির সম্পর্কের বেলায় সুবিধাবাদের দেখা মেলে তাহলে অন্যে-পরে আর কিই বা বলার থাকে।

তবে পীড়িত হবার মতো কারণ বোধহয় নেই। Pessimism প্রশ্রয়ে নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে আমরা সকলেই কম-বেশি 'অবনর্মাল', abnormal. সেই মনোবিকলনের মাত্রা বেশির ভাগের বেলায় এতই কম যে তা নিয়ে ভাবনার কারণ থাকলেও দুর্ভাবনার হেতু নেই। রোগ-ব্যামো তো আমাদের নিতান্তনৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু তার মাত্রা এতোই ডাক্তার-বৈদ্য নির্দেশিত মাত্রার নিচে যে কমবেশি ঘুলিয়ে হলেই চলে, হাসপাতাল পর্যন্ত দৌড়াতে হয় না। তবে সব ক্ষেত্রেই যেখানে মাত্রা বেশ মাত্রা-ছাড়া, সেখানে মনোবিজ্ঞানীর আর হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া দরকার বৈকি!

সুবিধাবাদকে সীমার মধ্যে সসীম রাখলে মহামারি ঘটবে না, সীমার মাঝে অসীম হয়ে দেখা দিলেই সর্বনাশ। রাষ্ট্র জীবনের ভীম ড্রাম কৃপাচার্য থেকে শুরু করে সরকারের মহামন্ত্রী মহামাতা মহাযেক্তখানা হয়ে মহাজনের আর শিল্পপতিদের হাত ঘুরে ঘুরে এই সর্বনাশ যখন আপামর জনসাধারণের ঘরের দাওয়ায় আর রান্নাঘরের ছাওয়ায় ছড়িয়ে যায় তখনই মহাবিপর্যয় ঘটে যাবার সম্ভাবনা। শিরে সংক্রান্তি হলে তাকা বাঁধা হবে কোথায়? ইয়েকশনের গলায়? কমিশনের কোমরে? বুরোর বক্ষে না ছোট্টারদের ঠ্যাং-এ?

জন-পরিবার ও স্ব-জন পরিবার :

আমরা সকলেই নিজ নিজ পরিবারে বাস করি। এই পরিবার প্রধানত দুই রকমের। নিজেকে কেন্দ্র করে, অথবা অপরকে কেন্দ্র করে দু-পাঁচজনের পরিবার। সম্পর্কের বাঁধন এই পরিবারের মূল সূত্র। আর এক পরিবার নিয়েও আমরা ঘর করি। সেই পরিবারে প্রধানত থাকে আমাদের অতীতের অনুশোচনা, বর্তমানের উৎকণ্ঠা আর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা। একে বলতে পারি ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির স্ব-পরিবার। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মতো এই প্রধানরা—অনুশোচনা, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তারা আসর জাঁকিয়ে বসে থাকলেও আমাদের স্ব স্ব স্ব-পরিবারে আরও অনেক 'আত্মীয়-স্বজন' আছেন যাঁরা কোন অংশে প্রধানো কম মান না তবে তফাত এই যে ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, নীতিবোধ-মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্তব্য-অকর্তব্যবোধের পরমাত্মীয়রা মাঝে মাঝে কম-বেশি দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং পরিবারের মধ্যে—মনের মধ্যে—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-পীড়ন, উত্তেজনা-বিমর্ষতা তৈরি করে নিজ নিজ কর্তব্য সমাপন করে সরে পড়েন। সরে পড়েন বটে কিন্তু যা রেখে যান তা কম নয়! রেখে যান কিছু কিছু অনুশোচনার কারণ, কতিপয় উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত এবং অনেক অনেক দুশ্চিন্তার ভার। আত্মস্থ পরিবারের ভার বাড়ে, যন্ত্রণার প্রসার ঘটে আর মানসিক চাপ বেড়ে বেড়ে পাহাড় তৈরি হয়ে ওঠে। এই পরিবারে একাকিত্বই প্রধান অনুভব, বিচ্ছিন্নতাবোধই একান্ত উপলব্ধি।

জীবনের সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বহুসম্পর্ক-সূত্র জনবহুল-পরিবারে থেকে থেকে, কাজ করে করে, অপরের প্রতি যাবতীয় দায়দায়িত্ব সমাধা করতে করতে আমাদের বেলা যায়। বেলা যায় তার কারণ বেলা কারো মুখ চেয়ে বসে থাকে না, বেলা যায় কারণ পরিবারের মধ্যেকার কচিকাঁচারা তাদের মনের নীল আর প্রাণের সবুজকে খুঁজে পায়। তারাও তখন পরিবারের মধ্যে পরিবার হয়ে প্রভাতের সূর্যকে দ্বিপ্রহরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই আমাদের দুপুর বিকেলের বেলা পেতে থাকে।

এই অবেলায় চলনে আমাদের ভাণ্ডারটিও পূর্ণ হতে থাকে। অতীত জমা হয়ে শূন্য বোধগুলোকে সাজাতে সাজাতে, কি পেয়েছি তার চাইতে কি পাই নি তার প্রত্যক্ষগুলো স্মৃতিকে পীড়ন করতে থাকে, না না করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়ে ওঠে নি তারা সব পিঞ্জর-পুরি হয়ে রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। অনুভাবনা-অনুশোচনার ভগ্নাংশ সুখের স্বাদকে তিক্ত করে তোলে। সব বর্তমান গুলো অপেক্ষার ধৈর্যহীনতার বিজ্ঞাপন এই দ্রুত সামনে এসে দাঁড়ায় আর to-be বা not to be-র অনবস্থিতচিত্ততার দোল দোলানিতে উৎকণ্ঠিত বোধ করে, সমাধান অক্ষমতায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর ক্রমশই যেন আতঙ্কের চাপ ও তাপকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে। অতীতকে নিয়ে তবু নাড়াচাড়া করা যায়, উল্টে-পাল্টে দেখা যায়, কাল্পনিক যুক্তি আর মনোমতো অপযুক্তির সাহায্য নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত সমর্থনের সুযোগ পাওয়া যায়। বর্তমান সে রকম নয়। সে একেবারেই ঘাড়ে চেপে বসে, না-ছোড় দাবি নিয়ে হাজির হয়, 'এখনই অথবা কখনই না' বলে হাঁক ছাড়ে। তীর গতি সময়কে বাহন করে তীব্র-বেগে ছুটে আসে। তাই বর্তমানগুলোর মুখে হাসি থাকে না, গোমড়া-মুখ উৎকণ্ঠার ছাপ সর্বাঙ্গে মেখে আমাদের ভয় দেখায়, আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

আর একা-অন্তর-গত পরিবারের তৃতীয় সদস্য? ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা? এই দুশ্চিন্তা

ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা নিয়ে, ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে, দুর্বল মনকে নিয়ে, স্বার্থ-কেন্দ্রিক মুক্তপক্ষ স্বাধীনতা। দুশ্চিন্তার সুতোগুলো অপরকে নিয়েও কম জট পাকায় না। স্বামীকে নিয়ে স্ত্রীর, স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীর, পুত্র-কন্যাদের বর্তমান জ্বালা-যন্ত্রণা, ভবিষ্যতের ভাবনা চিন্তা এবং শত শত অন্য সমস্যা—ঘর-বাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, নাটি-নাতনী এবং জন্ম মৃত্যু। এর পরেও আছে নিজের এবং আপনজনদের রক্তচাপ নিয়ে উত্থান-পতনের সমস্যা, চলমান বিশ্বের 'হাপরের' হঠাৎ অবিশ্বস্ত হয়ে নীরব হওয়ার সম্ভাবনা, মুখের ভাষায় মধু কমে গেলেও রক্তের উপাদান হিসেবে সেই মধুরই আধিক্য, জীবনদৃষ্টি হতে হতে হীন-দৃষ্টি হয়ে পড়ার পূর্বাভাস—চোখে এবং মনে, উভয়তই। অন্তহীন নয় দুশ্চিন্তা?

এই স্ব-পরিবারের তিন সদস্য বিশিষ্ট মন-গৃহের গৃহ-প্রবেশের দিনটি কোনও পঞ্জিকার নির্দেশ মেনে আসে না। যখন টের পাই যে দু'পাঁচজনের সামাজিক পরিবার থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছি, প্রান্তবর্তী হয়ে একাকিত্বের মেরুটাতে ভবাবাসী অনুশোচনা-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘর বাঁধতে বসেছি তখন জানতে পারি যে বেলা সরে গেছে অনেক, অনেকটাই দূরে। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বি-সমস্যা শিশুরই জন্ম অনেক আগেই ঘটে। বীজের সম্ভাবনা নিয়ে এরা সকলেই যৌবনের সরস-সতেজ-উদ্যান কাজেই মনের জমিতে স্থান পেয়ে যায়। অঙ্কুরোদ্গম থেকে শ্রীবৃদ্ধি পেতে এদের বেশ সময় লাগে। তাই বেলা গেলে এরা নিজ-নিজ identity প্রকাশ করে ration-এর দাবি তোলে। এদের—এই অনুশোচনা-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তাকে আমার প্রতিনিয়ত মোকাবিলা না নিয়ে এরা সহজেই আমাদের—পরিবার প্রধানকে, খাদ্য হিসেবে যোগানা করে বসে। সাধু সাবধান!

পঞ্জিকায় দিন তারিখ নির্ধারণযোগ্য না হলেও বলা যায় কৈশোরান্ত জীবনেই এদের বীজ উপ্ত হয়। কারণ এই সময় থেকেই সচেতন ভাবে সম্ভাব্য exclusive বিকল্পগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নেবার সময় এসে যায়। যে সব বিকল্পগুলো বাতিল হয়ে যায় অনিবার্যভাবেই, mutually exclusive বলে, তারা হারিয়ে গেলেও মন থেকে মুছে যায় না আর তাই প্রাপ্ত-বিকল্প বরাবর কিছুদূর চলার পরেই যখন বাস্তব কারণেই অট্টহাসিতে অথবা মুখ ভ্যাংচানিতে নিজেদের আত্মতৃপ্তি খুঁজে নেয়। অনুশোচনার বীজটি germinate করে বসে।

মাঝপথে গিয়ে যখন আর সময়কে back-gear-এ set করার পথ থাকে না তখন সেই পথিমধ্যেই হাংক্ষণিক to be বা not to be-র উৎকণ্ঠাটুকু পাতা ছাড়ে, নিজে আন্দোলিত হয় আর ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত-আতঙ্কে দুলে ওঠে। কিন্তু জীবনের সামনেটাই তখন বেশি লম্বা বলে, জীবনের অঙ্ক-ধারাপাতকে বার বার মুছে মুছে নোতুন করে আঁক কষার অফুরন্ত সময় সামনে থাকে বলে দুশ্চিন্তার বীজ জমি পেলেও মনের মাথা তাজা-পাতা ছাড়ে না।

বাহুতে শক্তি, রক্তে তেজ আর হাপরে দম যখন থাকে বলে এই সব স্ব-পরিবারের শিশু সদস্যদের আমরা তখন আমলই দেই না, ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিই। তাই সময় কালে, সুযোগ পেলে এই সব সদস্যরা আমাদেরই এক সময়ে সেই 'ফুঁ'-টি ফিরিয়ে দিতে চায়। তখন দোষ দিলে চলবে কেন?

ভেবে চিন্তে কাজ করার পরে কি অনুশোচনা করার কারণ থাকে? সকলেই সব কিছু ভাবতে পারে না, মানুষ সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির জন্যে দীনতা বোধ করতে পারে, অনুশোচনা কেন? মানুষ তো ঈশ্বর নয়, নয় সর্বজ্ঞ। তাহলে? মন এবং মনোযোগটাই আসল, কাজ তো জন্য-নির্ভর।

উৎকণ্ঠা? এই বিশ্বের তাবৎ বিষয় ঘটানো বা না-ঘটানো যখন ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভর করে না তখন অকারণ উৎকণ্ঠাই বা কেন? গাড়ি যদি বিগড়ে চলে তাহলে তাকে এক মিনিট এগিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে কারও? লালকালির চাড়াকে মনে করে অকারণ উৎকণ্ঠার হেতু আছে?

শেষ, দুশ্চিন্তা? নির্মোহ হলেই তো কেটে যায়। আকাঙ্ক্ষা, মোহ, attachment, মনে ছোট তোলে, দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। গীতা স্মরণ করে কাজ করলে আর মনকে অরণ্যাশ্রমবাসী করলে কঠিন পথ অনেক সহজ বলে পার হওয়া যায়। জলবৎ সমাধান নয়?

মা ফলেষুঃ

ছোট বেলা থেকেই মা-বাবার নির্দেশে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হয়। আঙুল গুণে গুণে এক দুই, অবুঝের মতো নামতার স্বরলিপি — স্বরলিপি-না-সংখ্যালিপি? — তালপাতা নির্ভর অথবা slate-মাধ্যম অ-আ-ক-খ- এর বর্ণমালা, বকচ্ছপ-ছড়া আর Humpty-Dumpty rhyme গুলোর নির্বোধ উচ্চারণ এবং আরও কতো কি? সে-সবের কতটুকু আমাদের তখন প্রয়োজন থাকে, কি তাদের উদ্দেশ্য-বিধেয় তা-সবের কিছুমাত্র না জেনে-বুঝেই তো আমরা সে-সব নিষ্কাম-নির্ভেজাল অনুসরণ করে থাকি। এমন কি অনেকেই আমরা শক্ত শক্ত কবিতার ঘটমান উচ্চারণের নুড়ি-পাথর ভেঙে ভেঙে হোঁচট খেতে খেতে ক্ষতবিক্ষত রাস্তা পার হয়ে এগুতে বাধ্য হই। আমার মনে আছে যে বয়সে বাবার হাত ধরে সকালের শিশির ভেজা মাঠে ঘুরে বেড়ানোর কথা আর বিকেলের সূর্যকে সাক্ষী রেখে সবুজের সঙ্গে মিতালি পাতানোর সময় তখন গীতা-চণ্ডীর নির্দেশিত অংশ আবৃত্তি করতে হত!

তখন বুঝিনি, এখন বুঝি 'মা ফলেষু কদাচন' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়। কাজেই তোমার অধিকার ফলে নয়—এই বাক্য বা নীতি-নির্দেশ অবুঝ বয়সে যতটা সত্য সারা জীবনে তো তা আর তেমন করে সত্য বলে মনে হল না! অপরের আঙুল ধরে চলার চাইতে আঙুল ছেড়ে দিয়ে চলার সময়টা যে জীবনে অনেক বেশি তা টের পেতে অনেকের মতো আমারও বেশি সময় বিধাতা ধার্য করেন নি। Teen-age শেষ হবার বহু আগেই লৌহ-কঠিন বাস্তব জীবনের পেষণ শুরু হয়ে গেল, iron-age-এর সূচনা ঘটে গেল। আর তখন থেকেই তো উদ্দেশ্যহীন কাজ করার ইতি। 'মা করবে বেশ ভেবে চিন্তেই করবে' বলে চারধারের ঘোষণা শুরু হয়ে গেল। Means এবং ends এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার সময় এসে গেল। লক্ষ্য স্থির রেখে স্থির-লক্ষ্য না হতে পারলে যে জীবনে অপচয়ের মাত্রাই বেড়ে যাবে তা তখনও যেমন সত্য ছিল এখনও তেমনি সত্য আছে। সকলের জন্যেই, সব সময়েই তো উদ্দেশ্যকে ধ্রুব করে নেবার নীতি-নির্দেশ সমান সত্য। তাহলে ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজে মন দেবে কি করে? শৈশবই কি গীতা-উক্ত কৃষ্ণ-কথার উপযুক্ত বয়স-সীমা?

শৈশবে কোনও শিশুই তো এক-দুই-তিন কেন মুখস্থ করতে হবে জানতে চায়না, তারা তো নিরাসক্ত হয়েই নামতার steam roller-কে মেনে নেয় আর বর্ণমালার বর্ণ-চোরা ভবিষ্যৎ-কে

না-জেনেই আমরে হাত" বুলায়? ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সেই সব কাজই পরবর্তী জীবনে তাদের এক-দুই-তিন-দুই-একের অমল-বিমল এবং ইন্ডিজিতের জীবন-দর্শনে, অর্থে-তাৎপর্যে, সত্য হয়ে ওঠে।

আর তার পরেই শুরু হয়ে যায় কেন? কেন? 'কেন? মায়ের অনুরোধ, পিতার নির্দেশ, শিক্ষকের উপদেশ এবং প্রতিবেশীর অনুনয় আর সারাজীবনেই তো 'কেন-হীন' মানতা পায় না। এটা কর—তো কেন? ওটা করতে নেই—তো কেন? ওখানে যেতে নেই—তো কেন? তার সঙ্গে মেশে না—তো কেন? এই সব 'কেন-কেন?'-রা আসলে ফলের আকাঙ্ক্ষাকেই সোচ্চার তুলে ধরছে। উদ্দেশ্য-বিষয়ে সন্দেহ জানার আগ্রহকেই প্রধান করে তুলছে। বিচার-বিশ্লেষণ reasoning হাত-পা ঝাড়া দিয়ে স্বাবলম্বী হতে চাইছে। তাহলে ঐ কাজেই তোমার অধিকার, কদাচ ফলে নয়' — এই কথাটা কেমন করে হবে?

আমরা মাঠে নেমে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিন্তু জয়ের আকাঙ্ক্ষা করব না, পাঠশালা-বিদ্যালয় যাব কিন্তু বৎসরান্তের 'ফলে' মন দেবো না, অফিসে যাবার জন্যে নাকে-মুখে গুঁজে ছুটব কিন্তু লাল-কালি এড়ানোর লক্ষ্যে চোখ রাখব না, মন দিয়ে একান্ত হয়ে চাকরি করব কিন্তু promotion-দুটি কদাচ মনের কোণে ঠাঁই দেবো না এবং অবসর নেবার সময়ে P.F বা gratuity-লক্ষ্য হব না! এ-তো প্রায় বিড়ালকে মাছ পাহারায় সৎ হবার পরামর্শ,বাঘ-সিংহকে কণ্ঠিধারী ফলাহারী জীবন যাপনের উপদেশ এবং Licence-Permit-CMC' কেন্দ্রের বাবুকে টাকা-মাটি মাটি-টাকা বোধে কাজ করার নির্দেশের মতো বন্ধ্যা-পুত্র-পরিকল্পনা!

বরং বলা যায় যে গীতা সত্য শৈশবে বাল্যে, বিপরীত সত্য যৌবনায় বার্ধক্য-ব্যক্তি জীবনে। কর্মযোগ নয়, ফলেন অধিকারস্তে মা কদাচন কদাচন! প্রথম নিদর্শন সরকারী দপ্তর। দ্বিতীয় প্রমাণ যাবতীয় শিক্ষালয় শিক্ষা আধিকারিক শিক্ষাসহ সমূহ। সবেরই কর্মের বেলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাসান্ত ফলের বেলায় তাঁই-তাঁই! এবং তৃতীয় উদাহরণ কোর্ট-আদালত-বিচারালয়। এক-দুই-তিনের সংখ্যাজ্ঞান সেখানে নামতার geometrical proportion-এ চিমালয়ের মতো ভারি হয়ে সাংখ্যের পুরুষ হয়ে স্থির বসে আছে। কারণ সাংখ্যের পুরুষের মতোই তারা নিষ্ক্রিয় ভোক্তা মাত্র 'ফলের' আশায় তারা অপেক্ষাকে একান্ত করে ফেলেছে, কর্মের অধিকার সমাধির বোধি-লাভ করেছে সেখানে। আর উদাহরণ বাড়াতে ভরসা নেই কারণ সেই 'ফলের' সম্ভাবনা। নিষ্কাম প্রেক্ষা কোনও কাজের কথা নয়, পৃষ্ঠদেশ অ-বিজিত রাখার বাসনা তদপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ! কারণ এতজন যাদের ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং কর্মের অনীহা বিষয়ে উল্লেখ করেছি তারা সম্ভবত তেড়ে আসবে না যেহেতু তাদের পক্ষে আমার পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন ফলদায়ী হবে না! কিন্তু রাজনৈতিক নেতা আর সমাজের পাণ্ডাদের হাতের প্রসার সুদূর বিস্তৃত এবং হস্ত-পদ ব্যবহারে তাদের অসীম আনন্দ বোধ হইতে পারে! এবং পৃষ্ঠদেশের বিষয়ে কোনো ফ্রিশিনেস গুরুর নিষেধ!

আচ্ছা, নীতি-প্রবক্তার নিজের ঘোষণা কতোটা সুসমঞ্জস? ধর্ম-সংস্থাপনার্থে, অধর্ম থেকে ধর্মকে বাঁচানোর জন্যে, সেই লক্ষ্যে, তিনি নিজে যুগে-যুগে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর মায়া বা আগমন ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত নয় কিন্তু! 'আপনি আচরি ধর্ম' তাহলে সর্বথা এবং সর্বজনে সত্য নয়! তখনকার মানবশ্রেষ্ঠের জন্যেও নয় এখনকার মানবশ্রেষ্ঠ শীতাতপ-কক্ষ-বাসী নেতৃকুলের জন্যেও নয়। নীতি-প্রয়োগ-বিভাজনের বেলাতেও তাহলে 'তোমার-আমার আমার-আমার' প্রকৌশল

প্রয়োজন? তাদেরই ধর্ম—তেন ত্যক্তেন—তোমার জন্যে। মোক্ষ ভোক্তার জন্যে নির্দেশিত—আমার অধিকার,'পুরুষের' অধিকার। মা-মরেষু কদাচন—তোমার জন্যে নির্দেশ, কর্মেই তোমার অধিকার। জ্ঞানি উপস্থিত হলেই 'আমি'। বেশ, বেশ, জলের মতোই সহজ বোধ, সরল-তথ্য।

সমাজ-সংসারের পিঠে ভাগের—পিষ্টক-বিভাজনের এ-মতো সূচী-সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপত্র দ্বিতীয়টি আছে কি?

শোষণ ঃ

শোষণ কথাটি আধুনিক সময়ে বহুল প্রচলিত। কার্ল মার্কস ধারণাটিকে একটি বিপ্লবকারী গতি দিয়েছেন। শ্রেণী শোষণ। অর্থনৈতিক পটভূমিকায় শোষণের সার্বিক সত্যকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের তাৎপর্যে তিনিই প্রথম সর্বসাধারণের ভাবনা-চেতনার কাছে পৌঁছে দিলেন। তিনি দিলেন না বলে বরং বলা যায় যে তাঁর ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রবাদ জনমানসের একটা বিরাট অংশকে প্রভাবিত করল, একটা রাজনৈতিক চেতনা দলবদ্ধ হয়ে দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ঢেউ হয়ে এই শোষণের তত্ত্বকে অ-সাধারণ তাত্ত্বিক স্তর থেকে মুক্ত করে সাধারণ জনের জীবনবোধকে আলোড়িত করে তুলল।

প্রাকৃতজগতে শোষণ নেই কারণ সেখানে অর্থনীতির স্থান নেই। আদিম মানুষের জীবন যাপনেও শোষণের স্থান ছিল না কারণ অর্থনৈতিক পটভূমি ছিল না। দলবদ্ধ যাযাবর জীবনে সকলের সমান অধিকার ছিল। সেই খাদ্য-সংগ্রহ কেন্দ্রিক জীবন যাপনে আর যা প্রয়োজন ছিল তা সুরক্ষা-আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা। সকলের অধিকার স্বীকৃত ছিল, দুর্বলের ভাগ্যে কৃপাহীন উপেক্ষা এবং বঞ্চনা, কখনই শোষণ নয়। এক গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে শোষণের সম্ভাবনা দেখতে পায় নি। অভিব্যক্তির নিয়মে, বাঁচার-জন্যে-সংগ্রামের নিয়ম ছিল স্বাভাবিক। যোগ্যের উদ্বর্তন এবং অযোগ্যের অপসারণ ছিল প্রকৃতি নির্দেশিত আইন।

শোষণ তাই সভ্যতার দান, স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত অস্ত্র। মানুষের বুদ্ধি যতো বেড়েছে, অভিজ্ঞতা যেমন যেমন দানা বেঁধে উঠেছে, মানুষ তত বেশি নিপুণ ভাবে শোষণের প্রথা-প্রকরণ খুঁজে পেয়েছে এবং তেমন তেমন প্রয়োগের ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের রোষের সামনে সে অসহায়-বিবশ বোধ করেছে, ভীত হয়েছে। ঝড়-প্লাবন, দাবানল-অগ্ন্যুৎপাত, মহামারি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত-অতিবৃষ্টি। তাই ভিতরে জন্ম নিয়েছে ভয় এবং সেই ভয় থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বাইরে উপস্থিত হয়েছে ধুরন্ধরদের ইন্দ্রজাল আর বুদ্ধিমানদের ঈশ্বর, ভগবান। দেহগত ক্ষমতার বিভিন্নতা মানুষকে শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন করে না, বুদ্ধিগত ক্ষমতা সেই কাজটি অনায়াসেই করে থাকে। Have আর have-not-এর ধারণা—অনেক পরের ধারণা। তার আগেই equal থেকে different-এর বোধ মানুষের মনে সম্ভাব্য স্বার্থ-চেতনার বীজটিকে অংকুরিত করে দেয়। কৃষির উদ্ভব সেই চেতনাকে পুষ্ট করে তোলে।

সভ্য মানুষের যাত্রা শুরু কৃষি সভ্যতার উর্বর ক্ষেত্র থেকেই। এই যাত্রাপথে তার সংগ্রহ

তিনটি। এক, অবসর, দুই শ্রেণীভেদ এবং তিন শোষণ। প্রথমটি মানুষকে দিল মাথা খাটানোর নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। সম্ভব হয়ে উঠলো জ্ঞানবিস্তারের পরিশীলন, কাব্য-ইতিহাস-মহাকাব্যের কণ্ঠস্থতা তার কাছে হয় অবারিত। দ্বিতীয়টি বাস্তব হয়ে উঠলো শরীর-প্রধান মানুষ থেকে মস্তিষ্ক-প্রধান মানুষের প্রাকৃতিক বিভেদজনিত কারণে। শ্রমের প্রয়োজন, জমির প্রয়োজন, প্রশাসনের প্রয়োজন, দেখাশুনো করার প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন। ক্ষমতা সকলের সমান নয়। বিভাজন অনিবার্য এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেল। তার পরে সমগ্রাহীয়-বোধে সমস্বার্থ নৈকট্যের কারণ হয়। তখন তৃতীয়টি আর দূরে থাকতে পারে কি? ক্ষমতার স্বভাবই ক্ষমতাবান থাকা। ক্ষমতা শক্তির আধারও বটে প্রকাশও বটে। যে যে সম্ভাব্য প্রথাপ্রকরণে ক্ষমতাকে একই কেন্দ্রে স্থির রাখা যায় তার ব্যবস্থা সর্বপ্রকারে অনুসৃত হল।

মানুষ মরণশীল, কিন্তু ক্ষমতা নয়। তাই বংশকেন্দ্রিক ক্ষমতা ভোগ ক্ষমতাবানের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সামাজিক বর্ণাশ্রম পথের দিশা দিল। অপরের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে না দিতে পারলে অকারণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা। তাই ধর্মকে, ঈশ্বরকে এবং ধর্মস্থানকে সর্বাগ্রে কাজে লাগান হল। এতৎসত্ত্বেও সামাজিক উত্থান ঘটে যেতে পারে! তাই সামাজিক চেতনাকে নিস্তরঙ্গীয় করে তোলার জন্যে 'মনু' এবং মনু-শৃঙ্খল তৈরি করা আবশ্যিক হয়ে উঠলো। নারীর প্রাধান্য বাস্তব সত্য, পুরুষের জীবনে। ভবিষ্যতের গর্ভের এবং সমাজের এই অত্যন্ত শক্তিশালী প্রকৃতি সম্বন্ধিত উৎসটিকে সমূলে উৎপাটিত করে পুরুষ নিষ্ঠুর করে তোলার যাবতীয় ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত, সামাজিক-মানসিক দিক থেকেই, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম-কানুনে বেঁধে দেওয়া হল।

শোষণের হাতেখড়ি-প্রয়োগ তাই অর্থনৈতিক বাতাবরণে নয়, সামাজিক-মানসিক জীবনে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার একান্ত বাসনা থেকে, স্বার্থ চেতনার ব্যক্তি কেন্দ্রিক অভিলাষা থেকে আর শক্তিকে বংশপরম্পরায় ভোগ করার লালসা থেকেই শোষণের জন্ম। অপরকে বঞ্চিত করার প্রাণিধর্মকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ আর সম্পন্নতার মাত্রা বাড়ে, সেই মাত্রা-বৃদ্ধি অন্যের পথে ধেয়ে যায় শোষণের মাধ্যমে। শোষণ তাই মানুষের স্বভাবে সত্য, প্রাণিস্বরূপে নয়।

শোষণ যে মানুষের স্বভাব সত্য তার ভূরি-ভূরি উদাহরণ আমাদের গৃহে-পরিবারে, পরিবেশে-সমাজে, ধর্মে-বিশ্বাসে এবং দলবাজি-ঘলবাজি-রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। গৃহে-পরিবারে দুর্বল শুধু বঞ্চিতই হয় না শোষিতও হয়, exploited হয়। বিনয় এবং মানাতা সমাজ-প্রতিবেশীর জন্যে শোষণের ক্ষেত্রকে উর্বরা করে রাখে। ওঝা-বৈদ্য-হস্ত-রেখাবিদ গ্রহ-রত্ন-বিচার-সম্রাট থেকে পেঁচা-পেঁচি ঝাড়ফুঁক ধাগা-বাটি-চালান চাল-পড়া-ধুলো-পড়া ইস্তক সর্বত্রই সহজ বিশ্বাসের শোষণ সেই কবে থেকেই চলে আসছে। পূজা-মানত থেকে নরবলি পশুবলির ব্যবস্থা দেবস্থান কৃত শোষণ। অজ্ঞতা এবং ভয়কে মূলধন করে সজ্জনেরা, ধূর্তরা সকলকে শোষণ করে থাকে।

তাই দেখতে পাই পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে নিজ-নিজ কার্যোদ্ধারের জন্যে exploit করছে। তাই ব্যবসায়ী ক্রেতাকে, আধিকারিক প্রার্থীকে, শিক্ষক ছাত্রকে, উপরওয়ালা অধস্তনকে, উকিল মক্কেলকে, নেতা জনগণকে exploit করে আখের গোছায়, পুষ্ট হয় এবং আরও বেশি শোষণের জন্যে বুদ্ধিতে শাণ দেয়। আইনকানুন তৈরি হয় সকলের মঙ্গলের জন্যে, সমাজের সকলকেই সমদৃষ্টি, সম সুযোগ এবং সম-অধিকার দেবার মহৎ বাসনায়। কিন্তু সেই সব

আইনকানুন ব্যবহার হয় কতিপয়ের সুবিধার জন্যে, শোষণের জন্যে। ক্ষমতাবানদের দ্বারা ক্ষমতাহীন শত-সহস্রকে বিপন্ন করে শোষককে ফুল-বিরাগন্ত দেবার জন্যে। আইন-আদালত, বিচার ব্যবস্থা-প্রকরণ এমন ভাবেই নির্ধারিত।

এ ভাবেই চলে ব্যক্তি শোষণ আর শ্রেণী শোষণ। কতিপয়ের দ্বারা বহুজনের শোষণ। অর্থনৈতিক ব্যাপারটি প্রধান হলেও সব নয়, সবটুকু নয়। আগেই সেই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

এই শোষণ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান কাজে লাগে, সাহিত্য কাজে লাগে, ধর্ম ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা অত্যাধুনিক সমাজ জীবনে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষায় এক বিশেষ সুবিধার স্থান দখল করে আছে। Atom bomb, V2, Patriot, NPT, PL 480, World Bank, IMF, Super Computer এবং আরও শত-এবং-এক মাধ্যমে ক্ষমতা অক্ষমকে শোষণ করছে, করবে। মধ্যবিত্ত জীবন-সাহিত্যিকরা মুচি-মাথর-ডোম, বেশ্যা call-girl-nymphomaniac দের নিয়ে চটকদার উপন্যাস বা গল্প তৈরি করছেন। চোর-পাচারকারী, শ্মশান-ভূত, পকেটমারদের নিয়ে লাগসই dialogue-ব্যবহারে রবরবা নাটক-নভেল-গল্প তৈরি করছেন। কেন? বিক্রি বাড়বে, লোকে 'খাবে', চাই কি একআধটি পুরস্কারও মিলে যেতে পারে। ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলানোর ব্যবস্থা! Exploitation নয়?

সর্বহারার নেতা Underground এ নিজের বাসস্থানকে স্বর্ণমণ্ডা fort করে ইন্দ্রের স্বর্গে বাস করেন! অনেকেই পাঁচ-দশ বিঘে জমির উপর 'বাংলা' বানিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন গরীবদের জন্যে শান্ত ভাবে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পাবেন বলে! মিথ্যাচার এবং শোষণ উভয়ই নয়? ব্যক্তি বা শ্রেণীই শোষিত হয় তা নয়, ধারণাও শোষিত হয় যে।

শিক্ষার জগাই, অশিক্ষার মাধাই : (১)

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা, না, মানুষকে সফল মানুষ করে তৈরি করা? এটাই বোধহয় একটা মূল প্রশ্ন। অতীতে কখনও মানুষ হয়তো প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান স্বীকৃতি ও সার্থকতা পেয়ে থাকবে। বর্তমানে, যবে থেকে আধুনিকতা সভ্যতার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাফল্যই মানুষকে আকর্ষণ করছে। আধুনিক সভ্যতার মূল্যায়নসমূহও মানুষের বাইরেটাকে কেন্দ্র করেই নিশ্চিত হচ্ছে, উন্নতি বলতে ভোগকে, প্রগতি বলতে জীবন যাপনের প্রকৃতি-পদ্ধতি-উপকরণের উপভোগের গুণ ও পরিমাণকে নির্দেশ করছে। অন্তরের সম্পদের চাইতে সংগ্রহের সম্পন্নতাকে, জ্ঞানের দীপ্তির চাইতে কর্মের কুশলতাকে এবং চরিত্রের মাধুর্যের চাইতে আচরণ-ব্যবহারের চটককে, বাইরেটাকে, বেশি মূল্য দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা সমস্যার মূল কেন্দ্রটি বোধহয় এই মূল্যায়ন-বিবর্তনের, বা পরিবর্তনের, উৎসে দানা বেঁধে উঠেছে। Plain living and high thinking-এর দিক নির্দেশটি এখন আধুনিকতার তাড়নায় পশ্চিম দৃষ্টি হয়ে High Living and self thinking হয়ে জন-জন আকর্ষণ করে চলেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে শিক্ষার তাত্ত্বিক নক্সাটি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না, কল্পিত কি না।

মানুষ গড়ার পরিশীলন কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মনে করাটা, অন্তত বর্তমান যুগে, একটা কল্পনার বিলাস মাত্র। অতীতের আটহাত দেশজ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ এবং স্বাস্থ্যসেবা শুদ্ধ করে উত্তরীয় আচ্ছাদনের সুশীল জীবন-দর্শন এখন কষ্ট কল্পনা মাত্র। অন্তরের গভীরে তৃষ্ণার প্রতি আকর্ষণকে একান্ত করে চিন্তনাত্মক সংসারে একমাত্র সত্য দৃষ্টি স্থির রেখে, সচ্ছিলানন্দ ব্রহ্মে মতি রেখে, মনুষ্যত্বের শিখর-পথ অনুসারী হওয়াটাও এখন অজ্ঞতার-মূর্খতার-অবাস্তবতার উদাহরণ হবে।

বিশেষ করে এই জন্যে যে হেমন কোন মানুষ গড়ার পরিশীলন কেন্দ্র আদৌ কখনও ছিল কি? না-কি, সে কেবল আমাদের কল্পনার জগতে একটা আদর্শনিষ্ঠা, একটা utopian বা Plantonic Idea মাত্র হয়েই অনাদি-অনন্ত-অস্তিত্বহীন মানবীয় আকাঙ্ক্ষা হয়েই উপস্থিত ছিল? এ-প্রশ্ন কম চিন্তাসার নয়। কারণ সেই পরিশীলন কেন্দ্রে যে সব উৎকৃষ্ট মানুষ গঠন হত তাঁরাই কিন্তু জাতি-শ্রেণি, বর্ণভেদ, ছুত-অছুত নীতি-নিয়ম-নির্দেশ অবলীলায় উদ্ভাবন করেছেন, চালু করেছেন এবং পড়িদড়া হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী রাখার মাবতীয় ধর্মীয়-সামাজিক ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। যে শিক্ষা ব্যবস্থা, যে পরিশীলন মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদটাকে চিরায়ত করার অনুশীলনকে মান্য মনে করে, যে বুদ্ধি ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকার জন্যে অস্ত্র হিসেবেই তাকে ব্যবহার করে, যে জ্ঞান নবজাত শিশুকে শিশু হিসেবে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হিসেবে না দেখে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শিশু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, এবং অনুশীলনলব্ধ যে প্রত্যয় শ্রেণী স্বার্থ সুরক্ষায় সদা নিয়োজিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই পরিশীলন, সেই জ্ঞান এবং সেই অনুশীলন কদাপি 'মানুষ গড়ার' কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতে পারে কি?

তাই এটা কি মনে হতে পারে না যে সেই Plain living-টা অমনোপায় ছিল? অথবা 'Plain' ব্যাপারটা relative বলেই ঘি-দুধ-মলী-মাখন-ছানার 'স্বাদ' দুই জানী জনেরা, ব্রাহ্মণ জনেরা, ভক্ত-পুরোহিত জনেরা, পরিচ্ছদের ঢেকুর তুলে তুলে শত-সহস্র নিরন্ন-অভুক্ত-কৃশ-ক্লান্ত অনাদামের সামনে 'Plain living এবং high thinking-এর আদর্শটি দোদুল্যমান ঝুলিয়ে রাখতেন? এবং সেখানে 'Plain' মানে আট-হাত ধোতা ধুতি-সর্বস্ব নিম্নাঙ্গ, উর্ধ্বাঙ্গে পিতৃদত্ত চর্মাচ্ছাদনই মধ্যেই, পেটের জন্যে মোটা-ভাত আর জীবন যাপনের জন্যে সমাজশ্রেষ্ঠদের জমি-জিরেতে, ঘরে-অঙ্গনে বিদমতগারিই প্রশস্ত?

ভণ্ডামি বা শঠতা কি আধুনিক সভ্যতার দান? এরা কি মানবীয় গুণ হিসেবে মানুষের সমউৎস, সমসাময়িক নয়?

শিক্ষা সমস্যাটিকে তুলে ধরতে গিয়ে তাকে যতটা জটিল মনে হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে সে তার চাইতেও বেশি জটিল। অতীত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থার তাহলে প্রভেদ কোথায়? শিক্ষা তখনও বিভেদের, শ্রেণীস্বার্থরক্ষার এবং ভোগ-উপভোগের মাধ্যম ছিল এখনও তো তাই-ই আছে। তখনও উপযোগবাদ প্রধান ছিল এখনও সেই Utiliterianism-ই প্রধান। সব সমাজেই শিক্ষা ক্ষমতাবানদের হাতিয়ার। বৈদিক সমাজে মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের, আর্যসমাজে আর্য-ব্রাহ্মণদের, মধ্যযুগে সম্রাট-সাহেন-শা-রাজা-মহারাজাদের, বৃটিশ যুগে সাহেবদের এবং আধুনিক যুগে নেতা-ব্যবসায়ী-আমলাদের অধিকার, ক্ষমতা এবং সুবিধাভোগের হাতিয়ার হয়েই শিক্ষার আদর্শ-উদ্দেশ্য-প্রকরণ নির্ধারিত হয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার সহস্রাক্ষ দৃষ্টিতে সহস্র-পথ উন্মোচনে এবং সহস্রগুণ গতি বৃদ্ধিতে শিক্ষার দেহ-মনে প্রভূত পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেছে। নানা মতবাদ, যেমন স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ, বাস্তববাদ, ভাববাদ, উপযোগবাদ—নানা দিক থেকে শিক্ষার স্বরূপ, পদ্ধতি, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে 'আলোকপাত' করার চেষ্টা করে চলেছে। জটিল তাই অনিবার্যভাবেই জটিলতর হচ্ছে।

এবং আমরা সকলেই শিক্ষাকে Pass-Port সংগ্রহ office বা দপ্তর বলে মনে করে চলেছি। ব্যতিক্রম যদি কিছু থাকে তাহলে তা এই পাঠ্যতালিকা-নিয়মকেই প্রমাণ করে মাত্র, বৃহৎ কর্মযজ্ঞে দু'চারটি প্রতিভা এবং talent by-product হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে, দু'চারজনকে প্রভাবিতও করতে পারে। সে অন্য কথা, বেনিয়মের কথা, ব্যতিক্রমের কথা।

এই Pass Port ডিগ্রী certificate বা diploma-র মতো দেখতে। সংস্থার কুল-মান এই প্রদানের পত্রের গুণ-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় বলেই আমরা মনে মনে English medium সংস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ি। ছিড় বাড়তে বাড়তে একসময় উপচে পড়ে। স্বাভাবিক। যোগ্যতা ক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ তীব্রতা অনুযায়ী তাড়িত করে। প্রশ্নপত্রের অক্ষমরা দেশজ বিদ্যালয়-মাদ্রাসায় ভিড় করে। বিদ্যাপীঠস্থানের আর্থসামাজিক নাম-ডাক অনুযায়ী অথবা নাম ডাকের প্রভাবের মাত্রা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগী মনোভাব, যোগ্যতা এবং প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। Investmentপ্রার্থীর পয়সা স্থির করে দেয়, পুরস্কার আবরণটি নিশ্চয় করে দেয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা অনিবার্য নয় কি?

অতীত দিনে গুরুদের জন্যে শিক্ষা প্রস্তুত ছিল। নির্দেশিত। বর্তমানে অন্য উপায়ে শ্রেণীকরণ নিশ্চিত হয়েছে মাত্র। ঘোষিত নীতি আর বাস্তব প্রয়োগে যদি গড়মিল থাকে তাকে কি বলা হবে?

আমরা যারা সমাজের নেতা, নীতি নিয়ামক, তারা কি সন্ন্যাস নিয়েছি? আধুনিক গণতন্ত্রের পটভূমিতে ঈশ্বর নয়, ভোটই আমাদের দেবতা নয়? সামাজিক-আর্থিক পীঠস্থানগুলি থেকে মহাসম্ভব ছিড়-প্রতিযোগিতা হটানো কাম্য নয়? আপন বুঝ পাগলেও বোঝে, আমরা পাগল হলে অপরের কি লাভ হবে না? তবে আমরাও পাগল, কিন্তু ক্ষমতা পাগল, নেতৃত্ব পাগল, স্বার্থ পাগল। ওম্ তৎ সৎ।

শিক্ষা যে জটিলতম বিষয়গুলির মধ্যে বা ধারণার মধ্যে অন্যতম তা বলার অপেক্ষা রাখে। এটি একটি composite Concept-অনেকটাই 'মানুষ' শব্দটির মতো। বহু বিচিত্র-বিপরীত-বিরুদ্ধ গুণ-স্বভাব প্রকৃতি-বিবরণের সহাবস্থান ক্ষেত্র বা কেন্দ্র। শিক্ষা ধারণার মধ্যে বহু স্রোতবিভক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিচিত্র-বিভিন্ন উৎস-ক্ষেত্র-প্রসারের অ-প্রাতিষ্ঠানিক 'জীবনের বাস্তব শিক্ষা' এবং প্রত্যেক জীবনের প্রথম দুই বছর থেকে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রথম শব্দ-বাক্য-বর্ণমালাহীন জ্ঞানোদয় এবং orientation-এর প্রাকৃতিক শিক্ষা। এই ত্রি-উৎসের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু স্থান জুড়ে থাকে? মস্তিষ্ককে তত্ত্বের এবং তথ্যের যোগান দেওয়া প্রধান কাজ। তার বাইরে বুদ্ধির Processing, হাত-পা-চোখের কুশলতার ব্যায়াম ও অনুশীলন, ব্যবহার বিধি সমূহের প্রথম প্রকরণ অনেকটাই স্থান জুড়ে থাকে। এই শিক্ষা যৎ সামান্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগলেও লাগতে পারে। বাকি অধিকাংশই অপচয়ের হিসেবে জমা হয়ে যায়।

কারণ অধীত বিদ্যার ধুলো পড়ে, মরচে ধরে, নষ্ট হয়ে যায় এবং অকাবহার-অপকাবহারে পাংশুবর্ণ-বাহিরের পর্যায়ে চলে যায়।

কিন্তু যে শিক্ষা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে শৈশবে বর্ণমালা হয়ে আমাদের বোধের গভীরে দাগ কেটে যায় প্রথম দুই বা পাঁচ বছরে, অন্য সকলের অজ্ঞাতে এবং অজ্ঞতায়, সেই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের শিক্ষার প্রকৃত ভিত। তার উপর জীবনের বাস্তব শিক্ষাই edifice টি তৈরি করে। সেইখানেই আমরা আমাদের নিজ নিজ শিক্ষার মূল কাঠামোটি এবং 'বাসগৃহ রূপ'-টি পাকা করে ফেলি। সেই শিক্ষাদেহের edifice-এ আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চুনকাম ও decoration চড়াই।

এবং এই চুনকাম আর decoration দেখে যখন আমরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত যাচাই করি, নির্ণয় করি, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়ে পড়ি। অনিবার্য নয় কি? বাইরের চকমা আর বিজ্ঞাপন দেখে ভিতরের বস্তুস্বরূপ জানার পথ থাকে কি?

থাকে না বলেই তো যতো বিড়ম্বনা। এবং ঘরে বাইরে অশান্তি। এবং Commission ইত্যাদি।

শিক্ষার জগাই, অশিক্ষার মাধাই : (২)

শিক্ষা যে একটা সমস্যা এবং তা যে বেশ জটিল তা মানুষের নিজের সৃষ্টি। বন্যপশুটি প্রাণী জগতে কোন সমস্যাই নয়। সেখানে যেটুকু 'শিক্ষা' প্রয়োজন তা পরিবেশ-প্রকৃতি এবং প্রাণী-প্রকৃতির সহজ-সরল সেনাদেনেই মেটে যায়। প্রকৃতিতে উদ্দেশ্য যেমন সাদা-মাঠা শিক্ষণ পদ্ধতিও তেমনি সোজা-সাপ্টা। সভ্যতা-সংস্কৃতি, চরিত্র-ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-সমাজ, নীতি-আদর্শ, এবং ইত্যাদি নিয়ে মানুষের জীবনে পাঠশালা-মাদ্রাসা, স্কুল-বিদ্যালয় এবং শতেক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। শিক্ষার Net-work যতো জটিল রূপ নিয়েছে, যতো বিচিত্র পথে প্রসার পেয়েছে এবং যতো বিচিত্র দাবি মেটানোর জন্যে নিজেকে প্রতিনিয়ত ছেলে সাজিয়েছে এবং সাজাচ্ছে ততো সে জটিলতর-ভিন্নতর-বিচিত্রতর হয়ে উঠছে। শিক্ষার সমস্যা তাই মানুষের শত-সহস্র উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন থেকেই গজিয়ে উঠেছে।

যখন কোনও সমস্যা নিয়ে আর থৈ পাওয়া যায় না তখনই অনিবার্য হয় Commission, Seminer, Symposium পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথাগুলো সেখানে ঘর্মাক্ত হয়, বিশেষজ্ঞদের ক্ষুরধার বুদ্ধিগুলো তখন কাটাকুটি, গ্রহণ বর্জন আর amendment-resolution-এর ঘাট খুঁজে মরে। শিক্ষা সমস্যাটিকে তাই দীর্ঘ জলজোনে বাড়িয়ে তুলে, আশাহা-কুশাহার জল-জরণা করে, উচ্চকোটি প্রশাসন সমাজ হাঁক পাড়তে থাকে 'পথ দেখাও, পথ দেখাও!' অনেকটাই সেই kick dust and then complain you can't see-এর মতো। রাজাময়, দেশময়, তোলপাড় হতে থাকে, সকাল-বিকেল session বসে, উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে, দৈনিকে-সাপ্তাহিকে-পাক্ষিকে ছোট-বড়তাত্ত্বিক-তৃণমূলের তাত্ত্বিকদল সেই সমস্যা এবং সমস্যা-সমাধানের অর্থনীতি-সমাজনীতি, ইতিহাস-ভূগোল বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে প্রলয় নাচন নাচতে থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নন্দী-ভৃঙ্গীরা

আসরে নেমে আসরকে সরগরম করে তোলে। একসময়ে অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে সকলেই ক্ষেত্রান্তরে প্রস্থান করে, সেখানে তখন সমূহ তাপ সৃষ্টি হয়, সোরগোল শিক্ষা-সমস্যা থেকে দূরে সরে যায়। আর ঠিক তখনই সমস্যা, সমস্যা সমাধানের সূত্র-সমূহ, তার ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা-স্তূপ দামী দামী মোরোক্কো-বন্দি হয়ে shelf বা আলমারির তাকে অনিবার্য ধুলোর অপেক্ষায় স্থির-অনড় morgue-জীবন যাপনে বজ্র-চক্ষু অপেক্ষা করতে থাকে।

উচ্চকোটি প্রশাসনের suited-booted খটাখট্ চলন, Everest সদৃশ প্রতার চাদর-ঝক্ক শান্ত আগমন-নিষ্ক্রমণ এবং ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি আত্মভোলা বিতানমনস্কতার স্থির নিশ্চিত surgery-dissection যখন চলতে থাকে শিক্ষা সমস্যার দেহ-আত্মা-রক্ত-রসকে ঘিরে ঘিরে তখন আমলাতন্ত্রের পুরোহিতরা পাণ্ডীর্যের নামাবলি সর্বাঙ্গে লপেটা-এঁটে, তর্জনীটি ঠোঁটের সামনে লম্ব-নির্দেশ করে নৈশব্দকেও সভয় দূরত্বে সরিয়ে রাখে। গৃহের বা স্ব-স্ব পরিবারের বাতাবরণে যত্ন-সমাপনান্তে ফিরে আসা এইসব উচ্চকোটিজন, প্রান্তজন এবং ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি-জন অন্য সকলকেই 'তটস্থ' করে তোলেন।

কিন্তু শতকরা আশি ভাগ যে সাধারণজন, যে চাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত-রা ছড়িয়ে আছে তাদের কাছে এই বিরাট-বিপুল শিক্ষা-যজ্ঞের ডামাডোল কোন্ কাজে লাগে, কতটুকুই বা পৌঁছোয়? সাধারণ জনেরা শিক্ষা কি তা বোঝে না, শিক্ষিত-জনকে দেখেই তারা যা-কিছু আন্দাজ করে নেয়, তারা অশিক্ষাকেও বোঝে না, অশিক্ষিতের ব্যবহার দেখে বুঝে নেয়। ঈশ্বর বলতে তারা বিমূর্ত ব্রহ্ম বোঝে না, ছবি-পুতুল-প্রতিমাকে চেনে, তেমনি বিমূর্ত 'শিক্ষা' তাদের মাথার উপর দিয়ে যায়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জন তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে নড়া চড়া করে।

এবং সেই প্রত্যক্ষ নড়াচড়ায় তারা বড় বড় শিক্ষিত জনকে দেখতে পায় কেমন অবলীলায় ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসাকে প্রকাশ করছে, এক পয়সা-দু'পয়সার জন্যে কেমন নখদন্ত সারমেয়-শৃগাল ব্যবহার করছে, দু'ইঞ্চি জমি নিয়ে কামড়া-কামড়িকে থানা-পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব ভুল-বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত শিক্ষিতদের পকেট-like-এ সুরক্ষিত certificate-diploma হলোতে সাধারণ লোকের আগ্রহ নেই, তাদের আগ্রহ এদের সামাজিক-মানসিক ব্যবহারে, আচরণে, মিথস্ক্রিয়ায় (interaction-এ)। এ-পর্যন্ত কোন্ কমিশন, seminer, symposium শিক্ষার এই মূল সমস্যার কেন্দ্রটিতে আলো ফেলতে পারল?

শিক্ষিত জনের দৃষ্টিতে নিরক্ষর জনেরাই অশিক্ষিত, গ্রামারাই অশিক্ষিত, বস্তিবাসী মাত্রেই অশিক্ষিত এবং অবশ্যই diploma-certificate-হীনরাই অশিক্ষিত। শিক্ষিত জনের কাছে শিক্ষার তিনটি মাত্রা স্বীকৃত এক, বেশ-ভূষার পারিপাট্য এবং দেহের সপুষ্ট মসৃণতা, দুই, সম্মান অর্থকরী এবং অথবা পদাধিকারী অবস্থান এবং তিন, কোনও উচ্চকোটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপত্র বা প্রত্যয়ন। এই ত্রি-মাত্রা তুলাদণ্ডে জনসাধারণকে মাপার এবং সুতরাং দেশের অধিকাংশ জনকে অশিক্ষিত বলে ঘোষণা করার অধিকারটুকু স্বনির্ধারিত। সরল-সহজ জীবন যাপন, চেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা খাদ্য-উপার্জন, দেবদ্বিজে ভক্তি আর রামায়ণ-মহাভারত-কথকথায় সেচন পাওয়া সহজ-বিশ্বাসের মানসিক অবস্থান, চারু সমাজের পতিশীল বর্ণাঢ্যতার কাছে স্বীকৃতির ইকো-কলকে না পাওয়ার কারণ।

ওদিকে নিরক্ষর-'অশিক্ষিত' জনসাধারণের ধ্যানধারণাও আধুনিকতা দ্বারা প্রভাবিত। তারা জানে যে যাঁদের মাথার উপরে দিবসের কর্মযজ্ঞে এবং রাতের বিশ্রামকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা বাতাস

দেয়, যাঁদের কাজ-করা বলতে চেয়ার-টেবিলে উপবিষ্টাবস্থা এবং ইতি-উতি কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া বোঝায়, তাঁরাই শিক্ষিত। যাঁরা সকালে ঢোলা-পাঞ্জাবী গায়ে চটি মট্ মট্ বাজার-বের হন এবং পুষ্ট-গর্ভ থলি হাতে গৃহে ফেরেন, যাঁরা ছুটোছুটি করে অফিসে কাছারিতে ছোটেন, সেখানে পৌঁছে বিশ্রাম করেন, দিনান্তে বিশ্রামে আর গল্পগুজবে ক্লান্ত হয়ে আবার হন্তদন্ত হয়ে গৃহে চা-পানের নিমিত্ত ফিরে আসেন তাঁরাই শিক্ষিত। দশটা-পাঁচটার আহ্নিক বেষ্টনের বাইরে যাঁদের করণীয় নেই কিছুই, গৃহ যাঁদের স্বরূপেষ্ট আরামের ঠেঁকুর তোলার আবাস, পাড়ার রক্, ক্লাবের চারদেওয়াল আর নাট্য-মন্দিরের চাতাল যাঁদের আড্ডার মনোভূমি তাঁরাই শিক্ষিত। যাঁরা দপ্তরে বসে আবেদনকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশের অধিকারী, যাঁরা হাসপাতালে অবস্থান করে আত্মজনের প্রতি উদাসীন ব্যবহারে অকৃপণ, যাঁরা শিক্ষাঙ্গনে উপবেশন করেও ছাত্র-ছাত্রিদের শিক্ষা বিষয়ে অনুভূতিহীন এবং প্রশাসনের ছোটবড় নৈবেদ্য ব্যবস্থায় শশার টুকরো শিখরচারী হয়েও জনগণের জন্যে একমাত্র বৃদ্ধ-অঙ্গুলিটিই উত্তোলিত রাখেন তাঁরাই সুশিক্ষিত।

জনসাধারণ দ্রুত 'শিক্ষিত' হয়ে উঠতে চায় কিন্তু একমাত্র মানসিক দিকটি ছাড়া শিক্ষার ত্রি মাত্রার কোনও মাত্রাই সহজে করায়ত্ত হতে চায় না। বাড়ির ভিত বানানোর সময়ে অপরের জমি 'হরণ' করে আত্মসাৎ করা, নিজের ছেলে গোল্লায় গেলে অপরের ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপানো, ছোট-ছোট মানামানিনাকে তর্কের আঘাতে ঝগড়ায় নিয়ে যাওয়া, ঝগড়াকে নখদন্ত টেনে নেওয়া, স্বার্থের দানাদানিতে সারমেয় দন্তরাজী দেখানো আর নখের ধার পরখে সদা তৎপরতা—এ-সকল শিক্ষিত-সম্ভব আচরণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে জনগণের মধ্যে। কিন্তু ত্রি-মাত্রা শ্রেণী স্বার্থ বড়ই উচ্চকোটি স্বার্থ! সেই স্বার্থ সূচীভেদ্য সুরক্ষায় আগলে রাখাটাই শিক্ষার প্রধান কাজ নয় কি?

বিশ্বাস-সন্দেহ-বিচার :

দৈনন্দিন জীবনের আঙিনায় সংসারেই বলুন আর পরিপাটি সাজানো-গোছানো বিশিষ্ট জীবনেই বলুন আমরা সকলেই কয়েকটি মনোভাবকে সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরি। এদের সকলেই তাই বিশ্বস্ত চেনেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সন্দেহ-স্বীকার, বিচার-অবধারণ (analysis judgement)। এরা সকলেই আমাদের সংসারে-জীবনে পথ দেখায় বলেই এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এরা যে কতো বিপদের কারণ, কতো যন্ত্রণার উৎস তা আমরা মনে রাখি না, ভেবে দেখি না।

একজন যা বিশ্বাস করে অন্যজন যখন তা বিশ্বাস করে না তখন কোনো বিরুদ্ধতা ঘটে? বিশ্বাস-অবিশ্বাস তো অনুভব মাত্র, তাই একজনের অনুভবের সঙ্গে অন্যজনের অনুভব না মিললে, বিপরীত হলে, আদৌ কোনও 'বিরুদ্ধতা' থাকে না। কারণ দুটি 'অনুভব' একই সঙ্গে ঘটনা [বা, সত্য?] হতে পারে যখন তারা, সেই অনুভব দুটি, দুটি আলাদা ব্যক্তির মনে ঘটছে। এমন কি একই ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ে ভিন্ন বিশ্বাস ঘটনা বা 'সত্য' হতে পারে। এমন তো হামেশাই হয়ে থাকে। আবছা আলোর হদমহে সন্ধ্যায় আমি যেখানে ভূত দেখতে পাচ্ছি কাল

বিশ্বাসে অটল এবং ভয়ে টলমল সেই অবস্থায় তুমি কেবল একটি শাঙড়াগাছ বা কলাগাছ দেখছ বলে বিশ্বাস করতেই পার। তাতে আমার ভূত-বিশ্বাস যেমন টোল খায় না তোমার শাঙড়া-বিশ্বাসও তেমনি স্থির থাকে। আবার বয়সের তেজে ঈশ্বরকে কুলোর বাতাস দিয়ে একই ব্যক্তি, ভাটার টানে, ভগবানে-বিশ্বাসকে ধ্রুব করে জীবনকে সত্য-দৃষ্টি করে রাখতে পারেন। কেন? কারণ বিশ্বাস-অবিশ্বাস উভয় মনোভাবই বিষয়ীগত-এবং-ব্যক্তিগত (Subjective and private.)। কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে ঝগড়া কি কিছুমাত্র কম হয়?

বিশ্বাস আর একটা কাজও করে। বিশ্বাস মনকে শান্তি দেয়। বিশ্বাসে বন্ধুও মেলে কৃষ্ণও মেলে। কারণ বিশ্বাস একটা সদর্থক মনোভাব। বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল বলে অনেকে এই শান্তি-দায়ী মনোভাবের পূজা-আরাধনা করে থাকেন, কিন্তু জীবনে এবং সংসারে বিশ্বাস করে শতেক লোক যে পথে বসেছেন তা পরিসংখ্যানগত তথ্য। যা সহজ-সরল তাই যে ভাল এবং উচিত তা বলা যায় কি? অবিশ্বাসকে চেহারা দেখে নঞর্থক বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু সেটিও সদর্থক, Positive মানসিক অবস্থা। ভূতে অবিশ্বাস = ভূতের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাস। স্থির, নিশ্চয়, Positive.

সন্দেহ কিন্তু বেশ মারাত্মক অবস্থা। শান্তি দেয় না, স্বস্তির চিহ্নমাত্র কাছে ধরে আসতে দেয় না, মনুষ্যের মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও টিকে থাকবে। সন্দেহ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, এবং এতোই, যে ফরাসী দার্শনিক 'দেকার্তে' মহাশয় এই সন্দেহের কাঁটা-বেলচে হাতে দর্শনের জগতে সত্য খুঁজতে বেরিয়ে অবিস্মরণীয় পিতৃত্বের, আধুনিক দর্শনের পিতৃত্বের, অভিধাটি পেয়ে গেলেন। দর্শনের বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক এলাকায় সন্দেহ মনোভাবটি প্রশংসার শিরোপা পেলেও জীবনে-সংসারে এটি একটি যন্ত্রণার উৎস, ক্ষত-বিক্ষত হবার বিচরণভূমি এবং অপরের দৃষ্টিতে অসুস্থ মানসিকতার কারণ। সন্দেহের প্রেলিহান অগ্নিকুণ্ডকে ফরাসী দার্শনিক Purifying furnace বলেছেন। সত্যের দাবি নিয়ে যা-কিছুই সামনে আসবে তাকেই সন্দেহের সেই furnace-এ পুড়িয়ে তিনি দেখে নিতে বলেছিলেন খাঁটি কিছু তা-সবের মধ্যে আদৌ আছে কি না। ভাল কথা। সংসারে স্বামী খাঁটি কিনা, স্ত্রী খাঁটি কিনা এবং এমনো উপায়ে দপ্তরে-কারখানায় এবং সর্বত্রই যদি খাঁটি খুঁজতে সন্দেহের furnace-টি কাজে লাগাই তাহলে মধ্যসত্ত্বর সম্ভব প্রত্যেকেই নিজেকে রাঁচির লৌহ-মবনিকার অন্তরালে আবিষ্কারের অধিকার পেয়ে যাবো, এবং জীবনে-সংসারে বেঁচে থাকার সেই একটি মাত্রই তাৎপর্য অবশিষ্ট থেকে যাবে—রাঁচি বাসই তখন একমাত্র লাভ হবে!

পরিশীলন-উত্তর বিশ্বাস আমাদের শান্তি দেবে, অনুশীলনান্তে সন্দেহ-ক্রিয়া আমাদের সত্য দেবে। সন্দেহ সত্য-সন্ধ বলেই সে বিষয়ীগত হয়েও Private নয়, objective; এবং একটি উপস্থিত মানসিক প্রীতি (attitude) বলে সে সদর্থকও বটে। অতি ব্যবহারে উভয় ক্ষেত্রেই বিপদের সম্ভাবনা। বিশ্বাসের অতি-ব্যবহার মস্তিষ্কহীন 'সবজী-জীবনে' টেনে নামাতে পারে আর সন্দেহের অতি-ব্যবহার 'বেদনা-পৃষ্ঠ' জীবন যাপনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে।

বিচার-অবধারণ ব্যাপারটা কেমন? reasoning-analysis-judgement? জীবনে-সংসারে খুবই পুষ্টিকর পদ্ধতি, শাস্ত্র-নিরুদ্বেগ প্রক্রিয়া, কিন্তু হলে কি হবে? আধুনিক জীবন-সংসারের দ্রুতগতি চলন আর ঘাড়ভাঙা প্রতিযোগিতার বাতাবরণে এই Prescription অচল। সবক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের জন্যে আর সমূহ workability-র তাগিদে aspro-anacin-septran-ampiciline-এর ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট। প্রয়োজনীয় বিচার প্রচেষ্টা তাই

দীর্ঘসূত্র বলে জোকিত, কাঙ্ক্ষিত অবধারণ প্রক্রিয়াও তেমনি সময়ের অকারণ অপচয় বলে ধিক্কৃত। বিচার-বিবেচনা তাই অতীতের বিষয় বলে অপব্যবহারে অবসিত হতে বসেছে। যাঁরা বিচার-বিবেচনা করে অবধারণকে ঘুরতে বসেন তাঁরা হয় বৃদ্ধ অথবা অকালের শোক বলে মানেন কৃষ্ণন আর বয়সের বঙ্কিম দৃষ্টির দ্বারা আহত হতে বাধ্য হয়ে পড়েন। সময় সেই সময়-সাপেক্ষ বিচারের পথ ইঙ্গিত। বিচারহীন তাৎক্ষণিকের ধারায় তাই বিচার-বিবেচনার প্রশ্নও ওঠাপট।

সব কিছুকেই সোজা-সহজ করতে আধুনিক জীবন সব কিছুকেই যান্ত্রিক করে তুলেছে। দ্রুতচলমান যান্ত্রিক জীবনের তীব্র গতিতে জীবন-যৌবন-ধনমান ছুটে চলেছে মাঝ বরাবর, আর তারই পাশে পাশে, দুকূলের অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ গতির আহ্বানে সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত-অপাঙ্‌ক্তেয় জনেরা বিশ্বাসের চাদর মুড়ি দিয়ে ধারে ধারে, বই তলার নিচে আর স্বামীজীদের আখড়ায় নিস্তেজ শান্তির অন্বেষণে চোখ বুজে বসে আছে। এখন যারা জীবন নদীর মাঝ মধ্যিখানে ছুটে চলেছে তারা একবারও ভাবে কি যে পিছনে আত্মা প্রজন্ম-ধারায় তারা যখন ছিটকে সরে যাবে মূল স্রোতের বাইরে তখন অসম্মানিত-পর্যুদস্ত বিচার-ক্ষমতা আর চেতনাহীন-অনুশীলিত বিবেচনারা মাথা কুটে মরলেও কাছে এসে ধরা দেবে না।

বিচারহীন কোনও বিবেচনা হয় না, বিবেচনার স্পর্শহীন বিচার বিচারই নয়, অনুশীলিত সংশয় আমাদের প্রত্যক্ষকে, বিশ্বাসকে গ্রাস করে ফেলে, বিশ্বাসের বাতাবরণেই সংশয়কে সত্যের স্বর্ণ-নিক্তিতে অসত্যের খাদ পুড়িয়ে 'সোহাগা' করে তুলতে হয়। তাই বলা যায় এরা সকলে—বিশ্বাস-সংশয়-বিচার—সকলেই মনের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি বা ছাকনি। শ্রেয় এবং শ্রেয় স্থির হলেই এদের ব্যবহার সার্থক হতে পারে। অন্যথা যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে।

বিত্ত-বিভেদ :

কোনও ধারণাকে সম্যক অনুধাবন করতে বিশ্লেষণের ব্যবহার করা হয়, কোনও বস্তুকে বা প্রাণীকে বোঝার জন্যে দরকার ব্যবচ্ছেদ, বীক্ষণ থেকে অনুবীক্ষণ। কিন্তু সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করার জন্যে শ্রেণীবিভাগ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত।

সমাজ একটা ধারণাও বটে, একটা বহু-ব্যক্তি সমবায়-সংহতিও বটে। তাই সমাজের প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অনুধাবন এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ বুঝতে গেলে বিশ্লেষণ এবং ব্যবচ্ছেদ একই সঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিষয়টি তাই একাধারে বিশাল এবং জটিল। বোধাতর জনেরা তা নিয়ে ব্যাপৃতও আছেন। শ্রেণী বিভাগকে কেন্দ্র করে জটিলতর অনুভবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রথিবীতে genus-species শ্রেণী বিভাগ প্রকৃতি নির্ধারিত। কিন্তু একই উপজাতির মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ তা প্রকৃতি-সম্বন্ধিত নয়। এখানে জৈব-গঠন, পরিবেশের প্রভাব, মস্তিষ্কের গুণ-পরিমাণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফুলন্ততা ইত্যাদি বিরাট ভূমিকা পালন করে। শ্রেষ্ঠীর শ্রেণী বিভাগের আগেও, আর্য ঋষিদের চারি-বর্ণ সমাজ সৃজনের পূর্বেও শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রকৃতির নিজের ব্যবস্থাপনায়

বুদ্ধির ধূর্ততায়, শরীরের ক্ষমতা-কুশলতায় আর সাফল্যের সূত্রকে একই গোষ্ঠীর মধ্যে বাঁধতে বাঁধতে এবং আত্মরক্ষা-গোষ্ঠী যোগাতার গোষ্ঠী-শ্রেণীতে গোষ্ঠী-শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল।

হয়েছিল, কিন্তু সেই শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতি সমর্থিত বলে তাতে সামঞ্জস্যহীনতার ধারা ছিল না, ecology মার খায় নি। মনুষ্যসৃষ্ট শ্রেণী বিভাজন কৃত্রিম, প্রকৃতির নিয়মে না ঘটে মানুষের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত-প্রচলিত বলে সেই শ্রেণী বিভেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। অর্থাৎ বিভাজন না হয়ে তা বিভেদ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এই বিভেদ-প্রধান শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে, এর উৎস বা কারণ নিয়ে, ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা করেছে, করছে এবং করবেও। কোথায়ও ভক্ষ-যোগাতাকে, কোথায়ও মঙ্গলের ধারণাকে (idea of good), অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ঐতিহাসিকতাকে আবার কোথায়ও বা সংস্কারকে শ্রেণী বিভিন্নতার কারণ বলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র বিত্ত-কে নির্দেশ করে এই বিভেদের উৎসটির সন্ধান যথাযথ হয়ে ওঠে নি।

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত—এই ত্রিবিধ বিত্ত-সম্পর্ক বা বিত্ত-স্তর-বিভাজন অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। বিত্ত একটি সংখ্যা-দ্যোতনা, তাই এর মাত্রাগত বিভিন্নতা অসীম বিভাজনের গাণিতিক সত্য, সংখ্যা মাত্রই infinitely divisible.তা সত্ত্বেও জলের তাপমাত্রাকে বোঝার জন্যে যেমন বাষ্প-জল-বরফ-এ ভাগ করা হয়, তেমনি বিত্তের অসীম বিভাজন scale কেও তিনটি প্রধান স্তরে প্রকাশ করা হয়।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং গুণ-লক্ষণ একই পর্ব-বন্ধনীতে ধরা পড়ে বলেই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পর্ব-বিভাগ সর্বজন স্বীকৃত। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কুশলতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শ্রমদান যোগ্যতাই প্রধান প্রধান গুণ লক্ষণ। সমাজ-সভ্যতার সবক্ষেত্রেই যে যে উপাদান ক্ষমতা-শক্তি-অধিকারের মূলে, উৎপাদন-গতি-এবং-স্থিতিশীলতার উৎসে সেই সকল ক্ষেত্রেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দখল, দক্ষতা এবং নৈপুণ্য বিশিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। এই শ্রেণীর বাস্তবতা বোধ মানবীয় ভোগ ও ভোগের উপকরণসমূহকে কেন্দ্রীভূত করে তোলে। এই অংশে মার্কসীয় উদ্বৃত্ত তত্ত্বের মাধ্যমে স্মরণযোগ্য। সত্ত্ব সৃষ্টি এবং সৃষ্ট সত্ত্বের উপভোগ তাই উচ্চবিত্ত সমাজের স্বাধিকার বলেই এই শ্রেণী মনে করে। মুনাফার উদ্বৃত্ত অংশ যে কেবলমাত্র এই শ্রেণীর গুণ-বৈশিষ্ট্যের অবদান সে বিষয়ে এদের নিশ্চয়তাবোধই অপর দুই শ্রেণীকে বঞ্চিত করার যুক্তি-বিন্যাস যোগায় এবং, পরে দেখা যাবে, নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে শোষণ করার অধিকার-সুযোগ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপসত্ত্ব-ভোগ-বাসনার ইচ্ছার সহায়তায়, কেমন অনায়াসেই এদের হাতে চলে আসে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুণ-লক্ষণ তার বুদ্ধি-বৃত্তি। বাস্তব নয়, আকার গত বুদ্ধির অনুশীলন-পরিশীলন, মেধার উন্মেষ-উন্নতি এবং ধী-শক্তির উৎকর্ষ-শ্রীবৃদ্ধি এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। যুক্তি-বুদ্ধি আপেক্ষিক, মেধা ক্রয়যোগ্য বাক্তি-পণ্য (Commodity), ধী-শক্তি প্রয়োগ-প্রকাশে উজ্জ্বল হবার অপেক্ষা রাখে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুণ-বৈশিষ্ট্য উচ্চবিত্তের কাজে লাগে, ভোগ্যপণ্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় এবং বিত্ত-বিভাগ সুস্থিত করার জন্যে অপরের নির্দেশে উপযোগিতা খুঁজে পায়। কৃষ্টি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের স্রষ্টা-ধারক-এবং-বাহক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিকে সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকে অন্যদিকে ব্যবহৃত হতে পেরে দক্ষিণাস্ত প্রাপ্তিকেই স্বধর্ম বলে আঁকড়ে ধরে। তার বুদ্ধি-মেধা-ধীশক্তির আত্মর ঐশ্বর্য যে উপসত্ত্ব ভোগের কিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণার অবমূল্যায়নে ধর্ষিত হচ্ছে

তা এই শ্রেণীর অর্থাহিতের মধ্যেই পড়ে না, চেতনার জগতে আসে না।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দর্শনে বিজ্ঞানে নোতুন চিন্তা-ভাবনা যোগ করে, প্রকৌশলগত নৈপুণ্যে নব নব দিগন্ত এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ-সাফল্য সম্ভব করে তোলে, আর্থসামাজিক চেতনায় আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করে আনে। এই শ্রেণী প্রশাসন-দপ্তরে, গণ-মাধ্যমের সর্বক্ষেত্রে, এবং সকল দল-শ্রেণী-গোষ্ঠীর শীর্ষে অবস্থান করে। জ্ঞান-গরিমা-শক্তি-সাহস এদের প্রতিষ্ঠের পরতে পরতে সমুজ্জ্বল থাকে বলেই এরা প্রাপ্তির নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় একদিকে উচ্চবিত্তের বিত্ত-সংগ্রহে নিজেদের সবটুকুকেই উৎসর্গ করে দেয়, অন্যদিকে নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত-শোষিত করার যাবতীয় নাট-বল্টু হয়ে ব্যবহৃত হতে দেয়।

শ্রমিক শ্রেণী ঘাম ঝরায়, তাই মুনাফার উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হবার বোধে উত্তেজিত থাকে। উচ্চবিত্ত শ্রেণী সেই উদ্বৃত্তকেই কুক্ষিগত করতে পারে বলে উল্লসিত থাকে। মধ্যবিত্তের ট্রাজেডি এখানেই যে সে তার সৃষ্টি-মোহাত্মাকে সম্যক বুঝে উঠতে পারে না, স্বল্প প্রাপ্তির উপসত্বকেই সে তাৎক্ষণিক কৃষ্ণ-তুল্য মনে করে। দ্বিতীয় জীবদ্দশায় যে ছবি তার দারিদ্র্যকে ঘুচাতে পারে না, মৃত্যুর পরে উচ্চবিত্তের করস্পর্শে সেই ছবিই লক্ষ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়ে যায়।

মধ্যবিত্তের দ্বিতীয় ট্রাজেডির উৎসটি তার ঊর্ধ্বমুখ, উচ্চবিত্ত-দৃষ্টির জন্যে এবং পাশাপাশিই নিম্নবিত্তের প্রতি নিম্ন-দৃষ্টি, হীন-দৃষ্টির কারণে। শোষিত-বঞ্চিত রূপে যে তার আপন সেই শ্রমিকদের সে নিজের বলে মনেই করে না। মনে করে না কারণ সে নিজে কলম-বুদ্ধি-মেধা চালায় আর শ্রমিক দেহ, লাঙল আর হাতুড়ি চালায়। আকাশের 'চাঁদা'-কে দেখে সে উচ্ছ্বসিত 'মামা' বলে সম্বোধন করতে তৃপ্তি বোধ করে, বিত্তের আত্মীয় বোধে উচ্ছল হয়ে ওঠে। অথচ যে নিজের সমস্ত প্রতিভার সকল রঙ-রস-মেদ-মজ্জা দিয়ে জীবন সাধনের রসম-রূপ আলোটুকু জ্বালাতে নিজেই জ্বলে মাচ্ছে সেই শ্রমিক-নিম্নবিত্তের 'মামা' টিপ্পণী দিতে চায়, 'দাদা' ডাক শুনতে! এটা মধ্যবিত্তের বিপত্তি নয়?

এবং তৃতীয় ট্রাজেডি? উচ্চবিত্তের চড়ক গাছে দাঁড়-ঝোলা বড়শি-বেঁধা মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী সমাজের সর্বত্র নেতা-ত্রাতা-সম্পাদক-শিক্ষক-শিল্পী Engineer-technologist, computer-specialist হয়ে দিনান্ত-মামার উপসত্বের লোভে সমাজের ঊর্ধ্ব-আকাশ-স্তরে বিচরণ করছি আর মনে মনে আত্মপ্রসাদের ঢেকুর তুলে ঘোষণা করছি : আমরাই প্রধান, ওরা বস্তিবাসী নিরক্ষর বলেই অপাঙক্তেয়। কিন্তু আমাদের সেবা করাই ওদের ধর্ম, অনাথা গলা দেবো টিপে।

বিজ্ঞান কথা ও কথায় বিজ্ঞান :

আমাদের সকলেরই শব্দ ভাণ্ডারে দু'রকমের শব্দ থাকে, কথা জন্ম হয়ে যায়। ভাল শব্দ আর কাজের শব্দ, ভাল কথা আর কাজের কথা। কাজের কথা যখন বলি তখন মাত্রা বাছ-বিচার করি না, কথায় যেমন যেমন আসে তেমন তেমন ছিটকোতে থাকে। বক্তার বক্তব্য আটকায় না, শ্রোতার

বুঝতেও আটকায় না। কিন্তু ভাল কথা যখন বলি, বলতে হয়, যেমন আলোচনা সভায়, বক্তৃতাকালে অথবা ভদ্রসমাজে, তখন বাছা বাছা শব্দ খুঁজতেই হয়। বক্তব্যকে 'বৈজ্ঞানিক' করে তুলতে তখন সচেতন সচেষ্টতা প্রকাশ পায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের কথায় আর বিশেষ বিশেষ জীবনের সম্প্রচেষ্ট কথায় 'বিজ্ঞান' বা 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি এমন একটি কথা যা আমরা নির্বিচারে ব্যবহার করে থাকি। যত-তত্র ব্যবহার করে করে আর যখন তখন শব্দটিকে কাজে লাগাতে লাগাতে শব্দটার ধার যেমন কমে গেছে মানেটাও তেমনি মার খেতে খেতে ভোঁতা হয়ে গেছে। বিশেষ-জ্ঞান-এর ব্যুৎপত্তিতে ওর যে কোন খানদানী কোন ঐতিহ্য আছে তা নয়। কারণ সব জ্ঞানই সাধারণ আবার সব জ্ঞানই অসাধারণ বা বিশেষ। ব্যাপারটা, মানে বিশেষ হয়ে ওঠাটা, ব্যক্তির বেলায় যেমন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেয়, শব্দের বেলাতেও, এ-ধরনের অর্থের-ব্যক্তিত্বে যে সব শব্দ বেড়ে ওঠে তাদের বেলাতেও, তেমনি, ভবিষ্যতেই সাধারণ বা অসাধারণের ছাপ মেরে দেয়। বিজ্ঞান শব্দটির জন্মগত শৈশব যেমনই কাটুক না কেন এরিস্টটলের লালনে আর নিউটন-গ্যালিলিওর পালনে সেই শব্দটির তরুণ কালে ঝকঝকে একটা ভবিষ্যতের আলো পড়েছিল। তার পরে স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু জনের যত্নে-শ্রমে-চেষ্টায় সে অবশ্যই একটা মহাশয়-মহাশয় যৌবনের তেজ পেল, দীপ্তি পেল। বিশ্ব সভায় স্বীকৃতি পেয়ে বিজ্ঞান তখন আকাশ-মাখা বরেণ্য হয়ে দাঁড়াল।

মানুষের স্বভাবই এমন যে সে খুব বড়কে তেমন সহ্য করতে পারে না। পারে না তার কারণ বোধহয় এই যে সেই বড়র মাপে নিজেকে বড় ছোট করে মনে হয়। সেটি সত্য হলে কি হবে, যন্ত্রণার তো বটেই। অবশ্য অনেকের কাছে, সকলের কাছে নয়। যারা ছোট এবং জানে যে ছোট তারা কোনও যন্ত্রণা বোধ করে না। যন্ত্রণা তাদের যারা ছোট কিন্তু জানে যে তারা বেশ বড়। তাই কেউ যদি বেশি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলে এই আসলে-ছোট-কিন্তু-মনে-মনে-বড়দের জ্বালা ধরে যায়। স্বাভাবিক নয়?

এটা যেমন সত্যের একদিক, তেমনি এর আর একটা দিকও আছে। সেও সেই মানুষের স্বভাব। বড়র আড়ালে লুকোনোর চেষ্টা। সেই জন্যেই তো কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের নাম আসে, আইনস্টাইনের কথা ওঠে, নিউটনকে নিয়ে টানাটানি পড়ে। আমরা সকলে কি তাঁদের বুঝি, চিনি, জানি? তা নয়, কাজে লাগাই। এলাকা বুঝে বুঝে বড়-দের ধরে আমি আর নিজের নিজের ছোট-কে পাচার করার চেষ্টা করি।

'বিজ্ঞান', 'বৈজ্ঞানিক' তাই আমাদের কাজের কথায় যেমন জ্ঞান কথাতেও তেমন অনায়াসে ঢুকে পড়ে। বোঝা-না-বোঝার প্রশ্নই তখন আর কেউ তুলতে পারে না। বিজ্ঞান একটা বিষয়ও বটে, একটা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ার নামও বটে। 'বৈজ্ঞানিক' তো বিষয়েরই বিশেষণ, অনুসন্ধানের গুণ-প্রকৃতির ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান-মনস্কতা, বিজ্ঞান-সম্মত জীবন যাত্রা, বৈজ্ঞানিক তথ্য, বৈজ্ঞানিক ধারণা-জ্ঞান-বিশ্বাস কোথায় না কোথায় ব্যবহার করা যায়, ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কথাটাকে ব্যবহার করা আর অর্থটাকে অনুসরণ করা তো এক-কথা নয়।

দর্শনের পিতৃ-গৃহ ছেড়ে, Law of Reason এর নিয়মের এলাকা ত্যাগ করে এবং শুধুমাত্র Consistency-র speculative জগৎ পিতার জন্যে ধর্ম করে বিজ্ঞান যখন verifiability-র আবাসে সরে এলো, predictability-র নিয়মকে আঁকড়ে ধরল এবং প্রমাণ বলতে

হয়-প্রমাণ-নয়তো-অপ্রমাণ ঘোষণাকে নীতি হিসেবে মেনে নিল তখনই ব্যাপারটা আর গৃহ-বিচ্ছেদের প্রকাশ না হয়ে স্বতন্ত্র-গৃহের নববিন্যাস বলে ঘোষণা হয়ে গেল। দর্শন তাই সম্ভাবনার এলাকায় অনুসন্ধানকে মধ্যবর্তী চালিয়ে গেল, বিজ্ঞান কোনও বিরুদ্ধতা না করেও সেই সব সম্ভাবনাদের বাস্তবতা নিয়ে সমৃদ্ধ হতে লাগল। প্রয়োগ সাফল্য নিয়ে ব্যস্ত হল। একই জ্ঞান-পরিবারের সদস্য হয়েও, একই অনুসন্ধানের যুক্তি-সিদ্ধ পথ ধরেও পিতা-পুত্রের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্বতন্ত্র হয়ে গেল। একজন চায় যা logically consistent তাকে নিশ্চয় করতে, অন্যজন চায় যা predictably applicable তাকে নির্ধারণ করতে। এদের দুই পুরুষে স্বাতন্ত্র্য আছে, বিরোধ কোথায়?

বিরোধ আছে এবং তা বেশ গভীর ভাবেই আছে। বিজ্ঞানের পোশাক-আশাক পরে দর্শনের এলাকায় ঢুকে পড়লে অথবা দর্শনের ধারণা আর সামঞ্জস্যের নামাবলি গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানের উঠোনে দাঁড়ালেই বিরোধ। কথার ক্ষেত্র-বদলে শব্দ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন বলি বৈজ্ঞানিক তথ্য তখন মানে বোঝাই দায় হয়ে দাঁড়ায় না? তথ্য বা fact বৈজ্ঞানিকও নয় অবৈজ্ঞানিকও নয়, সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। বিজ্ঞানী প্রয়োজন মত তথ্য বা fact কে কাজে লাগায়, তেমনি দার্শনিক ধারণা-বিশ্বাস-সংশয়কে অন্যান্য ধারণা-বিশ্বাস-সংশয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাই দেখতে দেখাতে চান। একটা বিশ্বাস বিশ্বাসই মাত্র, সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। সুতরাং বিশ্বাসেরও বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, দর্শনসম্মত বা অনাদৃত হবার সাধ্য কোথায়? যতক্ষণ ঘোষণা না থাকছে, Statement বা Proposition না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ সত্যতা-মিথ্যাত্বের আসা-যাওয়ার পথ খুলছে না।

একই ক্ষেত্রে একাধিক ঘোষণা থাকলে দর্শন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না তা দেখতে ভোলে না। ঘোষণাগত যৌক্তিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য, ভিতরের বিশ্বাসটা নয়। বিজ্ঞান শুধুমাত্র সেই সামঞ্জস্যে থামবে না, সে সেই ঘোষণাটি মেনে নিয়ে আর কি কি অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে অবশ্যই মেনে নিতে হয় তা দেখবে এবং—এই 'এবং' টাই বেশি জোরালো—এবং, সেই অনুসিদ্ধান্তসমূহ, প্রত্যক্ষটি এবং সবগুলিই, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সফল কি না তা যাচাই করে নেবে।

আমরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা চাই, আসলে যা বলতে চাই তা যৌক্তিক আলোচনা। কারণ আলোচনার বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক বলে কোন বিশেষণ হয় কি? আমরা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে আস্থাবান, বিশ্বাস ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণত মানসিক, তার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিকতার ছিটে ফোঁটার স্থান নেই তা আমরা ভাবিই না। বৈজ্ঞানিক দর্শন, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি কথা এবং এমতো শত শত প্রকাশ আসলে বিজ্ঞানের আড়ালে দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা মাত্র। 'বৈজ্ঞানিক' কথাটা চলের কাছে মনের ভাবনায় লাগানো হয়, আসলে ক্ষেত্র এবং বিষয় অনুযায়ী অন্য কোনও শব্দ বা কথা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু 'বিজ্ঞান' কথাটা একটা বাতাবরণ তৈরি করে দেয়, একটা ভুল-নমস্কৃতাকে মুক্তি দেয় তাই এই যত্ন-তত্ত্ব প্রয়োগ বাসনা। It works; and that which works is true! আমরা সকলেই তাই মতাসক্ত।

প্রেম ঃ

'প্রেম' বিষয়ে দু'কথা লিখতে বা বলতে পারি এমন ধারণা কোনও দিনই গড়ে ওঠেনি। অত্যন্ত পরিচিতজনেরা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে সে রকম একটা বাসনা মনের আনাচে কানাচেতেও ঘুরঘুর করছে তাহলেই আটখানা হয়ে ফেটে পড়তে পারে। সে অট্টহাসিতে আমার কোনও ইতর বিশেষ হবে না কারণ ওদের সঙ্গে আমিও একমত। অভিজ্ঞতা না থাকলে কলমে প্রাণের ছোঁয়া লাগে না, জীবন দিয়ে অনুভব না করলে জীবনের কোনও ধনকেই সাহিত্যের অঙ্গনে সাজিয়ে করা চলে না—এমন কথা অনেক আগে থেকেই জানা। প্রেম আমার জীবন থেকে সদাসর্বদাই সহস্র-পদ দূরে দূরে থেকেছে এমন একটা বিশ্বাস আমার মধ্যে বেশ দৃঢ়-মূল গেড়ে গেছে। শুষ্ক কাঠ, নীরস প্রস্তর আর উষর মরুর বুকে প্রেমের বীজটি অঙ্কুর ছাড়তে পারে না, কারণ শিকড় প্রবেশে বাধা পায়। হৃদয়ের উষ্ণতা, বয়সের আর্দ্রতা আর দৃষ্টি-পাতের নম্র-পল্লব হিল্লোলের অক্সিজেন না পেলে প্রেমের বীজও মার খেয়ে মারা। তাই সারাজীবন যে মেরু-পথে আমি যাত্রী জীবন-গোলার্ধের সেই প্রান্তে যোগ্য উষ্ণতা-আর্দ্রতা-অক্সিজেনের বরাবরই ঘাটতি ছিল বলে আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম, ভিতরের অন্তঃশায়ের যেমন সম্ভাবনা ছিল না বাইরের আক্রমণেরও তেমনি যথেষ্ট সুযোগ ছিল না।

এ-পর্যন্ত বলেই থমকে যেতে হল, সজীব চাটুজ্যে মশাই হঠাৎই অতীতের আবছা থেকে বর্তমানের স্বচ্ছতায় দেখা দিলেন: বইপাড়ে বড়ই রসিক, নীরস পাথরের বুকেও সে রসের সন্ধান পেয়ে প্রেমের সবুজকে সতেজ করতে পেরেছিল। পাঞ্জামো বেড়াতে গিয়ে তিনি আর মাই পাঠককে দিয়ে থাকুন প্রেমীদের জন্যে এই এক টুকরো ছবিকে সনাতন করে রেখে গেছেন। এখানে বইপাড়ের প্রেম পাথরের বুকে যেমন সবুজ ফুটে উঠেছে, লেখকের মনের সবুজও কম প্রকাশ পায় নি। থমকে গেলাম এ-জন্যে যে সুদূর অতীতের একটা সজীব হিল্লোল যেন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ধূসর বিস্মৃতি থেকে হঠাৎই মাথা নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইল। যেন বলতে চাইল প্রকৃতি সব দিনে সরসতা শুধু পাথরের বুকেই নয় অ-প্রেমীর অন্তরেও উৎসারিত হতে পারে! তাই মনের ইতিহাসখানার ধু-ধু পাড়ে যেন একটা সির সির তরঙ্গ টের পাচ্ছিলাম। অনেক, অনেক আগের সেই কথা কিছুটা পরে বলাই বোধহয় ভাল কারণ বৃদ্ধের কলমে কৈশোরের কথা, ভূমিকাহীন, মার খেয়ে যেতে পারে।

প্রেম ব্যাপারটা আমার কাছে বরাবরই কেমন যেন কুহেলিকা, নিজে থেকে বুঝিনি, বোঝার মতো করে কোন প্লাবনও আসে নি। অপরে যদি বা বোঝাতে চেয়েছে তা সেই অপরের নীড়-বাধা বোঝার মতোই বুঝেছি। তবে শুনে শুনে প্রত্যয় হয়েছে যে প্রেম আছে বহু প্রকারের আর সেই সব প্রেমের প্রত্যেকটিই নাকি দুকূলপ্লাবী, নিজ-নিজ ব্যক্তিত্ব-স্বত্ব-স্বামীত্ব-স্বার্থপরতার নোঙর ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রেমাস্পদের দিকে। এবং এও জেনেছি যে প্রেম-প্লাবনের মহাপ্লাবন ঘটে ঈশ্বর-প্রেমে আর মানব-মানবী প্রেমে। এমন কি সেই সেই প্রেমে মাতোয়ারা হলে পত্র-স্বত্ব বোধ রহিত হয়ে প্রেমাস্পদের অধিকারজনিত দহন ঘটতে পারে।

কচকচি ছেড়ে তরতাজা উপাখ্যানে আসা যাক। আপনারাই ঠিক করুন ঘটনার মধ্যে রসের সন্ধান আছে কি না।

সবে তখন কৈশোরের খোলস ছেড়ে তারুণ্যের আস্বাদন দেহে, আর প্রাণের স্পন্দন মনে তরঙ্গ-ভঙ্গ ঘটাচ্ছে। নিজের মধ্যে যতটা টের পাই তার চাইতে অপরের চোখে ধরা পড়ে অনেক বেশি, একেবারে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল পরিবেশের ইতিহাস-ভূগোলে। গ্রামের আকাশ মাটির ছেড়ে গ্রাম-শহরের বৃহত্তর মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ভিতরেও যেমন নোতুনের সিরসির, বাইরেও তেমনি চমকের পর চমক যেন সকাল সন্ধ্যা হকচকিয়ে দিতে লাগল।

ঘটনা এমনি এক সন্ধিক্ষণে ঘটেছিল। তখন হাবুডুবু খেয়েছি মাত্র, জলের প্রকৃতি, জলাশয়ের প্রসার এবং গভীরতা পরিমাপের অবকাশই পাই নি। পাড়ে পৌঁছবার আগেই দেশ বিভাগের ছিল ছোঁ মেরে আমার সেই সদা-সরস অতীত-শুষ্ক জীবন-খণ্ডটিকে এক লহমায় তুলে নিয়ে অখাদ্য-অনভিপ্রেত বলে জীবনের মেঠো ঘুলিতে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত ঘটনা, সংক্ষিপ্ততর তার জীবন। সে কি ছিল প্রেম, সে কি ছিল না প্রেম—তা এখন স্মৃতি মাত্র।

ছেলেদের জীবনে পনেরো উর্ধ্ব জীবন-দৈর্ঘ্য প্রেমের জন্যে বেশ প্রশস্ত বলে, অন্তত আমাদের দেশে, শুনি নি। কিন্তু সেই সদা-প্রবাসী এক দূর-আত্মীয় তরুণকে দৃষ্টি বিদ্ধ করে অবশ করে দিয়েছিল আর এক সদা-শুষ্ক-তাজা তরুণী! তার আগে পর্যন্ত আমার গ্রাম্য জীবনে বহু রমণীর নৈকট্য পেয়েছি, পেয়েছি শাসন, পেয়েছি নির্দেশ-উপদেশ, পেয়েছি আদর-আপ্যায়ন, স্নেহ-ভালবাসা এবং অবশ্যই বহু প্রকারের টানাটানি—কান, চুল ইত্যাদি যে শাসনের জন্যে অত্যাবশ্যক হারেন তা গুরুজন স্থানীয়াদের কাছে সগর্ব জেনে গেছি। কিন্তু তাদের কারো চোখেই কখনই সেই দৃষ্টি দেখি নি যা এই আমার প্রতিবেশিনীর চোখের তারায় দেখতে পেয়েছিলাম। সেই চাহনির অর্থ বুঝি এমন ক্ষমতা আমার তখন অঙ্কুরিত হয় নি, কিন্তু প্রকৃতির লালনে পালনে নিশ্চয়ই কোনো জন্তু আছে না হলে সেই দৃষ্টি যে আমাকে বিদ্ধ করল, সেই চাহনি যে আমার অন্তরের গভীরে ঢেউ হয়ে হুলকে উঠলো, তা আমার বোবা মন টের পেল কি করে? দূর থেকে দেখেই ফুলের গন্ধ অনুভব, চোখের পল্লব পতনে কবিতার ছন্দ আর, গ্রীবার ভঙ্গিতে মনের মধু-প্রস্রবন যদি অনায়াসে ধরা পড়ে তাহলে সে কি প্রকৃতির কারিকুরি নয়? ধরিত্রীর অতল গভীরে যখন আগ্নেয় উষ্ণতা নাড়ে চাড়ে ওঠে, বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার ব্যাকুলতায় আঁকুপাঁকু করে তখন কি ধরিত্রী-দেহের পর্বে পর্বে পরতে পরতে তার অনুরণন ছড়িয়ে পড়ে না? বাইরের দৃশ্যমান শুষ্ক পাথর আর সজীব বৃক্ষরাজির দেহে-মনেও তো একটা শিহরন জেগে যায়, অবুঝ, অজ্ঞাত অনাস্বাদিতপূর্ব? এটাই কি প্রেম, এই শিহরন? না কি প্রেমের অনাগত-অস্ফুট পদধ্বনি?

সেটি প্রেম ছিল না প্রেমের পদধ্বনি ছিল তা তখনও যেমন টের পাই নি, এখনও, এই এতদিন পরেও স্মরণের অতল থেকে তুলে চোখের সামনে মেলে ধরেও যে বুঝতে পারছি তা বলতে পারি নে। ঘাসের দীর্ঘ সবুজ শিষের ডগায় যে বর্ণসুষমাটুকু প্রভাপতি হয়ে দেহ তার রাখে, এবং সেই নৈকট্যটুকু যে সূক্ষ্ম শিহরণটুকু তিরতির করে ছড়িয়ে দেয়, আন্দোলিত করে, শ্যামলের দেহে-মনে, সে কি প্রেম? সে কি মিলন সন্ধিক্ষণের মন-দেওয়া-নেওয়া? তখনও জানা সম্ভব হয় নি, এখনও নয়। প্রকৃতির বুকে অহরহ এমন অনেক মন-দেওয়া-নেওয়ার অফুরন্ত মিলন মুহূর্ত প্রতিনিয়তই ঘটছে। ঘটছে, কিন্তু প্রকৃতির মনে রাখার দায় নেই বলেই বোধহয় তারা অনন্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। এবং হারিয়ে যাচ্ছে বলেই আবার ঘটছে, ঘটতে পারছে। মানুষের দায় আছে মনে রাখার, এ-দায় তার স্বভাবের মধ্যেই সত্য হয়ে আছে। তাই প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসেও সেই সদা

তরুণ চোখের তারায় কিশোরী প্রজাপতির দৃষ্টিপাতের শিহরণ সমান সতেজ থেকে গেল। দীর্ঘ জীবনের যাত্রাপথে দিন মাস বছরের পদতাড়নায় অনেক ধুলো, অনেক জল, অনেক কাবন-ডাই-অক্সাইড উৎক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে সামনের দৃষ্টিপথকে আচ্ছন্ন করে দিল, অতীতের অনুভবগুলোকে ধূসর করে ফেলল, কিন্তু এ-সবের মধ্যেও সেই ক্ষণটি তো কৈ হারিয়ে গেল না! অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে কোনও ঘটনাই তো আর দ্বিতীয়বার ঘটে না, কিন্তু অনুরূপ তো ঘটেই, ঘটেই চলে। একের জীবনে না ঘটলেও বহুর জীবনে অবশ্যই ঘটে। ঘাসের সবুজ শীষের আবাহন যেমন অনন্তকাল ধরেই চলছে তেমনিই চলছে প্রজাপতিদের সেই শীষ অন্বেষণ। এ-তো মিথ্যে নয়।

সবুজ পত্র-পল্লবের অন্তরটি যখন কুঁড়িটি হয়ে প্রকাশ পায় তখন কি সে প্রেমের বাণীবহ হয়ে অস্ফুট ধ্বনিতে প্রেমাস্পদের জন্যে ক্রমশই নিজেকে ফুটিয়ে তুলে নৃত্যে-গানে-গন্ধে মহিমময়ী হয়ে ওঠে না? সেই কুঁড়িটি তখন নবোদিত তপনের তরুণ কিরণে নিজেকে রাঙিয়ে তোলে, ভোরের মৃদু-মন্দ বাতাসের দোলনায় দুলে দুলে ছন্দের স্বাদ গ্রহণ করে আর উন্মোচিত পাপড়ির বুকে শিশিরের সিঞ্চন ঘটিয়ে শুভ্রাত হৃদয়টিকে মৌ মৌ মৌমাছিদের জন্যে আস্পদ করে প্রেম স্পর্শের জন্যে উন্মুখ করে রাখে। অথবা, গাঢ় সবুজের বুক চিড়ে আত্মপ্রকাশের সময়ে বর্ণসম্ভারে সমুজ্জ্বল কিশলয় যখন তার সর্বাঙ্গে বসন্তের দক্ষিণে বাতাস মেখে কলহাস্যমুখর আনচান করে তখন কি সেও প্রেমের প্রকাশ নয়? সমুদ্রসৈকতে বেলা ভূমির অনন্ত প্রতীক্ষায় বার বার সাগরের জলরাশির দৌড়ে দৌড়ে আসা আর বক্ষলগ্ন হওয়ার মধ্যে যে প্রেম আলিঙ্গন, সে প্রেমের অবগাহন সে কি চিরকালিন নয়? অথবা প্রান্তিরে প্রসারিত নদীপ্রান্তের বনরাজির সবুজ আর নিঃসীম আকাশের নীলের যে সনাতন মিলন সেও তো অসীমের প্রেম সসীমের সবুজে।

প্রেম নিয়ে এত কথা করে বলার কি আছে? আছে, অবশ্যই আছে। প্রেম নিজেই কাব্যময়, প্রেম জীবনে ক্ষণস্থায়ী এবং প্রেম মৃত্যুতেই চিরজীবী। পল্লপাতার বুকে শিশির-বিন্দুর প্রেম সেই কারণেই চিরসত্য। প্রকৃতির বুকে যে অহরহ প্রেমের খেলা চলছে সেখানে স্বার্থের সূত্র নেই, ধরে-বেঁধে দীর্ঘজীবন দানের আকুতি নেই, দৈনন্দিনতার প্রয়োজনবোধ দিয়ে কলুষিত করার প্রচেষ্টা নেই। মানুষের প্রেমে স্বার্থের ছোঁয়া লাগে বলেই তা প্রেম নয়। মানুষের প্রেম দেহ-গন্ধী, স্বার্থের সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে প্রাণ হারাতে বাধ্য। যুবক যুবতী যখন প্রেমের টানে কাছাকাছি আসে তখন সেই প্রেমকে তারা ঘড়ায় বন্দি করে তৃষ্ণা নিবারণের চিরায়ত উপায় করে তুলতে চায়, ঘর বেঁধে চার দেওয়ালের সীমায় সেই প্রেমকে গৃহবন্দি করে নিজের নিজের সুখ-সমৃদ্ধির পাথেয় করে তুলতে মনোমোগী হয়ে ওঠে। কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে তারা পরিকল্পনার কাগজ-কলম নিয়ে বসে যায়। মানুষের স্বভাব হিসেবের খাতাকেই বেশি মূল্য দেয়, লাভ-লোকসানের খতিয়ান তাই প্রেমের অপমৃত্যুর নিদান হাঁকে। প্রকৃতির বেলায় হিসেবের প্রশ্নই নেই, লাভ-লোকসানের কোনও খতিয়ানই সেখানে কাজ করে না। তাই প্রেম সেখানে মুক্তি পায় সহজেই, সত্য হয়ে উঠতে পারে অনায়াসেই।

তাই আমার মনে হয় আমার দীর্ঘ জীবনে প্রেম ঐ একবারই এসেছিল। আমার জীবন তখন সবে মাত্র পল্লপাতাটি হয়ে পরিবারের গণ্ডি ছেড়ে অপরিমেয় পরিসরে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ

পেয়েছিল। আর তখনই কিশোরীর দৃষ্টি হয়ে শিশির বিন্দুর মতো নিঃশব্দ সর্বাঙ্গে সদা উদ্ভাসিত আমার সত্তাকে দান করে নিয়েছিল। সূর্যশিশুর মতো এখনও ফিরে তাকালে সেই প্রেমের উত্তাপে নড়াচড়া বুঝতে পারি, যেন দেখতে পাই, যেন হারিয়ে পেয়ে বসেই সেই প্রেম-অনুভব এখনও সত্য হয়ে জন্ম হয়ে সাড়া দেয়।

তার পর বহু বছর পার হয়ে গেল, মুছে গেল অতীত এবং এক সময়ে হঠাৎই অফিসের দপ্তরী ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিয়ে গেল হিসেবের খাতায় সময়ের শেষ দাঁড়ি কাটা হয়ে গেছে। মাথা উঁচু করে সামনে তাকিয়ে দেখলাম সব কেমন আবছা আবছা, ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই সব কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা মনে হল। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরিব্যাপ্তিতে চোখ রেখে অতলান্ত অন্ধকারে আলোর বিন্দু খোঁজা ছাড়া তখন আর করার কি থাকে? সদা ফেলে আসা অতীত তো এখনও বিশুদ্ধ, তাই দূর অতীতে জীবনের অর্থোদ্ধার সম্ভব কি না তাই দেখতে গেলাম। আর তখনই জল জল করে দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো আমার সুপ্ত বিন্দুটি। স্বার্থ চেতনা তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি, কল্পনার কিশলয় পল্লবের আড়াল ছেড়ে সবে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে, পরিকল্পনার স্থান ঘটে নি সেই অত্যন্ত কাঁচা বয়সে, প্রকৃতির আপন ঘরের নীতি-নিয়মে সদা বেড়ে ওঠা সবুজের ছোপ তখন পত্রপাতার চাপ পার হয় নি। তখনই প্রথম মনে হল জোনাকির শান্ত আলোর দীপ্তিতে একটা প্রাপ্তি আমার জীবনে সত্য হয়ে আছে।

তার পরে যৌবনের মাঝখানের মধ্যে চোখের সঙ্গে চোখের মিলন হয়েছে, হৃদয়ের তাপ বাষ্প হয়ে অন্তরকে আলোড়িতও করেছে, অন্তরের আলোড়ন মনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে করাঘাতের পর করাঘাতও করেছে। কিন্তু সেই সব ছোট-ছোট দিনে হিসেব-নিকেশ লাভ-লোকসানের ভাবনা খাতাখানা মুখ উঁচু করে আমার বর্তমান-ভবিষ্যতের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে। তাই সেখানে প্রেমের আনাগোনার অবকাশ ঘটে নি। তারও পরে ভালবেসে বিয়ে করেছি, সংসারের কথা ভেবে পরিকল্পনা করেছি আর ভবিষ্যতের দিক-নির্ণয় করে অঙ্ক করেছি। সেখানে ঘর বাঁধার প্রবণতা স্রোতের জোগান দিয়েছে, পাখিদের নীড় রচনার আগে যেমন প্রস্তুতির পর্ব চলে, আর সেই প্রস্তুতি পর্বে প্রকৃতি গতি-স্রোতের জোগান দেয়। ঘড়া নিয়ে জল তুলতে যাবার প্রেরণা আসে নিশ্চিত তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজনবোধ থেকে। সেই প্রেরণার মূলে প্রেম নয় প্রকৃতি ঠাকরুন অবস্থান করেন!

প্রেমের সঙ্গে অ-প্রেমের প্রধান প্রভেদ বোধহয় এইখানেই যে প্রেম হাবুডুবু খাওয়ায় আর অ-প্রেম ব্যক্তিকে ডুবিয়ে দেয়, মানুষ ডুবে যায় কাজের মধ্যে, সংসারের সমুদ্রে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনায়। এক-মন এক-প্রাণ হয়ে মানুষ তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে, গড়েও থাকে। সর্বত্রই স্বার্থের সূত্র, প্রয়োজনের তাগিদ, আকাঙ্ক্ষার আগুন মানুষকে প্রেরণা যোগায়, ঠেলে নিয়ে যায়। এমন কি মন্দির-মসজিদ প্রেমও অন্যরকম নয়: সেখানেও 'দেহি' 'দেহি'-র অঞ্জলিটি সামনে প্রসারিত থাকে। কখনও শান্তি, কখনও সম্পদ, কখনও সমাধান। রামকৃষ্ণ-চৈতন্য-বুদ্ধরা ব্যতিক্রম: তাঁরা হাবুডুবু খেয়ে নিজের নিজত্বটুকুকেই প্রেমাঞ্জলি দিয়ে ফেলেন। সে সব ক্ষেত্রেও দেখি ভূমিকম্পের মতো সৎ-চিৎ-আনন্দময় অন্তরের অভিষ্টটি নিমগ্ন চেতনা পেয়ে যায়। এই সব প্রেমে ভূমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ঘটে যায়, এদের স্বভাবের অন্তরমহলেই মানব-প্রেম বা ঈশ্বর-প্রেমের বীজটি পত্রে-পল্লবে-পুষ্পে প্রকাশ হবার জন্যে সময়ের প্রতীক্ষা করে থাকে।

প্রেম আর অ-প্রেমের দ্বিতীয় প্রভেদ বোধহয় দেহাতীত এবং দেহবদ্ধতায়। চাঁদের টানে সাগরের বুকে যে প্রেমের জোয়ার ওঠে সেখানে দেহগততা নেই, পাখির গানের জন্যে অরণ্যের অপেক্ষার মধ্যে দেহ সম্পর্ক কোথায়? শ্রীচৈতন্যের চেতনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি দেহজ নয়, দূর চক্রবালে তন্বী শ্যামা বনরাজির সঙ্গে দূরপ্রসারী অনন্ত নীলের যে শাশ্বত প্রেম সেও তো দেহসম্ভব নয়। দেহের সুতোয় প্রেমের ঘুড়িকে যখন আমরা কাছে টানি তখনই তা স্বার্থের সীমায় প্রাণত্যাগ করে। দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে আটকা পড়ে প্রেম তার কমকল্লোল হারায়, প্রয়োজনের দাবাকাটা শিলিতে সে সেবা হয়ে ওঠে মাত্র। তখনই সে আমাদের ডুবিয়ে দেয়, চেতনার গভীরে অবস্থান করে শান্ত আলোর দ্যুতিতে আমাদের মনকে জাগ্রত রাখার অবকাশ পায় না।

তাই ভালবাসা আর ভাললাগা আসে জীবনে বার বার, আসে প্রতিনিয়ত, সাগরের ঢেউ-এর মতো তার ওঠাপড়া। প্রেম আসে জীবনে একবারই। তাজমহল হয় একটাই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার সে হতে পারে না আরো আরো তাজমহল। প্রেমও তাই এক ফোঁটা শিশির বিন্দুর মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল, ঝিনুকের বুকে মুক্তাবিন্দুর মতো অসীমের রূপ সসীমের গর্ভে, নীল আকাশের অন্ধকারে একটি মাত্র নক্ষত্রের মতো কৃষ্ণবর্ণ কর্মজীবনের আঁচলে খচিত আলোর বিন্দুর মতো। বহু বছরের ওপার থেকেও তাই প্রেমকে চেনা যায়, দেখা যায়, জানা যায়। প্রেম বিন্দুতে সিন্ধুর অনুভবটি ধরে রাখে। সেই অনুভবে ফিরে যাওয়াটাও তো প্রেমই!

সহজে-কঠিনে :

আমরা সকলেই অনেক অনেক কঠিন কাজ করে থাকি। কঠিন কাজ করা যে কতো কঠিন তা আমরা রোজই বুঝে যাই, প্রকাশও করি অন্যের কাছে, সকলের কাছে। প্রকাশ করে এক ধরনের আনন্দ বোধ করি। আর এই আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে যে কাজটুকু করে থাকি তার কাঠিন্যকে নানান বর্ণনায় নানাভাবে বাড়িয়ে দেখাতে চাই। বাড়িয়ে দেখাতে চাই একথা ভেবে যে অন্য আমার সম্পর্কে বেশ একটা বড় ধারণা করবে। নিকটজন, আত্মীয়জন, বন্ধুজনের কাছে নিজের মূল্য বেড়ে যাবে। তার পরে হাসফাঁস করি, পাখার নিচে বসি অথবা হাতপাখা চালাই এবং বলি, 'একটু গরম চা হলে ভাল হত!' সব মিলিয়ে যে কঠিনটুকু পার হয়ে এলাম সেই কঠিনের কাঠিন্যকে অন্যের কাছে বেশ বাস্তব করে তুলে ধরতে চাই।

ছোট বেলা থেকেই এই কঠিনের সামনা সামনি হতে হতে আমরা আমাদের আমিত্বকে নোতুন মাত্রা দিতে থাকি। কঠিন অঙ্কটি করে খাতাখানা বাবার চোখের সামনে তুলে ধরি, কঠিন পরীক্ষাটি পাশ করে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরি, কঠিন চাকরিটি সংগ্রহ হলে আনন্দে আটখানা হই। তার পরে সংসার জীবনের অনেক অনেক কঠিন কাজ সেরে এসে গামছা দিয়ে বুকের ঘাম মুছি, রুমাল দিয়ে মুখের ক্লান্তিকে শুষে নিতে চাই আর তার পরেই গড়গড়ার নল মুখে পুরে অথবা সিগারেটের প্রান্তটি ঠোঁটে লাগিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে দিয়ে জানাতে চাই যে অত্যন্ত কঠিনকেই নিজের চেষ্টায় সমাধান করে ফেলেছি।

সারা জীবন কঠিন কঠিন কাজ করে করে আর দেখে দেখে, শুনে শুনে, খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে বুঝিয়ে জেনে গেছি যে কঠিন কাজের তালিকা শেষ হবার নয়। জেনে গেছি যে একজনের কাছে যা কঠিন অন্যের কাছে তা কঠিন নাও হতে পারে, বুঝে গেছি যে জীবনের সব কঠিন কাজের চাইতেও জীবন নিজেই অনেক বেশি কঠিন। আবার এখন যখন জীবনের সব উঁচু-নিচু কঠিনত্বগুলোকে একে একে পার হয়ে এসে নদীর এপারের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওপারের টিকিট সংগ্রহের জন্যে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছি তখন মনে হচ্ছে যে জীবনের সব থেকে কঠিন কাজটাই কখনও সঠিক ভাবে করতে পারি নি : সহজ কথাটাকে সহজ করে বলাটাই সব থেকে কঠিন, আর, আমরা কজনে সেই কাজটা করতে পেরেছি?

বেশিরভাগ লোকই যা বলে তা আসলে বলতে চায় না, বলতে চায় অন্য কিছু, বোঝাতে চায় অন্য আরও কিছু। "সোজা কথা আমি ভালবাসি, বলতেও ভালবাসি, শুনতেও ভালবাসি," বলেও কিন্তু সোজা কথা বাঁকা পথে বের হয়ে আসে, সহজ কথা জোর পাঁচের মার খেয়ে তার মনে ঢোকে। আমরা বেশিরভাগই তো 'কাহিবে উত্তর যাইবে দক্ষিণ'-এর পথিক! সব সময়েই যে আমরা সহজকে ইচ্ছে করে জটিল করি তা নয়, সোজাকে ইচ্ছে করেই বাঁকিয়ে ফেলি তা নয়, এমনটাই যেন হয়ে যায়, লেগে যায়, বেরিয়ে যায়! জলের পাত্রে কাঠিটি ডুবিয়ে দিলে জলতলে যে বাঁকটি তৈরি হয়—refraction যাই—তা তো কাঠির চেহারা যায় না, জলের চাপেও হয় না! আমাদের সহজ কাঠি-কথাও অপরের জল-মনে প্রবেশের মুখে বেঁকে-চুরে যেতে পারে। আমাদের নিজের মনের মধ্যেও তো অনেক পিছুটান, বাধা বিপত্তি, জটিলতা ওত পেতে থাকে। ইচ্ছা-অভিপ্রায়-উদ্দেশ্য আছে, আছে আবেগ-অনুভব-কল্পনা, এবং চিন্তাভাবনার টানাপোড়েন। তাহলে যে কথাকে সহজ বলে মনের একটি কক্ষ থেকে বাইরে যাবার অনুমতি দেই, বেরুবার মুখে সেখানেও তো refracted হবার সম্ভাবনা কম নেই! মনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের 'দুর্গা-দুর্গা' 'মন্ত্রক দুমন' ইত্যাদির স্পর্শ পেয়ে যখন কথাটি সাজগোজ করে বাইরে আসে তখন তাকে কি আর চেনা যায়? সে কি আর সহজ থাকতে পারে? বক্তার মনেও যা শ্রোতার মনেও তো সেই ঘরের মধ্যে ঘর, প্রতি দরজায় স্পর্শ, আশীর্বাদ, আবাহনের ব্যবস্থা সদা জাগ্রত!

এর সঙ্গে যোগ হয় ভাষা, ভাষার নীতিনিয়ম—শব্দ চয়ন, ক্রমপদ, কাজের ওঠাপড়া, সরল-জটিল চয়ন—এবং বক্তার অঙ্গ-সঞ্চালন, যেমন চোখের কুঞ্চন-প্রসারণ-সঙ্কোচন, হস্তাপদাদির অবস্থান-পরিবর্তন-ঝংকার ইত্যাদি। সব মিলিয়ে যা বলতে চাই তাকে বলে নিতে চাই, যা বলতে চাই না তাকে আড়াল করে তুলতে চাই, সমূহ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখি, দূরবর্তী অভিপ্রায়কে সঙ্গোপনে অন্তর্গত করে রাখতে চেষ্টা করি এবং ইত্যাদি। এই করতে গিয়ে সহজ নিজেকে হারায়ই শুধু নয়, জটিলকে অঙ্গাভরণ করে সব ব্যাপারটাকেই কঠিন করে তোলে। সব সময়েই তো আমাদের মনে ভয়—এমন করে বললে ও কি মনে করবে, অমন করে বললে কেমন শোনাবে, তেমন করে বললে কেমন হয়!

দীর্ঘদিন ধরেই জেনে এসেছি যে ভাষার কাজ মনের ভাব প্রকাশ করা, এখন টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভাবতে হচ্ছে ভাষার প্রধান কাজ বোধহয় ভাবকে গোপন করা, সভ্যতার জামাকাপড় পরিয়ে, ভালমন্দের হিসেব নিকেশে, সভ্যতার বাঁধনে ভাষা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার মাত্র! ভাষার কাজ ভাবকে কঠিন করে তোলা, জটিল করে তোলা। এটা মানুষের নিজের স্বভাবের জন্যে

সত্য। প্রকৃতিতে ভাষার সমারোহ নেই তাই সেখানে ব্যাকরণ নেই, অভিধান নেই, নেই কোনও কোমলত্বের ভার। পাখির কণ্ঠে, বনের মর্মরে আর বাতাসের বাজনে যে স্বচ্ছ-শব্দ ভাষা সে ভাষায় সহজ-কথা সহজ করেই প্রকাশ পায়, কঠিনের সেখানে স্থান নেই, সব জটিলতাই সেখানে আপনা আপনি খুলে খুলে সোজা সরল হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মানুষের ক্ষেত্রে মনটাই তার বাসার আস্তানা, ভয়ের ভিত। দুঃখের ভয়, যন্ত্রণার ভয়, হারানোর ভয়—শত ভয়, সহস্র উৎকণ্ঠা এবং লক্ষকোটি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষের জীবন স্বতঃই জটিল। আর তাই সে সোজা কথা সোজা করে বলতে পারে না, কঠিন করে ফেলে। সে কঠিনের আড়ালে খোঁজে নিজেকে প্রকাশ করার, নিজের অহংকে বাড়িয়ে তোলার আর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে প্রচার করার জন্যে। এই করতে গিয়েই সে জটিলকে করে তোলে জটিলতর, কঠিনকে করে তোলে কঠিনতর। সহজ তার জীবন থেকেও যেমন শতহস্ত দূরে সরে যায়, তার কথা বলার অভ্যাস থেকেও হারিয়ে যায়।

সহজের এই হারিয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশ যাত্রা ধীরে ধীরে ঘটে, কিন্তু ঘটে অনিবার্যভাবেই। তরুণ পুত্র তার মনের সহজ বাসনাটি সহজ করে পিতার কাছে জানাতে পারে না, উচিত-অনুচিত বিচারের ভয় থেকে শুরু করে শাসন-ধমকের ভয়, এমন কি মারের ভয়টিও তখন নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কন্যা তার মনের কথাটি মায়ের কাছে খুলে বলতে পারে না। ভয় সেই একই। আবার সময়ের মার খেতে খেতে একদিন এমন সময় আসে যখন সেই এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতা তার মনের অনেক সুপ্ত বাসনা তার তখন-তরুণ-কিশোর-এখন-সংসারের-কর্তা পুত্রের কাছে সোজাসুজি বলতে পারেন না। সেই ভয়! ভয়, পাছে নাকচ হয়ে যায়। রুদ্রাক্ষ-মালা-গলায় সেই জননী এখন সেদিনের সেই মেয়ের কাছে সহজ দুটি কথা বলতে কাঁটা বোধ করেন। ভয়! ভয়, যদি বিকৃত মুখ নেতিবাচক উত্তর শুনতে হয়! শৈশব থেকে শুরু করে সেই যে ঘুরপথে প্রকাশের পথ খুঁজতে হয়, সেই ঘোরপ্যাঁচ থেকে বার্ধক্যের নামাবলি গায়ে চড়িয়েও ছাড় পাওয়া যায় না। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় বাঁকাচোরা প্যাঁচালো, জটিল পথ, কুটিল পন্থাভেলো। প্রকৃতির খোলামেলা আকাশের প্রেক্ষিতে জীবন নিজেকে সহজ করে ছড়িয়ে দিতে পারে, প্রকাশের জন্যে মোর প্যাঁচের দরকার সেখানে অনাবশ্যক। কিন্তু সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, করণীয়-অকরণীয় শতসূত্রের সহস্র টানাপোড়েনে মানুষের জীবনে তাই প্রকাশের ভাষা গানের সুর হারায়, সহজ কথা সুতোর টানে-টানে জড়িয়ে জটিল হয়ে যায়, ভয়ের ঘূর্ণিতে মনের ভাব ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই সহজ কথা সোজা করে বলার উপায় কোথায় সভ্য মানুষের? সব সোজা কথাই কঠিন হয়ে যায়।

পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা ছাড়াও মানুষের অনেক অনেক সম্পর্ক-বৃত্ত আছে। স্বামী-স্ত্রী, কন্যা-জামাতা, ভাই-ভাইপো, বন্ধু-বন্ধুপুত্র-বন্ধুকন্যা, অফিসের বড়বাবু-ছোটবাবু, সহপাঠী-সহপাঠিনী, সহকর্মী-সহকর্মিনী এবং আরও কতো। স্বামী-স্ত্রীর 'তোমার-আমার-আমার-তোমার' মতো অর্ধ-জন্ম-পূর্ণ-প্রকাশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সারাজীবন অনেক সোজা কথাই জটিল-কুটিল-বক্র হয়ে হয়ে জন্ম হয়ে যায়। অন্য সব ক্ষেত্রে যে তা কতো সহজেই হতে পারে তার জ্বলন্ত ইতিহাস তো আমরা সকলেই। ভাল কথা বলতে গিয়ে বিপরীত ফল আমরা অনেকেই হাতে নাতে না পেলেও

পেরে-যে-টি হতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা সোজা-সরল কথার যে কতো রকমের 'মানে' হতে পারে তার বৃত্তান্ত শুনে আমরা অনেকেই হাঁ হয়ে গেছি বা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছি যখন অর্থের কুহকী পাকিয়ে পাকিয়ে সেই কথা পাক খেতে খেতে আবার আমাদেরই দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে! এ-সব তো বানানো কথা নয়, সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা। তাই সোজা ভেবে যে কথাটা সহজ করে কাউকে বলা হল সেটা যে সোজাই হল তার নিশ্চয়তা কিন্তু কখনই পাওয়া গেল না। তাহলে সোজা কথা বলাটাই অতোই কঠিন নয়?

তাছাড়া এই লেখাটাই দেখুন না। সোজা করে, সহজ করে বলাটা কঠিন—এই সহজ-সরল কথাটাকেই সহজ করে এতক্ষণেও বলে উঠতে পারা গেল কি? অনেকেই অনর্থ করবেন, অনেকে মুখ বাঁকাবেন, অনেকে বিরূপ মন্তব্যও করবেন। কঠিন কথাকে কঠিন করে বলা সোজা, কঠিনতর করে বলার মধ্যে অবশ্যই দার্শনিকতা বা পাণ্ডিত্য আছে। কিন্তু সহজ কথাকে সহজ করে বলতে গেলেই তা সুকুমার রায় হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা আবোল তাবোল হয়ে দাঁড়ায়। ঔপন্যাসিকেরা জটিলকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাদের সৃষ্টিতে তাই জটিলের সুতো টানাটানি, চরিত্রের লুকোচুরি, ঘটনার ঘনঘটা। ছোটগল্প লেখকেরা জীবনের টুকরো খণ্ডের মধ্যে তাৎপর্যের আয়না ঘটিয়ে ব্যঞ্জনার ভাণ্ড খুলে বসেন। কবিরা সোজা অনুভবকে গভীর করে বলতে অভ্যস্ত। সবটাই দেখুন সহজকে সাদাসাপটা পরিবেশনের ব্যবস্থা নেই। নেই কারণ জীবনেই তো তার বন্দোবস্ত নেই। জীবনটাই যে জটিল, সোজা পথ সে কখনই নিজের পথ বলে মনে করতেই পারে না।

মনে যে করতে পারে না তার কারণ বোধহয় এই যে জীবন নদীর মতো। এঁকে-বেঁকে চলাটা তার স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। জীবনের যেমন দুটি বিন্দুই সব—জন্ম বিন্দু আর মৃত্যুবিন্দু নদীরও তেমনি দু-বিন্দু জীবন—উৎস আর মোহনা। সে দিক থেকে উভয়ের জীবনই সরল-সোজা হবার কথা, কিন্তু তা হবার নয়। নিজের নিজের স্বভাবের জন্যে, গতি-শক্তি আর হালদা গভীরের তাপের জন্যেই এরা পাক খেয়ে খেয়ে, এদিকে তাকিয়ে ওদিকে ঘুরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। সহজে আর সরলে তুষ্ট নয়, পাড় ভাঙা নোতুন জীবনের চরা তৈরি করে নিজের নিজের পিঠে জীবনেরই ছাপ খোদাই করার বাসনা এদের পেয়ে বসে। একদিকে যেতে যেতে এরা হঠাৎ হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে, যাবে দক্ষিণে তো চলন শুরু করে বিপরীত-বিরুদ্ধ দিকে। কখনও খেলার মেতে উচ্ছল হয়, কখনও সংগ্রাম সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তীর থেকে তীরতর আঘাত হানে। সহজ সোজা পথটি ছেড়ে অনবরতই আসে পাশে চরে বেড়ায়। এবং শেষ কালে যখন সেই শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছায় তখন অবশ-নিস্তেজ দেহ-মন নিয়ে বারে বারেই ভাবে: সহজ পথটুকু আর সোজা করে পার হওয়াই হল না।

হবার নয় বলেই যে হল না তা বুঝতে সকলেরই এক জীবন সময় লাগে। সময়ান্ত হলেই বোঝা যায় যে যাকে সহজ কথায় প্রকাশ করা যায় বলে মনে হয় তাকে সহজে প্রকাশ করার সুযোগই ঘটে না, আর বোঝা যায় যে সহজ কথাটাই সব থেকে কঠিন কথা।

মৃত্যুটাই সব থেকে সহজ কথা এবং সব থেকে কঠিন কথা। জন্ম আমরা জানি না, অনুমান করি মাত্র, মৃত্যু অনুমানের বিষয় না, প্রত্যক্ষের জন্যে মোহনায় অপেক্ষা করে থাকে মাত্র। সেই মৃত্যুতে আমরা যখন পৌঁছাই তখন তো নিজ নিজ পূর্ণতা নিয়েই পৌঁছাই। এই কথাটাও

সহজতমের একটি, কিন্তু কি কঠিন হয় তার প্রকাশ! সহজ আছে শৈশবে, আছে 'সহজ পাঠে'-র পাতায়; তার পর থেকেই সব কঠিন হতে হতে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কঠিনের ধারাপাত। জীবনের ধারাপাত।

ট্রেন-যাত্রী (লোকাল) ঃ

কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বেনটিংকে স্ট্রিট থেকে ফিরলাম। প্রচণ্ড গরম ছিল। বাসের মধ্যে যেন আগুনের হলকা চলছে। তার সঙ্গে 'এ্যাসফেটিড' গন্ধ! হ্যাণ্ডেল ধরা ঊর্ধ্বমুখ হাত বেয়ে বেয়ে ঘামের ছোট বড় লাইন গড়িয়ে গড়িয়ে কনুইমুখী, ঘাড়ের অনুভব কলারের বেষ্টনীতে ভিজে-কাঁথা, আর শরীরের অবাধ সান্নিধ্যে লেপ্টে থাকা গেঞ্জিখানা যেন জবজবে 'স্পঞ্জ'! গ্রাণ্ড রোডের ভ্যাম নরক-গুলজার করে তুলল। এক সময়ে, কখন যেন, হাওড়া ব্রীজের 'ব্রিজ'—শীতল হাওয়া—জানালার ফাঁক দিয়ে, মানুষের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে প্রাণ জুড়ানো গন্ধের প্রলেপ বুলিয়ে গেল: বুঝলাম এবারে অগ্নিগর্ভ উদ্গিরণ-মুক্তির ক্ষণ সমাসন্ন। হাওড়ায় স্টেশন-মুখ চত্বরে ভজন ভজন বাসের গর্ভ থেকে তখন শত শত নিত্যযাত্রী প্রবহমান বাতাসের নদীতে ঝাঁপ দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটে চলেছে আর এক অন্ধকূপের দিকে—সাবওয়ে বেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ছেঁড়ার পরতে পরতে উপরের দিকে চলেছে অগণিত মানুষের ঝাঁক। উদ্দেশ্য? পুনর্বার যন্ত্রযান গর্ভে প্রবেশ এবং গৃহ-অপেক্ষা। ট্রেন যাত্রা।

আমার লেখার বিষয় বাসের মধ্যের জীবন নয়, ট্রেনের মধ্যের জীবন। ট্রেনের 'জার্নি' বা ট্রেনে যাতায়াত। কখনও বেশ মজার, কখনও বিস্ময়কর, কখনও যন্ত্রণার আবার কখনও আনন্দের। ভারতীয় রেল আর ভারতবাসীর ট্রেন-কালচার, 'সাবার্বান' ট্রেন আর নিত্য এবং নৈমিত্তিক যাত্রীদের বিচিত্র-বিভিন্ন ভাব-ভালবাসা, ঝগড়া-বিবাদ, ঠেলা-ঠেলি হাতাহাতি এবং এই সব 'হাই-ভোল্টেজ' ড্রামার মধ্যে মধ্যে ভাসুড়েদের 'ওয়েসিস', তরুণ-তরুণীদের কোণে-বসা বিচ্ছিন্ন একাকিত্বের ঘনিষ্ঠ নৈকট্য, অথবা জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একান্ত উপাখ্যান উন্মোচনকারী মধ্যবয়স্ক-বাধক্য-লাঞ্ছিত বার্ধক্য বর্গের পারিপার্শ্ব ভুলে যাওয়া অবগাহন! এবং আরও কতো কি যে ঘটে, ঘটছে তার প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়, সুযোগ ও মানসিকতা আমাদের কর্মব্যস্ত দ্রুতলয় জীবনে খুবই কম আসে। একটু দূরত্ব রেখে সে সব দেখা বেশ মজার একটা অনুভব তোলে মনে। নৈর্ব্যক্তিক হওয়াটাই প্রয়োজন। চলুন আমরা বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ট্রেনে ওদের এই ধাবমান জীবনকে দেখার চেষ্টা করি।

যেমন খুশি তেমন দেখাটা কোন দেখাই নয়: একটা 'প্রোগ্রাম' বা পরিকল্পনা চাই তো? বৈজ্ঞানিক দেখা কি অত সোজা! কাদের দেখবেন এবং কোন্ ট্রেন দেখবেন? নিত্যই যারা একই সময়ে একই ট্রেনে করে যান তাঁরা নিত্যযাত্রী, তেইশি পেসেঞ্জার। ঐরাই নিজেদের মজা করে তির্যক শব্দে 'নিত্য পাষণ্ড' বলে আত্মবিজ্ঞার দিয়ে থাকেন। এই নিত্য যাত্রীদের অধিকাংশই অত্যন্ত 'উইটি', ভুক্তভোগী বাসকার, ভল-পয়ের মানুষকারোয়ার। কোনও কর ধার্য না করেই ঐরা সাধারণত গ্রুপ তৈরি করে চিহ্নিত কামরায় অধিষ্ঠিত হন এবং জীবন্ত উপস্থিতি বিস্ফুরিত করতে করতে টিন-মোড়া-কাঠ-সিমেন্টের যান্ত্রিক দূরত্বটুকুকে অবহেলায় পার হয়ে যান। ঐরা হাসামুখে

ট্রেনের—এবং জীবনের—অনেক অংশকে পরিহাস করে এগিয়ে যান অবসর জীবনের নিশ্চিন্ত একাকিত্বের দিকে। অবসর নিয়েও এঁদের অনেকেই এই অতীত ট্রেন জীবনকে নেশার মতো ধরে রাখেন। কিছুদিন বা অনেকদিন। শরীর-মনের 'কমপাস' তখন দিক-নির্দেশক।

সদ্য চাকরি পাওয়া ছেলে-ছোকরা-রা সদ্য কেরে আসা মফস্বলী জীবনের তাজা-হৃদ-রস নিয়েই ট্রেনের কামরায় নিত্যযাত্রীদের তালিকা বাড়ায়, কিন্তু শ্রেণী-স্বাতন্ত্র এদের প্রথম দিকের জীবনকে গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বলয়-চিহ্নে আটকে রাখতে পারে না। এরা অপরের প্রেম পুরিং করে, খুনসুটি করে প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের উদ্বেগ করে, টীকা-টিপ্পনী কাটে সমশ্রেণীর নিত্য-যাত্রিদের নিয়ে। তাদের সাজ-পোশাক, চুল-ভুরুর বঙ্কিম-বিলোম পরিশীলন (!), উচ্চারিত প্রশ্নপশ্চাৎ বিবেচনা এবং চড়ুই-চড়ুই দৃষ্টি চাঞ্চল্য নিয়ে। ভুলিয়েছেরে নয়, নিজেদের মধ্যেই। পড়াশোনার ঝামেলা শেষ, অভিভাবকদের প্রতি কোনও আর্থিক দায় তখনও দানা বাঁধে নি, রেস্তোরাঁ-মিষ্টির দোকান আর পানীয় এদের মরু অতীত থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। ট্রেনের মধ্যে এদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। চঞ্চল-চপল-উদ্ভাসিতদৃষ্টি, এরা 'কেরার-ফ্রি' গোষ্ঠী।

নিত্যযাত্রীরা শুধু কাছেরই নয়, দূরেরও বটে। চার পাঁচ ঘণ্টার দূরত্ব থেকেও বহু নিত্যযাত্রী কলকাতা আসেন। (এঁরা নিজেরাই নিজেদের বাহ্য করে বলেন যে ছেলে মেয়েদের সংখ্যা এবং অনুভূমিক দৈর্ঘ্যই এঁদের জানা! মধ্য উচ্চতা চাক্ষুষ করার সময় এঁদের হয় কৈ?) এই দীর্ঘ যাত্রাপথকে এঁরা সহজ করে নেন, তরাই করে তোলেন। একঘেয়েমি আর থাকে না খোল-করতাল ইত্যাদির শব্দ-তরঙ্গে। এঁরা গলাগান বাঁধেন, কীর্তন এবং কামরাটিকে মাত করে তোলেন। কীর্তন, টপ্পা, ঠুংরি, গীত, গজল। নানান স্বাদের, নানান অঙ্গের সংগীত সাধনায় এই সব নিত্যযাত্রীর দীর্ঘ পথ এবং সেই পথের অন্তরে বহু পথিকই তৃপ্ত হন এঁদের এই পরিকল্পিত অনুষ্ঠানসংগীতে।

অনেকেই দলবদ্ধ হয়ে যাত্রিকা, কিন্তু কিছু যাত্রী অঙ্ক 'পুনশ্চ' করেন যাত্রাপথকে, দীর্ঘসময়টুকুকে আনন্দঘন করে তুলতে। কবিতা আবৃত্তি, পাঠ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত নিত্যযাত্রী মহলে বেশ সমাদৃত। আনুষ্ঠানিক শিল্পীতে নয়, আড্ডার মেজাজে এই সব চলতে থাকে। শ্রোতাদের সংখ্যাও যেমন আছে, বিরক্ত হওয়ার সংখ্যাও আছে। রুচি তো বিচিত্র হবেই। তাই এই সব চলমান সাংস্কৃতিক ট্রেনানুষ্ঠান কামরাগুলোতে ভিড় হয় বেশ।

এবারে চলুন তাঁদের একটু দেখি যাঁরা ট্রেনের সকল যাত্রাসময়টুকুই গাম্ভীর্যের মোড়কে নিজেদের আপাদমস্তক মুড়ে রেখেছেন। সুটেড-বুটেড-টাইড। হাতে ব্রীফ কেস, চোখে সুদূরের দৃষ্টি আর গম্ভীরের দোহাই দিয়ে স্থির রেখে নিবিড় বসে আছেন। ইংরেজি কাগজখানা অনেক আগেই পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু খোলা ধরা আছে সামনে। ট্রেন কেন প্রথমশ্রেণী তুলে দিল?-এই প্রশ্ন যেন সদাসর্বদা আশেপাশের লোকেদের মধ্যে ঝাঁঝা-উঠিয়ে সতর্ক পাহারায় মজুত! প্রথম শ্রেণী থাকলে তো আর এই বাসখিজা-আর-সাধারণের সঙ্গে একসঙ্গে যাত্রা করতে হত না! এঁরা শরীরে থাকেন ট্রেনের কামরায়, মনে মনে যাত্রা করেন পুরানো দিনের প্রথম শ্রেণীতে। এঁরা তাই উপস্থিত থাকেন, হাজির থাকেন না। আশেপাশের কথা শোনেন (দেখেন না কখনই), কখনও উপভোগ করেন, কখনও বিরক্ত হন কিন্তু কখনই অংশ গ্রহণ করেন না। থেকেও-নেই এই সব অন-ঘর উর্ধ্ব-বিত্ত মহাজনেরা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে যান, তাদের প্রতি অনাগ্রহ-অসম দৃষ্টিপাত করতে

করতে। এদের বেশির ভাগেরই বাড়ি সুকুমার-বাংলায়।

এদেরই বিপরীত ব্যক্তিত্ব দেখতে পাবেন কামরাগুলোর মেঝেতে। একটা ময়লা কাপড়ের পোঁটলা বা ঝুড়ি বা ব্যাগ পাশে নিয়ে কামরায় ঢোকার একেবারে দ্বন্দ্ব-মধ্যিখানে দেয়ালের ধার ঘেঁষে এরা বসে যায়, বসে থাকে। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভিখারীরা আছে, দুঃস্থ মহিলারা আছেন, চোর-চালানকারী মেয়েরা আছে। এরা পারতপক্ষে অফিস-সময়টুকুতে গাড়িতে চড়ে না, অনেকের মতই এরাও অফিস-নিত্যযাত্রীদের সমীহ করে চলে!

আর আছে আপন মনে যাতায়াতকারী যাত্রীরা। এরা দল পছন্দ করে না, দলের শক্তি-কেন্দ্রকে এড়িয়ে চলতে চায়। এরা চুপচাপ একপাশে দাঁড়ায়, দু'চারটে ধাক্কা অবলীলায় সহ্য করে নেয়, পা-মাড়িয়ে দিলেও শুধু পা-টাকে বাঁচানোর মতো করে কষ্টকে ব্যক্ত করে। জীব প্রতিবাদ করে মাত্র। ঝামেলা এরা পছন্দ করে না। এরা দরজার কাছে দাঁড়ানোর জায়গা পেলেও সরতে সরতে দূরে সরে যায়, ভিতরে পরিবাহিত হয়। এরা, বলা যায়, গো-বেচারা, অত্যন্ত ভালমানুষের দল।

কিন্তু এদেরই 'কাউন্টার-পয়েন্ট' আছে, এবং তারা অত্যন্ত বিক্রমেই ট্রেনের মুখে, দরজার কাছটায়, অধিষ্ঠিত থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রায় সারা বছরই দরজার ধারের প্রবহমান তীব্র-ক্ষীণ হাওয়াটুকু পরম তৃপ্তিদায়ক। এরা সেই হাওয়া-ভুক নিত্যযাত্রী অথবা নৈমিত্তিক যাত্রী কিন্তু গায়ের জোর সীমাহীন! অদ্ভুত দেখায় সেরকম।

ট্রেন যাত্রীদের ওঠানামাই যদি বিরত না করলাম তা হলে কি আর করা হল? ট্রেনে ওঠাটা অনেকটাই কুরুক্ষেত্র নতুন এবং নামাটা তীর্থদর্শন সমতুল! কলকাতার আসে পাশে যে কোনও 'সাব-আর্বান' স্টেশন প্লাটফরমে আসুন এবং একটু দূরে দাঁড়িয়ে চার দিকে নজর ফেলুন। কলকাতা মুখী যে ট্রেনটা দেখলেন, ওটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। সেই শকট-সরীসৃপের আগমন, স্থির অবস্থান এবং নির্গমনটি আপনি দেখতে পান নি, প্লাটফরম পেরিয়ে গেছে এমন অবস্থায় দেখেছেন ধরে নেওয়া যাক। প্লাটফরম প্রায় ফাঁকা, দু'চারজন ঘর্মাক্ত কলেবর কিংবা পূর্বে-ধাবমান-কিন্তু-এখন-বিফলতার তিক্ত সেবন মুখ করে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। পরের ট্রেন ছাড়া গতি নেই। সম্ভাব্য লাল কালির দগদগে দাগ দেখতে পাচ্ছেন কল্পনার চোখে। অবশ্যই জানবেন ঐরা কোনও না কোন প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করেন, মাড়োয়ারী সংস্থা হবার সম্ভাবনাই সমধিক। আর ঐদের পাশাপাশি ঐ যাদের ছেলে দুলে তর্জনীর ডগায় লপেটা চুলের শির-চুম্বন করতে করতে বন্ধু সমভিব্যাহারে প্লাটফরম মুখী পতিকে মরাল নিন্দিত ভঙ্গি দিতে সক্ষম হয়েছেন ওঁরা অবশ্যই কোনও সরকারী দপ্তরের উজ্জ্বল আধিকারিক হবেন। 'মাইনাসে' 'মাইনাসে' প্লাস হয়, ছোট বেলায় স্কুলের অঙ্কের শিক্ষকের কাছে জেনেছি। এখন জানি লাভের দাগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম, 'প্লেট' হয় না!

আপন মনে এই সব ভাবতে ভাবতে আর দেখতে দেখতে কখন যেন প্লাটফরমে আবার জন-সমাগম বেশ ভিড় ভিড় আকার নিয়ে ফেলেছে। তাই দেখতে দেখতে পাদের নিচে, ঘরের আড়ালে আর সেতের অভ্যন্তরে দলে দলে বিভক্ত লোকেদের আগমন চলতে শুরু করে। একটা গরংগেছ ভাব যেন গোটা প্লাটফরমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিব্যাপ্ত। আপনি ভাবছেন এতো লোক কিন্তু কোনও গোলমাল নেই, ব্যস্ততা নেই, কেমন যেন বেশ সুশৃঙ্খল একটা বাতাবরণ। ঠিকই, কিন্তু ঐ দেখুন!

ট্রেন আসার সংকেত-বাঁশিটি বাজে উঠলো। আপনি কিছু বোঝার আগেই কেমন যেন সব তোলপাড় হয়ে গেল। যাত্রীরা মোটা নিয়ে নিল। সন্তানরা দরজা-জানলার অবস্থান, ছেলেমেয়ে-কামরা কোথায় তা ঠাঁকা জায়গা দেখেই বুঝে যাবেন, আর মহিলা-কামরা? রং-বেরং এর সমাহার কেতন উড়িয়ে ওড়না-ঢাকিয়ে তা আপনাকে জানিয়ে দেবে। মোটাবুদ্ধি যাত্রী-সৈন্যরা এখন যাকে বলে সঙিন উঁচিয়ে, বল্লম বাগিয়ে, কোদাল সামলিয়ে নিজেদের সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। প্রতিপক্ষকে একেবারে ধরের, এবং সুতরাং ট্রেনের দরজায় (যখন ট্রেন থামবে) যথাসম্ভব কাছে থাকার জন্যে যে যুদ্ধ যাত্রা-যুদ্ধ চলে তা দূরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু অনিবার্যভাবেই সেই 'ফাল্ড-ওয়ার' চলতে থাকে। যার সকলের দৃষ্টি আগত-ট্রেনটির ক্রোধ্যমান নরদেহের পরিমাণ পরিমাপে ব্যাপৃত থাকে। বাইরে থেকে জরুরীর চোখ না হলে বুঝতেই পারবেন না সেই আঁটপুষ্ট আঁটা পাঁচটির নয়, নরদেহের 'বেল' এর মধ্যে ফাঁক এবং ফাঁকি কোথায় এবং কতটুকু।

তিনটি মানসিকতা এবং দৃষ্টি স্রোত। যে মুহূর্তে ট্রেনটি থেমেছে তখনই জানবেন কিছু লোক নামতে চাইছে, বহুলোক উঠতে উদ্যত। এই বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাত, চেঁচামেচি, ঝগড়া এবং ঘাত-প্রতিঘাত। ক্ষণস্থায়ী সেই যুদ্ধ। কিন্তু সকল অস্ত্রই তখন মুখ-খোলা। কেবল মুখ খোলে না ট্রেনের দরজার কারণ সেখানে অনড়-অটল দাঁড়িয়ে আছেন একদল যাত্রী যাঁরা নামবেন না এবং উঠবেনও না, কিন্তু দরজার কাছের হাওয়া-প্রবাহটুকুকে আঁকড়ে থাকার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁদের পায়ের শক্তি, দাঁড়ানোর প্রকৃতি এবং সর্বংসহা মানসিকতা আরোহী-অবরোহীদের পেষণ-তাড়নায়ও যেমন অটল, মুক্তি-বিতানের নিয়মের ক্ষেত্রেও তেমনি অচঞ্চল!

ট্রেন ছেড়ে দিলেই যে শান্তি তা নয়, যুদ্ধ চলতেই থাকে। কারো চপ্পল চলে গেছে ট্রেনের তলায়, কারো চশমা ছিটকে চলে গেছে অদৃশ্য স্থানে, কারো পকেট ছিঁড়ে গেছে কারো বা ব্যাগের হাতলে। ক্রোধ, তিরস্কার, প্রতিতিরস্কার চলতে থাকবে। তার মধ্যে 'সোজা হয়ে দাঁড়ান' আর 'সরে দাঁড়ান', 'আমার পা মাড়াবেন না' আর 'ছাতা কেন আনেন!' ইত্যাদি রুক্ষ-কঠিন নির্দেশ, উপদেশ ক্রমক্রমাই করে তোলে সেই সদা তোলপাড় করা নব-নর-বিন্যাস। পরের স্টেশন আসার আগেই আগের স্টেশনের যুদ্ধ শান্তিতে রূপান্তরিত। এবারে তাঁরাই দরজার মুখ আটকে আছেন যাঁরা আগের স্টেশনে এটাকে অন্যায় বলে ধিক্কার দিয়েছেন। এই রং বদল মন-বদল নিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই প্রকৃতি। প্রত্যেক স্টেশনে এই প্রতিপক্ষের স্বপক্ষে চলে আসাটা এতোই সুবিধাবাদী যে এটা কারোই বিবেকদংশনের কারণ হয় না। সময়, সুযোগ এবং সুবিধা তোষের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের নিত্যজীবনের স্ববিরোধ বোধগুলো উড়িয়ে সমান ও সমান্তরাল করে দিয়েছে। যাঁরা ট্রেনে যান না কিন্তু রোজ বাসে-ট্রামে-মিনিতে করে অফিসে যাতায়াত করেন সেই শহরবাসী বন্ধুরাও এই বিবেক-সরলীকরণ-প্রক্রিয়াটির অফুরন্ত নমুনা রোজ টের পাবেন বাসে-ট্রামে-মিনিতে উঠতে-নামতে।

এবারে আপনাকে কল্পনার দৃষ্টিতে ট্রেনের এবং বাসের ইত্যাদির অভ্যন্তরে একটু নজর বুলিয়ে নিতে বলব। দরজার কাছে যাঁরা অতি কষ্টে পায়ের ঠোঁ টা রাখতে পেরেছেন এবং সার্কাসের কুশলতায় শরীরটাকে ত্রি-একরকম করে ট্রেনের গতির সঙ্গে সামিল করে রেখেছেন, তাঁরা ক্রমান্বয়ে 'একটু ভেতরে চলুন', 'এগিয়ে যান', 'ভিতরে জায়গা থাকতে কেন দরজার কাছে ভিড় করেছেন' ইত্যাদি বাক্যে ভিতর-স্টেশন যাত্রীদের অনুরোধ করছেন, ঠেলে দিচ্ছেন অথবা পায়ের জোরে পথ করে

নিতে চেষ্টা করছেন। কেবলমাত্র দরজার মুখটিতেই এই ঝুঁকি-বিপদ-সার্কাসের প্রভাবে একটু-আধটু-নড়াচড়া ছাড়া দেখবেন ভিতরের দিকে দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা কেমন টান টান অনড় স্থির হয়ে আছে। ওঁরা যে একই ট্রেনের যাত্রী, ওঁদেরও যে কোনও দিন অনুরূপ অবস্থায় ঝুলতে হতে পারে এবং একই রকম 'এস-ও-এস' প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে তা যেন স্বপ্নের সম্ভাবনাও নয়! ভিতরের দু-চারজন, যাঁদের বিবেকবোধ এবং স্বাভাবিক মানসিকতা ট্রেনীয়-সরলীকরণের চাপে এবং তাপে সমান্তরাল হয়ে যায় নি, তাঁরা দু'চার পা সামনে-পাশে ঢুকে যাবেন এবং সেই সামান্য ভিড়-সঙ্কোচনের ফলে যতটুকু স্থানের সঙ্কুলান হয়ে ওঠে তা গড়াতে গড়াতে অনেকটাই হারিয়ে গিয়ে বিন্দু-পরিমাণ শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে মাত্র। এবং পরের স্টেশনে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! [অথবা পরের স্টেপেজে!]

কলকাতার সাবার্বান ট্রেনগুলোর চরিত্র এক হলেও ভিড়ের স্বরূপ কিন্তু একরকম নয়। হাওড়া মেন, হাওড়া-সাউথ থেকে আলাদা, আবার এরা আলাদা শিয়ালদহ মেন ও সাউথ থেকে। আর সব থেকে আলাদা বনগাঁ লাইন। বনগাঁর বিপরীত ডানকুনী লাইন। এই প্রভেদের মূলে অনেক কারণ আছে। নিত্যযাত্রীরা কোথায় যান, কেন যান, এবং তাঁদের শতকরা হিসাব আলাদা। তাঁদের বিশ্বাস, মানসিকতা, প্রতিন্যাস-প্রীতি, তাঁদের ধৈর্যের সীমা, মেজাজের গভীর-অথবা-ঠুনকো অবস্থা, গতির-এবং-সময়ের হিসেব এবং সব শেষে সামাজিক-পারিবারিক ভাল-মন্দ বোধ, মূল্য বোধ। 'আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ' বলে কোনও সাহিত্যিক মতপ্রকাশ করেছিলেন অনেক দিন আগে। তখন যে পরিমাণ 'বেগ' দেখে অমন বলেছিলেন, আজ সেই বেগ বহুগুণ বেড়েগেছে, তাই তদনুযায়ী প্রভেদের আগমন ঘটে তীব্র সব আবেগ আবার এসে পড়েছে। বিশ্বাস না হয় বনগাঁ লাইনের কোনও ট্রেনের ভেতরে প্রতিনিয়তর কুরুক্ষেত্র দেখে অথবা শিয়ালদহের সাউথ ট্রেনের মধ্যে যে ঝুড়ি-মানুষে, বস্তা-যাত্রীতে তাণ্ডব চলে তা একবার দেখে আসুন। আবেগ কেড়ে তো নেয়াই নি বরং বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

আপনারা বলবেন, এবং ঠিকই বলবেন, বেগ-এর জন্যে নয়, ভিড়ের জন্যে এ-সব ঘটে। জন-বিস্ফোরণ আমাদের মাথা গোঁজার স্থানেই টান ফেলে নি, মনের স্থৈর্যে চিড় ধরিয়েছে অনেক অনেক বেশি। সব তরী ওলোই অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে। ট্রেনের সংখ্যা, রাস্তার পরিসর, অফিসের চেয়ার, শ্বাস-নেবার বাতাস—সব, সবই ছোট্ট হয়ে গেছে। আপেক্ষিকতার চাপে। কোথায়ও তাই ঠাঁই নেই। সর্বত্রই অনটন। এই অনটনের চাবুক খেয়ে খেয়ে আমরা ছটফট করছি। আর অকারণ উত্তেজনার ভুল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে চলেছি। ঝুড়ি-বস্তা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, আমরা যাঁরা অফিস-কাছারি করি তাঁরাও নই ওদের প্রতিপক্ষ। ফুট বোর্ডে যিনি ঝুলছেন আর ভিতরে সিটে যিনি বসে আছেন ঐরা দুজনেই যাত্রী, সকলেই নিজ-নিজ কাজে যাত্রী। সমগোত্রীয়। তা সত্ত্বেও ঐরা অন্যায় প্রতিপক্ষ হয়ে, ক্ষণিক হলেও, দিন-দিন-প্রতিদিনই ঝগড়া-সংগ্রাম-যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয়, রক্তক্ষয় এবং বিবেকের সরলীকরণ করে চলেছেন। প্রকৃত প্রতিপক্ষ আছেন দূরে, নিশ্চিন্তে, নীরবে। কখনও কোনো লাল বাড়িতে, কখনও কোন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, কখনও আরও দূরে, শহরে-শহরে বিভক্ত হয়ে। পাঁচ বছর অন্তর ঐরা রোদ মাথায় করে, হাত জোড় করে, মাইক্রোফোনের সোচ্চার কণ্ঠে আমাদের কাছে আসেন, আসবেন। তখন জানাবেন মাছ কাটিয়ে সুতো দেবো, কাঁচি ডুবিয়ে দুধ খাওয়াবো, রাস্তা তৈরি করে যাতায়াত ভূমিকম্পহীন করে দেবো,

আর দেবো রাজ-পুত্র বা রাজকন্যা। চাকরির জন্য অফিস দেবো, ব্যবসার জন্যে টাকা দেবো, বাড়ির জন্যে জমি দেবো, এবং দেবো আর দেবোর সচন্দন পুষ্প মালা। যে পুজোর যে বিধি। জোটাই দিয়েন এবং তাঁরা অমনি নিরুদ্দেশ হয়েন। রইলাম আমরা সমযাত্রী-সহযাত্রীগণ। চলছে-চলবের ছক-টাঁচ-কষা জীবন। আমরা রাস্তায় একে অপরকে ধাক্কা দেবো। পা মাড়িয়ে দেবো বাসে-ট্রামের কুট বোর্ডে আর বাঘের মতো গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করতে থাকব ট্রেনের কামরায় কামরায়। ভাবার আমাদের সময় নেই, না-ভাবতে-ভাবতে আমরা ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। যে প্রবৃত্তির অস্বীকারের ভিত্তিতে আমাদের সভ্যতার পত্তন, আমরা ফিরে চলেছি আবার সেই প্রবৃত্তির খাসমহলে। সভ্যতার এক প্রকাশ যে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি, সুবিধা সুযোগ, সেখানে প্রভূত পরিবর্তন আর রং-বেরং-এর উপচার সংযোজিত হচ্ছে, কিন্তু সভ্যতার আর এক প্রকাশ যে শীলিত মানসিকতা, ধৈর্য আর সহানুভূতি, সেখানে আমরা ক্রমশই নিঃস্ব, রিক্ত হতে চলেছি।

সোজা কথা বলতে গিয়ে কেন এবং কখন যেন কঠিন বিষয়ে ঢুকে পড়েছি। রাগে ভয় দিয়ে সরে পড়া যাক। আমার বন্ধুটি ঐ অদূরে ক্যাল ক্যাল করে আমার এই 'মুড'-পরিবর্তনে হকচকিয়ে গিয়ে থাকবেন। আসুন এবারে আমরা হাওড়া-শিয়ালদহে এই নিত্যযাত্রীদের অবতরণ প্রক্রিয়া এবং ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি।

ট্রেন সবে প্লাটফরমে ঢুকেছে তো ভেতর থেকে হাঁক উঠবে 'নেবে পড়ুন' 'নাবুন দাদা নাবুন'! এবং ভিতরের নরগোষ্ঠীর চাপে দরজার ধারে দাঁড়ানো নর-সুতোর সেলাইটুকু প্রায় ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবার দাখিল! বলুন তো কেন? কিসের তাগিদ, কিসের অভাব? সময়ের? ধৈর্যের? সুস্থ মানসিকতার? অথবা এর সবগুলোই এক সঙ্গে গুঁতো মেরে মেরে আমাদের প্রবৃত্তি-তাড়িত করে তোলে?

দু'রকমের দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম, যদি ঐ ট্রেনটিই আবার এখুনি 'আপ'-ট্রেন হয়ে বাইরে যায়। তাহলে তো নরক গুলজার! ভিতরের ক'একশো লোক আর বাইরের কএকশো অপেক্ষারত একই সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার শুরু হয়ে যাবে। প্রথম দলের সময় নেই, অফিসে-কাছারিতে দেরি, দ্বিতীয় দলের অপেক্ষার সময় নেই সুবিধামতো বসার আসনটি প্রত্যেকেরই যে চাই! কিছুক্ষণের জন্যে চলবে একই 'স্কী-সর-অর্স স্পোর্টস'। মাথা এবং কনুই এর সুচারু ব্যবহার, কঠিন 'এ্যাটাচি কেসের' রুক্ষ আঘাত, হাত এবং পায়ের মোক্ষম কারসাজি। নহ-মাতা-নহ-কন্যা-নহ-পিতা-নহ-বন্ধু—সে এক অভিনব জন-পেষণ, জন-জাল, জন-জুট। দুপ-দাপ, ধুপ-ধাপ শব্দ, ক্রমাগত, ধস্তে আর খবরের কাগজ মুচ্ছ সময়ের রাশন দোকানের লাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কয়েকটি মুহূর্ত, তার পরেই ভিতরের চেহারা শান্ত। কিন্তু বাইরে? প্লাটফরমে? ট্রেনের কামরাগুলো যেন 'বাঘেরের' জল-মুখ-পেট হয়ে মানুষের বন্যা বইয়ে দিয়েছে সেখানে। ঢেউ-ঢেউ নর-দঙ্গল উর্ধ্বমুখ ছুটে যেতে চায় সাবওয়ের দিকে, বাসস্ট্যান্ড তাদের অনেকের মোক্ষ, কয়েক বা ফেরি ঘাট। কিন্তু ছুটে যেতে চাইলেই তো যাওয়া যাবে না, বিপরীত মুখী জনস্রোত আছে, আছেন রেলের অন্দর মহলের নিজস্ব বাসিন্দা হকাররা, ভেণ্ডাররা। ওঁরা আছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো সব সুবিধার স্থানগুলো ভোগ দখলী সত্ত্বে! প্রতি পদে বাধা হয়ে, নিষেধের ডোর হয়ে, বসে আছেন অনেক ছোট-পরিবার সুখি পরিবার। কিন্তু বছরের তাদের সুখের কারণ হলেও, এই সব সদা-ট্রেন-গর্ভ-উদ্গিরিত নিত্যযাত্রীদের তো প্রশান্ত। তাই সুদীর্ঘ-প্লাটফরমে ছোট ছোট দল, বড় বড় ঘাত-

প্রতিঘাত, হাতের গুঁতো আর কনুই এর ধাক্কা। পথ করে নেবার, আগে বেরিয়ে যাবার অফুরন্ত প্রচেষ্টা। বিশৃঙ্খল-উশৃঙ্খল কায়-আগে-কে-পারে এগিয়ে যেতে তার প্রতিযোগিতা। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাকে বাড়ায় না, বিশ্বাসকে অটুট রাখতে সাহায্য করে না। তবুও এটা ঘটে, ঘটছে এবং প্রতিপক্ষ নির্বাচনে নিশ্চয় না হলে, ঘটবেও। এটা তাই নিত্য ঘটনা, নিত্যযাত্রীদের রোজ-নামচা। এবং আমরাই একদিন আমাদের নিজেদের দিয়ে মেরে ফেলব যদি অন্য কাউকে সময় মত পিষ্ট করে বাঁচার রসদ আদায় করে নিতে না পারি।

নিত্যযাত্রীরা মাছের মুড়ো চায় না, আরও বেশি ট্রেন চায়, কল্পি ডুবিয়ে দুধ খেতে আগ্রহী নয়, বসে বসে পরিচ্ছন্ন বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে যাতায়াত করতে চায়। অনাথা একদিন আসবে যখন এই সব লোকাল ট্রেনের স্থান হবে কোনও মিউজিয়ামে, লেখা থাকবে: এই সেই বৈদ্যুতিক বাহন যাতে করে এক ধরনের প্রাণী, নিত্যযাত্রী, যাতায়াত করতো বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত।

বক্তব্য আবার ভারি হয়ে পড়েছিল। এবারে দূর পাল্লার ট্রেন যাত্রায় একবার উঁকি দেওয়ার আগে কিছু কিছু প্রাণান্ত দৃশ্য এবং অবরে-সবরের একান্ত নাটকীয় দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক।

একটু বেলা হতে না হতেই বেরিয়ে পড়বে হকার ভাইরা। ওদের জীবন সংগ্রাম। পরিমাণমত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করতে না পারলে ওদের মুখে-চোখে ঝরে পড়বে বিকৃতির ছাপ আর গৃহে ধিক্কারের বাতাবরণ। তাই ওরা মরিয়া হয়ে কামরা থেকে কামরান্তে ওঠা নামা ক'রে নিত্য-নিত্য দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে বেড়ায়। ভিড়? ওদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। ওদের কনুই-এর ধাক্কায়, ঝুড়ির আঘাতে আর ব্যাগ-বয়েম-ইত্যাদির গুঁতোয় পথ করে দিতে যাত্রী সাধারণের কাঁধ-মাথা-ভুঁড়ি এদিক-ওদিক সরে-ছিটকে যাবে। যাক! ওরা কিন্তু 'মন চ্যাঙ্গেস্টিং' কণ্ঠের ওঠানামায়, শব্দের ঝংকারে আর বক্তব্যের নাটকীয়তায় সকলকেই মাত করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তখন যাত্রীদের প্রকৃতি পাল্টে গেছে, অফিসযাত্রী নয় আর। এখন ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা, উমেদাররা, আর তদবিরকারীরা ভিড় করে থাকে। ধাক্কা ধাক্কি, গুঁতো গুঁতি, চেঁচামেচি, সোরগোল লেগেই থাকে কামরায় কামরায়। সে এক অপূর্ব 'ক্যাকোফোনি'। পরিবার-পরিজন নিয়ে, ভিড় এড়িয়ে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াতেরও এটাই সময়। পড়ানো বেলায় এই সব যাত্রীরা বেখাপ্পা প্রতিযোজনে অক্ষম। শিশুরা চিৎকার করে কাঁদবে, কিশোর-কিশোরীরা ঘটনাকে গিলবে, আর বড়রা নিমপাতা-মুখ করে জানালা-মুখী-দৃষ্টি ফেলে সবই হজম করে চলবেন। এটাই নিত্যকার ঘটনা। বিক্রিও যেমন প্রচুর বিকৃতিও তেমনি বিচিত্র।

ট্রেনে হাফ-টিকিটের ব্যবস্থা আছে বিশেষ বয়সের নিচের বালক-বালিকাদের জন্যে। কেন করা হয়েছিল এই ব্যবস্থা? যে কারণেই করা হোক না কেন সেই কারণ বা কারণসমূহ বিবেচনা করার সময় কি বিবেচকদের মাথায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা খেলে নি? যে কামরায় আমরা পঞ্চাশজন অনায়াসে যেতে পারি, সেই কামরাতেই ওরা, যাদের বপু এবং পরিসর উভয়ই আমাদের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ, তারা মাত্র কুড়িজন থেকে পঁচিশ জন অনায়াসে আঁটতে পারে। তাহলে ডবল-টিকিটের ব্যবস্থা করলেন না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ট্রেন থেকে এক দুই জন লোক নেমে গেলে সেখানে স্থানের সংকুলান নজরে পড়ে না, ওরা যে নেমে গেলেন তার কোনও প্রভাব

পড়ে না ভিড়ের মন-কুনটে। আবার দেখুন তেমন তেমন এক জন নেমে গেলেই মনে হয় এক কাঠা মতো স্থান ফাঁকা হয়ে গেল! তাহলে রেলের (এবং বাসের) কর্তৃপক্ষেরা জনপ্রতি টিকিটের সংস্থান রাখেন নি কেন?

আবার জনম-পাকড় ট্রেনের কামরার কামরায় দেখবেন কোণ-ঘেঁষে সব ভোজানো তাসের আসর বসে গেছে। জীবন-সংগ্রামে উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ট্রেনস্থ-জীবন যখন শেষ থেকে ভিতর পর্যন্ত উথাল-পাথাল তখনও এঁরা চতুর্বর্গ বেইনীতে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। জগৎ ও জীবন এঁদের কাছে গতিহীন, স্থান, একমাত্র পত্তাই এঁদের মধ্যে জীবনের সাড়া জাগাতে সক্ষম। জগৎ নয় তাসের নিজস্ব 'পড়' এদের সকল ধৈর্যের আর সমস্ত ঐকান্তিকতার ধারক ও বাহক। কখনও একখণ্ড লাজসাজু, কখনও সঙ্গের এগটাচিখানা আবার কখনও ছেঁড়া রুমালটুকুই এদের কাছে টেবিল-এর তুলামূল্য। এঁরা অবশ্য অপর যাত্রীদের বিরক্ত করেন না, অনেককেই আকর্ষণ করেন। কিন্তু এঁদেরই আত্মার আত্মীয় যারা পরস্পর মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি আবর্ত তৈরি করে হাতে হাতেই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সমাপন করে তারা কিন্তু এখেবেও-না-পথও-হাড়বে-না স্বভাবের। সরতে গেলে চতুর্বর্গ সংহতি বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা এবং সুতরাং সুচায় মেদিনীও এরা ত্যাগ করতে রাজি নহে! বহু বিবাদ, প্রভূত বিতণ্ডা এবং ভূরি ভূরি শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনাকে এরা নিত্য বলে মেনে নিয়েছে। চলছে-চলবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন!

এ-ছাড়া আছে কিছু 'ওয়েসিস', পদ্মা-ধারের বাতাবরণ। ট্রেনের মধ্যেই তা আপনি দেখতে পাবেন। কল্পনায় সবই সম্ভব, মনে করে নিয়েই তো হয়! ট্রেনের কামরার মধ্যের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যেও কোথাও এদের হারিয়ে যাবার নেই মানা, একান্ত, একেবারে যেন একা-একা দুজনা। ছোট-ছোট কথা, মৃদু-মৃদু হাসি আর 'সাব-কোকাল' আবেগ এদের রুদ্ধদ্বার বক্ষ-ভেদ করে অবরে-সবরে ছবি ছবি প্রকাশ পায়। শালীনতার গণ্ডিবদ্ধ বৃত্তের মধ্যে ওদের মন পাখি ঘুরে ঘুরে সমস্তটুকুর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে নিতে চায়। আধুনিক জীবনের তীব্র গতি আর সুতীব্র-ভিড় আমাদের সব আবেগকে যে নিঃশেষে কেড়ে নিতে পারে নি তার জন্যে আমরা কাদের কাছে ধন্যবাদ জানাবো? বহু অতীত বিস্তৃত হয় এই ট্রেনের ভিড়-বিস্মৃত কোণে, পর্যালোচিত হয় বাস্তব বর্তমান আর একে একে একা-একা দিনের কল্পনার-ফুলে গ্রথিত হতে থাকে অনন্ত ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলো। উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে নয়, কপোত-কপোতী মধ্য ট্রেনের কামরার কোণ-কেন্দ্রে! আদ্যন্ত ধরপরানিতে মোড়া, যান্ত্রিক জীবন পরে এই ট্রেনের কোণ গুলিই কবিতা হয়ে ফুটে ওঠে, ছোট পদের আমেজ বয়ে আনে। কথা শেষ হয় না, যাত্রার ছেদ পড়ে। ট্রেনও চলে, মনও চলে, ট্রেন থামে কিন্তু মির মিরে কল্পনা নিশ্চয়ই পাখা মেলে! যাত্রাপথ শেষ হয়ে যায়, কথা কিন্তু হইল না শেষ!

ট্রেনযাত্রী-লাভ ঃ

দূরের ট্রেন গতিতে আলাদা, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। তেমনি যাত্রীদেরও স্বরূপ আলাদা, চরিত্র ভিন্ন। বর্ণিতক্রম বাদ দিয়ে এই ট্রেনের যাত্রীরা দৌড়ে এসে গাড়ি ধরেন না, হাওয়ার জোরে দরজার মুখ আগলে দাঁড়াবেনও না। এঁরা অনেক সময় কম্পিতে বেঁধে প্রস্তুত হন আর ট্রেনের প্লাটফরম

প্রবেশের আগেই বাক্স-পেঁটরা সনাক্তিবাহারে প্রতীক্ষা করেন। যাত্রীদের ক্রম-আগমনে প্লাটফরমের মেঝেটুকু ক্রমশই অদৃশ্য হতে থাকে। এঁদের ধৈর্য অনেক, অপেক্ষার তীব্রতাকে এরা একান্ত করে ট্রেনের গর্ভে স্ব স্ব স্থানের অধিকার উদ্দেশ্যে একাগ্র করে তোলেন। দল-প্রধান অনুচরদের যথাবিহিত নির্দেশ উপদেশ আগেই বিস্তারিত দিয়ে রাখেন। অপেক্ষার দীর্ঘ সময়টুকুকে এঁরা পরিপূর্ণ করেই ব্যবহার করেন। পথের খাবার সংগ্রহ, জলের যোগান থেকে শুরু করে যারা 'সি-অফ' করতে এসেছেন তাঁদের প্রতি শেষ উপদেশ-নির্দেশ অনুরোধ-উপরোধ পর্যন্ত সুচারুভাবেই সম্পন্ন করে ফেলেন। এঁরা অনেক দূরে যাবেন এবং সম্ভবত অনেক দিনের জন্যেই যাবেন।

সময় যতই এগিয়ে আসবে ততই দেখবেন আর এক প্রকৃতির যাত্রীরা অপেক্ষাকৃত ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসবেন। এরা দূরের গাড়ির দুরু-দুরু-যাত্রী। হাতে এটাচি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে এঁরা এবারে ত্রস্ত লয়ে সহযাত্রী বন্ধু-অনুবন্ধদের ইতি-উতি দৃষ্টি ফেলে ফেলে এগিয়ে আসবেন। 'মিটিং-পয়েন্ট' মোটামুটি সকলেরই জানা। যে সব কামরায় সিটিং একোমোডেশন থাকে তারই কাছে পিঠে এঁরা এসে দাঁড়িয়ে পড়বেন। এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বেশ চতুর চৌখোস। তাঁরা প্লাটফর্ম-এর কাজ করেন। ট্রেন প্লাটফরমে ঢুকলেই এঁরা রুমাল, কাগজ, ব্যাগ ম্যাগাজিন এমন কি চিরুনি ছুঁড়ে দিয়েও সিট-রিজার্ভেশন করে ফেলবেন। রেলের বিজ্ঞাপন দেখে আর প্লাটফরমের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে সিট রিজার্ভেশন ত্রিবিধ: এক, রেলকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় দর্শনী দিয়ে আগে থেকেই সিট রিজার্ভ করা যায়। দুই, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হাতের যে কোনও 'হ্যান্ডি' দ্রব্য-নিক্ষেপণে সিট-দখল করার পদ্ধতি, এবং তিন, এটা মোক্ষম পথ, জোর-যার-মুলুক তার পদ্ধতি। যে স্থান আপনার রুমাল অধিকার করে রেখেছিল সেই স্থান, ট্রেনের মধ্যে যখন ঢুকতে পারলেন তখন দেখলেন, অন্য কোনও যাত্রীর পশ্চাদ্দেশ-তলে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, আপনার রুমাল হয় মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে অথবা তার পিঠ-ঠেসের উপর চড়ে বসে আছে, অথবা একেবারেই বেপাত্তা! আপনার সামনে দুটি পথ খোলা আছে: যুদ্ধ অথবা শান্তি! আপনার অভিজ্ঞতা, অপরের ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি নির্ণয়ের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক-নির্দেশ অনুধাবন ক্ষমতা আপনার একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ চতুরতায় সহায়ক হবে। যুদ্ধ? শান্তি? আপনি জানেন সর্বোত্তম, আপনি বোঝেন সর্বোত্তম! রণে ভঙ্গ দেবেন না মরণে ঝাঁপ দেবেন তা আপনিই জানেন। ফলাফল? রুমাল যেমন ফেরত পেতে পারেন স্থানের দখল সহ, যদি আপনার দল-শক্তি প্রতিপক্ষের তুলনায় সমধিক হয়, অন্যথা রুমালের সঙ্গে নাক, নাকের সঙ্গে দু'চার ফোঁটা রুধির এবং অজস্র অসম্মান আপনার ঝোলায়—অভিজ্ঞতার এবং দেহের—সংগ্রহ হবে মাত্র। এটা মরণ ভুলা মনে হবে তখন! তাই সহজেই বলা যায় যাত্রীর 'বর্গ' নিশ্চয় করে দেবে যুদ্ধ না শান্তি কাম্য।

এই দ্বিতর রিজার্ভেশন পদ্ধতির জন্যে দ্বিতর যাত্রীও আছেন। প্রথম দল সংসারী, হিসেবী এবং পরিবার-পরিজন-বাহি। তাই তারা 'ফেয়ার' পথে 'ফেয়ারলি' থেকে স্ব স্ব স্থানগুলো অনেক আগেই দ্বিতীয়ের তাৎক্ষণিক রুমাল-কাগজের আওতা থেকে সরিয়ে রাখতে চান এবং তৃতীয়ের 'মাইন্ড'-অভিযানের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। দ্বিতীয় বর্গের যাত্রীরা নিত্যযাত্রী অথবা দেখে-শুনে নিত্যযাত্রীর মতো ব্যবহার করতে চান। এঁদের সঙ্গে থাকে মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিট অথবা দৈনিক। এঁরা খড়দপুর, বাড়গ্রাম, দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুরের যাত্রী। প্রথম পদ্ধতিতে

রোজ রোজ সিট রিজার্ভেশন বাস্তবও নয় সম্ভবও নয়। তাই এঁরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে কামরা নির্ধারণ করেন আর গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকলে কামরা-কমাণ্ডকে 'মিসাইল' করে টার্গেট স্থির করেন। এবং বেশ 'প্র্যাকটিসড্' হলেই এঁরা এটা করতে পারেন। এবারে দেখা যাক তৃতীয় বর্গের যাত্রীদের প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র।

এঁরা চলেন প্রধানত 'হার্ড-ইনটিংক্টে'। নিত্য অফিস-দপ্তর-কারখানামুখী যাত্রীদের কাছে তা অবশ্যই 'হার্ড' হয়ে প্রকাশ পায়। এই তৃতীয় বর্গীয় প্রধানতই ছোট-বড় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বাজারে আসেন কলকাতায়, কেনা-বেচা করতে। ছিট কাপড়, পি-থ্রীর পাকেট আর বিচিত্র-বিভিন্ন দ্রব্যের বাণ্ডিল এঁদের সঙ্গী। এঁদের মাতামাতি দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধে সংহত। এঁদের ক্ষেত্রে গায়ের জোর, কণ্ঠের অনাভিধানিক ভাষা এবং চোখের রক্তাভ চাহনি বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গি এবং প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের নাটকীয়তায় এঁরা বাজি মাত করেন। ঘরের খেয়ে অন্যান্য যাত্রীরা এই ট্রেনের মহিষ তাড়াতে আগ্রহ দেখান না। 'সব শেয়ালের এক রা' নীতিতে এঁদের একজন হুংকার ছাড়লে সবাই সামিল হয়ে পড়েন। বন্যেরা বনে সুন্দর, 'ট্রেডার্স'-রা অবশ্যই ট্রেনের অসুন্দরের তাণ্ডব কেন্দ্র। এঁরা অন্যের ঘাড়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভাড়ের চা লুফে নেন, ছলকে কোনও সহযাত্রীর জামা-প্যান্ট নষ্ট করলে 'সরি' বলেন এবং ভাবখানা এমন করেন যেন ঐ 'সরি'-টুকুই জাদু-শব্দ! সব যেন সরি-তেই বিলীন হয়ে যাবার কথা। হয়ত তাই, কারণ সাপের লেজে কেউ সজ্ঞানে পা রাখতে রাজি নন! এই সব গুঁড়ুত কাঁচা-পয়সা-পকেট যাত্রীরা বারে বারেই সিট ছেড়ে উঠে পড়েন, কাঁধ আর কনুই-এর পর্যাপ্ত ব্যবহার করবেন আগে-পিছে মাতামাতের অতীব সংকীর্ণ পথে, আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পিঠ-চাপড়িয়ে পেটে-ঘুসি মেরে চুল ঘেঁটে দিয়ে আড্ডা মারবেন। এঁদের কাছে দূরযাত্রার জন্যে সময়-ভরাটকারী কাগজ-জানাল, বই-পুস্তক যেমন থাকে না তেমনি আলোচনা করার মতো বিষয়েরও অভাব থাকে। তাই এরা সুযোগ পেলে তাসের বাণ্ডিল বার করে দল বাঁধেন, অন্যথা সিনেমার হিরোইন বা পাড়ার 'মাস্তান' নিয়ে মশগুল হয়ে পড়েন। অন্যের রুচির প্রতি সম্মান এঁদের ভাবনার মধ্যে কেন ধারে কাছেও ঠাঁই পায় না। এঁরা দুর্বার, এরা বিদ্রোহী, এরা ছন্নছাড়া, প্রকৃতির একেবারে অতীত-সম্ভব অম্বর মহলের প্রাণী হিসেবে এদের প্রয়োজন এবং উপভোগের সীমা নিষ্ঠুরতাবেই স্বল্প। বৃহৎ-এর জন্যে এঁদের কোনও আসক্তিও নেই অনুভবও নেই।

ঐ সব দুরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে তাই বিচিত্র রকমের মানসিকতা প্রকাশ পায়। নৈমিত্তিক যাত্রীদের অনেকখানি সময় চলে যায় কাচ্চাবাচ্চা আর মহিলাদের জন্যে নানাবিধ [illegible] বাক্স পেঁটরা গুছিয়ে রাখতে আর আদর-আবদার রাখতে রাখতে। [illegible] কথাটি ঠিক সঠিক বলা হয়েছিল কিনা আর ঐ যাঃ ভুলে গেছি [illegible] করতে [illegible] সময় [illegible] টাকার [illegible] নিয়ে বয়ে পেছনে সরে সরে যায়। অন্যদের চলমান সময়ের কম সোম-কাজন হয়ে একেবারে আসা যাওয়া করেন। খাবার, পুতুল, অন্যান্য খেলনা। ছেলে-মেয়েদের মন টানে, কান্না-কান্না মুখগুলোই এদের 'বিজিনেস কাস্টমার'। চোখের জলের ধারায় ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়, ক্রন্দন রোল তাকে অবিলম্ব করে তোলে। মায়েদের চোখে-মুখে অনুরোধ ফুটে ওঠে, বাবাদের চোখে-মুখে বিরক্তি আর শোষিত [illegible] মৌখিক বেখাপ্পা আড়ুকোনো প্রকাশ পেয়ে যায়। নির্লিপ্ত-নিরপেক্ষ মুখ করে [illegible] পরের সম্ভাব্য বন্ধু-সঙ্গকে অন্বেষণ করতে থাকে। আসেপাশেই

মুড়িওয়ালার টিনের ডেরের সঙ্গে কৌটার ঝুলন্ত মুকটিগুলোর 'সিম্ফনি'। অপেক্ষাকৃত বড় একটা কৌটার মধ্যে মুড়ির সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ-সংগীত চামচের দ্রুত-ছন্দিত ঘূর্ণনে মুখর। অনেকের মনেই 'নেবো-কি-নেবো-না'-র দ্বন্দ্ব। তেলের পবিত্রতা, ঝালের প্রকৃতি আর পেঁয়াজের গন্ধ দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলবে। মহিলাদের চোখ চক্-চক্ করে উঠবে, অভিভাবকরা তখন বাইরে জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হবেন। এই মুগ্ধতা সহজে কাটতে চাইবে না, কারণ সদ্য সদ্যই ছেলে-মেয়েদের জন্যে অনেকটাই পকেট হাল্কা হয়ে গেছে! অনেকেই একেবারে ভিতের তলায় উঠে আসা কামরাটা কে গলা টিপে আবার ভিতরে পাঠাবেন। অনেকে, যারা একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে অভ্যস্ত, দু'টি ঠোঙা চেয়ে বসবেন। 'অনেক ঝামেলা গেল, এখন একটু কাজ খারাপ লাগবে না'—বলে 'স্ত্রি কনসাল্টেন্সি সার্ভিস' দেবেন স্বামীকে! বেচারি তখন চারপাশের দৃষ্টি-অবস্থানের কথা ভেবে 'কত দাম?' বলে পকেট থেকে সদ্য-অপুষ্টি-আক্রান্ত মানিব্যাগটি বার করবেন।

কিন্তু যাঁরা ঘি-দুধে অভ্যস্ত, যাঁরা তেলের বিরোধী, তাঁরা সময় পেলেই মোটা সোটা বড়-সড় 'টিফিন-কারিয়ার' ঈগল-ক্লাস, নয় স্টিলের বা কাগজের প্লেট বার করে বসে পড়েন। এঁদের সঙ্গে চাটনি বা আচার জাতীয় একটা অনুপান অবশ্যই থাকবে। চারদিক গন্ধে ম' ম' করে উঠবে হৃষ্ট-চিত্তে পুষ্ট-দেহে ঢেউ তুলে এঁরা ত্রিভুবন বিস্মৃত হয়ে উদরের তৃপ্তিতে মনঃসংযোগ করবেন। একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান কেমন অনায়াসে ক্ষুদ্রতম স্থানের পরিধিতে সমাপন করা যায় তা এঁদের সুডৌল চাতের আর সুপরিসর আসন-পিঁড়ি-বসা-কোলের টেবিলে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

পাশাপাশি চলবে একেবারে মডার্ন ব্যবস্থা। ট্রেনের নিজস্ব ক্যাটারিং আছে। পরিশীলিত, সুটেড্-বুটেড্ মাস্টারাও আছেন। গত-সপ্তাহে ধোলাই করা ইউনিফর্ম পরিহিত কেটারিং-এর বেয়ারারা। ব্যবস্থা আছে সব কিছুরই কিন্তু দেখাশোনার ব্যাপারটাই উবে গেছে দেশীয় ভ্রমানায়! ডিউটিতে হয়তো এই সাভারেরা আসেন টেরি বাগিয়ে টেরিলিন হাঁকিয়ে, কিন্তু নিয়ম 'ইউনিফর্মের'। তাই বাক্স, ড্রয়ার বা বাগ-থেকে বার করে গায়ে চড়িয়ে এঁরা খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কেউ বলার নেই, কেউ বলতে ভরসা পান না। মাস্টারদের বলায় কিছুই এসে যায় না, কারণ আজ যিনি বলবেন, কাল তিনি দেখবেন না যে! এ-যেমন বিসমাটির একদিক, এর অন্যদিকে আছে আকাশ ছোঁয়া দামে মাটি-ছোঁয়া খাবারের লেনদেন। চলছে চলবে! আপনি তো মাত্র একদিন বা একবেলা দিচ্ছেন-খাচ্ছেন-চলে যাচ্ছেন। যথেচ্ছ ব্যবহার করার আর যাচ্ছেতাই খাবার দেবার জন্যে ওদের ট্রেন-গর্ভে অনন্ত-অফুরন্ত খদ্দেরের প্রবাহ আছে। একই লোককে দুদিন ঠকাতে হবে না ওদের। প্রত্যেকেই ওদের কাছে একবার ঠকতে গেলে মুগ্ধ পার হয়ে যাবে যে! ট্রেনে ক্যাটারিং আর স্টেশনের বাইরের ফেরিওলা-উগ্রিওলা-কুলিদের একই নীতিতে রমরমা ব্যাপার : একই জনকে দুবার ঠকাবো না, কিন্তু প্রত্যেককেই একবার করে ঠকাবো মাত্র! এই নীতিতে পুরুষান্তর ধরে আমাদের ব্যবসা চলবে। আর আপনি, যাত্রী? রূপোলী রাঙতায় মোড়া 'সার্টিফাইকেটেড' খাবারের পাকেটটিতে একই দামে দ্বিবিধ তৃপ্তি পেলেন : জঠরের ক্ষুধার প্রশমন আর ব্যক্তিত্ব-জাহিরের প্রকাশন। মন্দ কি?

আর ঐ কামরা-প্রান্তের দরজা-উপান্তে অপেক্ষমাণ 'গরম-চা' আর 'কাফি'-র কথা না বললে তো এই ট্রেন-পুরাণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওরা অবশ্যই আমাদের বর্ণিত তৃতীয়-বর্গের যাত্রী-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীয়। কিন্তু এরা উপস্থিতিতে যেমন সর্বতোম পরিবেশনেও তেমনি সামান্য, সার্বিক। পয়সা ভাঙে

ওপরে দেখে নিয়ে একটু হিসেব করে নিয়ে ট্রেনের ভিখারীও যেমন তৃপ্তাই বোধ করে তেমনি 'সিলভার-কোর্ট-প্যাকেট', ফেলে দিয়ে টাই টাকে ঠিক-ঠাক করে সাহেবসুবোও তেমন হাঁফ পড়েন। একটি জেনেরা-টিনের মধ্যে উনুনের ব্যবস্থা, তার উপরে চাউস সাইজের একটি কেটলি, কেটলির মুখে রাজতার এক খিলি পানের মতো পরম-নিরোধক ছিপি। সবার উপরে দু'পাশ থেকে উর্ধ্বাবাহু হয়ে দুটি হাতলের একত্র মিলন। এটিই হল গর্ম-চা-এর চলন-বলন। এটিকে এক হাতে ঝুলিয়ে কাঁধে বাগ আর সেই বাগের গর্ভে সুসজ্জিত থরে-থরে সাজানো নাইব ডাঁড় অথবা পোর্সিলিনের কাপ-ডিস। ঝাকড়াচুল, রক্তিম-চোখ হাসে-নিন্দিত কণ্ঠে চলবে আপ-ডাউন হাঁক 'চা-আ-আ, গর্ম চা-আ'। যাত্রীদের চলাচলেরও যেখানে পথ নেই, আপনি যেখানে শতবার 'প্লীজ' 'প্লীজ' বলে দৈবিক প্রয়োজনে সামনে বা পিছনে যেতে বাধ্য, সেখানে দেখবেন ওদের চলাচল কেমন অনায়াস! আমরা সকলেই সরে গিয়ে, নানান 'এ্যাক্রোবেটিকস' করে ওদের জন্যে পথ করে দিয়ে থাকি। ওরা যে রেলের খাস তালুকের প্রজা সে আপনি 'টি টি' এলেই বুঝে যাবেন। কথা বলে-বলে আর না-বলে-বলে ওদের ডোকাল আর সাব-ডোকাল কর্ডে মচে পড়ে যায়, শুকিয়ে যায়। এ টি টি দের কথা বলছি। শেষে দেখি ওরা টিকিট পরীক্ষার চাইতে টিকিট-হীনদের জন্যে সর্বক্ষণই তো হন্যে হয়ে থাকেন। কামরার উপান্ত-কোণে এলেই ওঁদের কণ্ঠ-শুষ্কতা নিঃশেষে ঘুচে যায়। ক্ষণকাল বিশ্রাম এর সঙ্গে 'গর্ম চা' বা 'কাফি' ওদের সঞ্জীবিত করে দেয়। 'কাফি'র ব্যাপার একেবারে চা-এর মতোই। তফাত দুটি ক্ষেত্রে। এক, এদের বাগে ডাঁড় থাকে না, থাকে কাগজের বা প্লাষ্টিকের 'কাপ' আর দুই, এদের পর্গা ফুট-গড় মিষ্টারে মাপা যায় না—জল গরম হতেই থাকে, তার আর দু'ফুট তিন ফুট কি হবে? চা'এর ক্ষেত্রে তাই ইংলণ্ডীয় ফুট-গড় চালু রসিকতা। কারন ইঁর চা-ই কেটলিতে থাকে। গরম হয় আর গরম হয়, ফোটান হয় আর গরম রাখা হয়। আর একটা মজার ব্যাপার এদের পর্গার মূল্য নির্ধারন প্রক্রিয়া। নিত্যযাত্রীদের জন্যে এদের হোলসেল রেট আছে, নৈমিত্তিকদের জন্যে থাকে 'রিটেল'। এ-বিষয়ে ওদের সিদ্ধান্তই 'ফাইনাল'। সপ্তাহে পাঁচদিন-ছ'দিন যাতায়াত করেন যাঁরা তাঁদের এরা অবশ্যই চিনে ফেলে, আর তাছাড়া ওদের যেমন দলবদ্ধ-জীবন, হার্ড-ইনার্টিংই আছে ঠিক তেমনিই ওরা নিত্যযাত্রীদের মধ্যেও এক ধরনের গ্রুপ-লাইফ দেখে থাকে। সেয়ানে সেয়ানে মনে মনে মিল-মিল ভাব অঙ্কুরিত হতেই পারে! দু'পক্ষই অকারণ ঝামেলায় জড়াতে চায় না। সহাবস্থানের রেল-সংস্করণ আর কি!

যাঁদের কথা এতক্ষণ বলছিলাম তাঁরা অবশ্যই সাধারণ যাত্রী। এঁরা রিজার্ভ-সিট কামরাগুলোতে যাতায়াত করেন। বিশ-পঞ্চাশজন অবশ্যই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরত্বকে অতিক্রম করেন। সময় কাটানোর জন্যে দিনের খবরের কাগজ, সপ্তাহের ম্যাগাজিন, গল্পের-উপন্যাসের পেজ-মার্ক করা কেতাব। এ-ছাড়া আর একটিই মাত্র বিষয় খোলা থাকে সময় কাটানোর জন্যে। প্রকৃতি। ট্রেনের বাইরে সদা পরিবর্তনশীল ল্যাণ্ডস্কেপ। অনেকেই তন্ময় হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সেই সবুজের হাতছানিতে, চাষাভুষোদের ক্রিয়াকলাপ দেখে দেখে আর পালিক, বক, গাং-চিলেদের জীবন-বৃত্তান্ত উপভোগ করতে থাকেন। এ-ছাড়া কিছু-কিছু যাত্রী অফিসের অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতি, সহকর্মীদের ছোট মনের ক্ষুদ্রতার পরিচয়বাহী ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ট বৃত্ত রচনা করে সময়কে 'পি-এন-পি-সি' বা পরনিন্দা পরচর্চায় কাজে লাগান। 'কুইক ফিক্সের' আঠার মতো নিজেরা বিষয়ে এঁটে থাকেন এবং সময় সময় দু'চারজন অমুকদা তমুকদাকেও সঙ্গে, পাশে জড়িয়ে ধরেন।

সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় অবশ্যই সেই নিরবধি পরিস্থিতি। রাজনীতির আলোচনায় সকল নাগরিকই এক একজন বিশেষজ্ঞ—একপক্ষে। তাই বহুবারের মর্মক্রিয়া নয়, একেবারে গুরুতর প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এই আলোচনা। যেমন প্রাণবন্ত হয় রাজনীতির আলোচনা, তেমনি কাঠামোটের ক্রম উন্নতির অফুরন্ত অবকাশ থাকে এই সময়-অতিবাহী ব্যবস্থায়। নিষ্ঠার অভাব ঘটে না, একাগ্রতায় ঘাটতি দেখা যায় না, অনটন পড়ে না তথ্যের উদ্ঘাটনে আর তত্ত্বের উদ্গিরণে। আর বহু-জন একই সঙ্গে অংশগ্রহণ ক'রে একটি বিষয়-মাত্রকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশ-একশো মাইল অবলীলায় পার করে দেওয়া যায়। সকলেই যে কণ্ঠ মিলিয়ে যোগ দেবেন তা নয়, নির্বাক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও অনেক হয়ে দাঁড়ায়। সময় কাটানো থেকে শুরু করে সময়কে হত্যা পর্যন্ত অনায়াস সাফল্যে চলতে থাকে। এবং আর একটা সুবিধাও আছে। ট্রেনজার্নিটুকুর শেষে যে পথ এবং যে সময়টুকু পড়ে থাকে গন্তব্যে পৌঁছতে এবং অথবা ফিরতি পথের দীর্ঘ সময় এই রাজনৈতিক আলোচনার শবব্যবচ্ছেদ করে আবার সময় কাটানোর সুযোগ হাতে এসে যায়। যাঁরা তখন অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু বলতে বলতে পারতেন অনেক কিছুই, সেই নির্বাক অংশগ্রহণকারীরা এই পরবর্তী পর্যায়ের শবব্যবচ্ছেদে অংশ নিতেই পারেন। নিয়েই থাকেন। ঘর্ঘর যান্ত্রিক শকট-শব্দের লৌহ-কঠিন পরিবেশে, গরমের আর ভিড়ের মধ্যে নিত্য যাত্রার মিনিট-ঘণ্টাগুলো ছোটখাটো আরও অনেক বিষয়-ব্যাপার-ঘটনার আবর্তে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে দিনান্ত থেকে সপ্তাহান্তে, মাসান্ত থেকে বৎসরান্তে। অনেকে একদিন বন্দী হয়ে রেহাই পান, অনেকে অবসর নিয়ে মুক্তি পান। কিন্তু মধ্যকার এই জীবন আবহমান বলে মনে হয়। লয়-ক্ষয় নেই, পর্ব-পরিবর্তন নেই, সমানে চলমান, ধাবমান, প্রবহমান। জীবন এবং ট্রেন, সময় এবং বিষয়। সব, সবই।

দূরের ট্রেনের যাত্রী বলতে এতক্ষণ একটা বৃহৎ অংশকে নিয়ে আমরা মশগুল ছিলাম। কিন্তু আছেন আরো দু'ধরনের যাত্রী। এক, যাঁরা একই দূরত্ব অতিক্রম করে রেলকে অধিকতর সম্পন্ন করে তুলেছেন সেই সব অত্যন্ত মূল্যবান প্রথম শ্রেণীর বা চেয়ার-কারের যাত্রীরা আছেন, আর, দুই, আছেন সেই সব অতিথি-অভ্যাগত-রবাহূত যাত্রীরা যারা নিজেদের ভিড়ে নিজেরাই পিষ্ট হয়ে ঐ দূরত্বটুকু অতিক্রম করেন শরীরের মেদ-মাংস-হাড়-মজ্জার অনেকখানি দক্ষিণা দিয়ে। প্রথম দল বাহিতে আবাহন পান, প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার সুপরিসর বন্দোবস্ত আছে। এঁরা আসন-বসন-এর দলে। আপন ঘরের বৈঠকখানাটি অথবা বেডরুমটির অনেকাংশই যেন এঁদের জন্যে ট্রেনের অভ্যন্তরে আগে থেকেই সুবিন্যস্ত করা থাকে। আবাহনে আর আপ্যায়নে এঁরা হৃষ্ট-বক্ষ তুষ্ট-চিত্ত হয়ে যাত্রা করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ের যন্ত্রণা মাথার মধ্যে বয়ে বেড়ান তাই শরীর-মনটুকু পয়সার মূল্যে ক্রয় করেন। অনেকে অনায়াস জীবনে অভ্যস্ত বলে ট্রেনের মধ্যে বিপর্যস্ত হতে চান না। অনেকে একান্ত করে নৈকট্য লাভের আশায় এই দীর্ঘপথকে কাজে লাগান। এঁদের যাত্রাপথকে সুন্দর আর সাবলীল করার জন্যে ট্রেনের ব্যবস্থাপনায় প্রচেষ্টার অভাব নেই। খিদমতগারেরা আছেন, সজাগ দৃষ্টি কালো কোট পরিহিত কেতা-দুরস্ত অফিসাররা আছেন আর সবার উপরে আছে এঁদের নিজ নিজ অভিমান, অহং, আর ব্যক্তিত্ব।

এবারে চলুন ওদের দেখি। ঐ দেখুন যারা চোখে মুখে দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার মেঘ জমা করে প্লাটফর্মে বাক্স-পেঁটরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। কামরায় যতজনের স্থান আছে, যাত্রী

সংখ্যা সবসময়ই তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ। কামরার মধ্যে এরা যখন সকলেই ঢুকে পড়বে তখন আর এদের যাত্রী বলে, মানুষ বলে চেনা যাবে না। কলকাতায় সি.এস.পি.সি-এ আছে—পশুক্লেশ নিবারণ সংস্থা। ট্রেনে নেই, বাসে নেই, অন্য কোথায়ও নেই। মালগাড়িতে কয়টা গরু বা মহিষ নেওয়া যাবে, একটা বুকিতে কতোগুলো মুরগী বহন করা বৈধ তার পরিমাপ আছে, আছে নিয়ম-কানুন। এদের বেলায় এ সবের বালাই নেই। ধর্মমতে এরা টিকিটের পয়সা দেবে, কিন্তু বিধিমতে এদের স্থানসংকুলানের দায় নেই রেল অর্থরিটির। তাই এই সব অবশিষ্ট যাত্রীরা মানুষের দলে নয়, যাত্রী বলে স্বীকৃত নয়, প্রাণীর অধিকারও এরা পায় না। এরা কি বস্তু? ভুতুড় ট্রেনের ব্যবস্থায় এরা ট্রেনের কামরায় লাদাই হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে বাধ্য। এরা তাই নিজেদের মধ্যে ছোট খাট সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঝগড়া করে, দলিত-মথিত হয়ে তাণ্ডব বাধায়, একটুখানি স্থানের অধিকার নিয়ে তুমুলকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। বিচ্ছিন্ন ভাবে এরা কেউই তত ছোট নয় যত ছোট এরা নিজেদের প্রমাণিত করে, এতো স্বাধপর নয় যতটা এরা অবস্থার চাপে পড়ে হয়ে পড়ে। সমস্যা এদের তাৎক্ষণিক তাই সমাধানের জন্যে চিন্তা ভাবনার অবকাশ থাকে না, শরীরের তেজ আর পয়সার দাপটে এরা তাই তীব্র-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কার কাছে দাঁড়াবে বিচারের আশায়? কোথায় যাবে প্রতিকারের আবেদন নিয়ে? জীবন যুদ্ধে বিধ্বস্ত এই সব যাত্রীরা ট্রেনের মধ্যে স্থানের সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়, বিরুদ্ধ মানসিকতার তীব্র জ্বালায় এরা তাই জান্তব কামড় কামড়িকেই তাৎক্ষণিক সমাধান সুস্থ বলে স্থির করে ফেলে।

কিন্তু যখন ট্রেন গতি পায়, দূরত্ব ক্রমশই কমে আসতে থাকে আর স্থানের সংস্থান আর অধিকারের মাত্রা ঐ-একরকম-করে কাজ চলা গোছের করে নিয়ে যায় তখন এই কামরাতেই সামাজিক চাওয়া বইতে থাকে। আত্মীয়তার নৈকট্যে এরা একে অপরের অত্যন্ত কাছে চলে আসে। একে অপরের নিত্যদিনের খোঁজ খবর নেয়, সুখের আর দুঃখের ভাগ বাঁটোয়ারা করে পরস্পরের সামিল হয়ে ওঠে। ঠিক এই মানসিকতাটাও অনুপস্থিত অন্য দুই বগের যাত্রীদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে অধনা গোষ্ঠীর সীমায় তারা প্রত্যেকেই সীমা টেনে রাখে, বৃত্তের বাইরে মানবিক সংযোগের পথ তাদের কাছে কখনই খুলে যায় না। যদি কখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে যায়ও তাহলেও তা সমাজ-অফিস-শিক্ষার মাত্রায় বাঁধা থাকে। দলা-অদলা এই সব সুতোগুলোর বাঁধন খুলে এরা কখনই মনখোলা দক্ষিণে হাওয়ার আনাগোনা ঘটাতে পারে না। কিন্তু এই অবশিষ্ট-যাত্রীদের এ-ধরনের কোনও ঈগো সমস্যা নেই। এদের সঙ্কুচন ক্ষেত্র বৃহৎ পরিসরে মুক্তি পায় না বটে কিন্তু সংসার, সমাজ, পরিবার-পরিজন ছেলে-মেয়ের ওঠ-অওঠের বৃত্তে অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিক গতি পায়। প্রথম পর্বের যুদ্ধ-সংগ্রাম, ঝগড়া-বিবাদ কোনও দীর্ঘছায়া ফেলতে পারে না এদের দরজা-জানালা খোলা প্রকৃত জীবনে। সর্বংসহা, সকল কালিমা শোষণক্ষম এই সব অবশিষ্টের দল যাত্রী হিসেবেও যেমন, নিজ নিজ সমাজ-পরিবেশেও তেমনি সহজেই সহজ হতে পারে। কোনও প্রতিযোগিতার 'স্যাটুলার সিক্রিশন' এদের তাড়া করে না, কোনও বৃহৎ প্রাপ্তির অন্বেষণে এরা প্রতিনিয়তই অস্থির হয়ে পড়ে না। অত্যন্ত কোনও বাসনা এদের মনের গভীরে সদাসর্বদা পীড়ন করে ফেরে না বলেই এরা ছোট-ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সরল-স্বাভাবিক থাকতে পারে। এদের জীবনের হতাশা-নিরাশা ব্যথা-বিপর্যয়গুলোকে এরা শরতের মেঘের মতো ক্ষণস্থায়ী করে নিতে পারে। এই মানসিকতাই এদের দীর্ঘ-জীর্ণ জীবনে ফিউজের কাজ করে। গ্লানি আছে, হাস রেখে

যায় না, কেননা আছে, মুমড়িয়ে পড়ে না, বৃদ্ধ আছে, ভেঙে পড়ে না। এদের প্রাণের উৎস পুস্তকে-কেতাবে নয়, অফিসের পদাধিকারে নয়, ব্যাঙ্কে ব্যালান্সের পুষ্ট অংকে নয়। চলমান জীবন থেকেই এরা প্রাণের উৎসটি খুঁজে নেয়, সংগ্রহ করে। তাই এরা অবশিষ্ট যাত্রী হয়েও শিষ্ট আচরণ করতে পারে, সংগ্রাম শেষ হলে গ্রামের সকলের খোঁজ খবর নিতে পারে এবং সংঘর্ষ শেষ হলেই সহর্ষ আলাপ-আলোচনায় একে-অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

ফাঁদ ঃ

যখন প্রথম জানলাম এই বিশ্বে এখানে-সেখানে সর্বত্রই প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে, তখন একটু আশ্বস্ত হলাম। যাক বাঁচা গেল! ফাঁদ যখন আছে তখন সেই ফাঁদে জড়ানোর সুযোগও হয়তো একদিন আসবে। অবধারিতই আসবে। নিজে থেকে প্রেম? সে আমার জন্যে নয়। দেহে-মনে যে সব ফুল-শরের সম্ভার প্রেমের পথযাত্রীদের জন্যে আবশ্যিক তার কোনওটাই আমার দখলে ছিল না। এমন কি কোনও দিদিমাও ছিল না যে মিথ্যে করেও একটা 'রাঙা-বৌ' এনে দেবার স্বপ্ন আমার মনে গিঁথে দেবে!

তাই খুব ছোট বেলা থেকেই আমার পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে যে আমার কপালে টুকটুকে রাঙা বৌ দূরের কথা কোনও কালো পেত্নীও জুটবে না। আর প্রেম? নৈব নৈব চ। যেমন দেখতে তেমনি শুনতে, স্বভাবে চরিত্রে একটা লাজুকহীন বাঁদর বলেই নিজের 'আইডেন্টিটি' বানাতে বেশ নাম-প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছিল। লক লক করে সর্পিল বেড়ে উঠা শরীর, কোটরে বসা দুটি চোখ যেন কেবলমাত্র দেখার যন্ত্র, হেলেহীন চুলের জঙ্গলে চিরুনির অব্যবহার, খাড়ি-ওঠা গ্রামা-ত্বক আর সদাসর্বদা মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ফিরে যে দেহ-সৌষ্ঠবটির আমি মালিক, সেই ছোটবেলা থেকেই, তাতে ঠাকুমা-দিদিমা থাকলেও তাদের কল্পনার লাগামটি খুলে যেতো না। আমার এক ঠাকুরদাকে আমার দেখা হয় নি। তিনি কেমন ছিলেন তা জানাও হয় নি। তবে এটা জেনেছিলাম যে ঠাকুমা-দিদিমার কল্পকথা ছাড়াই তার এক রাঙা টুকটুকে বৌ জুটেছিল। কারন সেই বৌ যখন বৃদ্ধ হয়ে আমাদের ঠাকুমা তখনও তার নাম ছিল রাঙা ঠাকুমা।

আর আমার উপর এই রাঙা ঠাকুমারই রাগ ছিল সব চাইতে বেশি। বামুনের ঘরে চাঁড়াল। তিনিই বলতেন। অন্য কাউকে বলতে শুনিনি। মনে মনে অন্য কেউ সে রকম ভাবতেন কিনা তা জানি না। তবে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝে গেছিলাম যে আমার জন্যে মতো ফাঁদই পাতা থাক না কেন প্রেমের ফাঁদ কোথায়ও ওত পেতে থাকার নয়।

ফাঁদে পড়তে পারি আর নাই পারি প্রত্যেক প্রাণীর মতো যোগাতাটা তো প্রকৃতির নিয়মেই তৈরি হবার কথা। বাল্য এবং কৈশোর থাকলে প্রৌঢ়ত্বে যাবার তো যৌবন ছাড়া আর কোনও পথ নেই, স্টেশন নেই। কিন্তু সেই স্টেশনে পৌঁছানোটা অনিবার্য হলেই যে গ্রহণযোগ্য, প্রাপ্তিযোগ্য গন্তব্য ট্রেনটি পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা তো আর প্রকৃতি দেবে না। আমি যদিও বা ছট-ফট করতে পারি, পারি একটি ফাঁদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্যে আঁকু পাঁকু করতে। কিন্তু ফাঁদ পাব কোথায়? এক-আধবার যে ফাঁদের দেখা পাইনি তা ঠিক নয়। দেখেওছি যেমন তেমনি মনে মনে সেই ফাঁদে পা দেবার জন্যে উঁচি উঁচি মনটাও এগিয়েছে। কিন্তু সেই যে বলে না অভাগা যেখানে যায় সাগর

শুকিয়ে যায়। দূর থেকে আমাকে দেখলে ওপরের বনে ধরা পড়ি, সবুজে সবুজ। কিন্তু যেই কাছে আসা অমনি আমার ধূসর চিৎকার করে ওঠে। আর যারা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাঁদের মনাকাঙ্ক্ষাই পেয়েছিল তারা ভূত দেখে ঝাঁঝাঁকে উঠে ফাঁদ শুদ্ধ লোপাট হয়ে যায়। এই পলায়ন তাদের দোষে নয়, আমার ভয়েই।

তবে আর একটু বলে নিতেই হয়। ছোট বেলা থেকেই ভালবাসাকে 'হৃদয় তপের তাপে ভরা ফানুস' বলে জেনে এসেছি। আমার কর্কশতার শিক্ষা শুরু হয়েছে বাড়ি থেকে। মাস্টিক না দিলে ছেলেরা বড় হয় না। এই নীতিতে আমরা স্বভাবতই সমবয়সীদের থেকে শরৎ-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের জগতে পেছনে পড়ে থাকতাম। ওদের চোখের ভাষা আর মুখের কথা আমাদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হত। কেমন যেন বোবা বোবা। প্রাণের জমিতে সাহিত্যের খোঁজা-খুঁচি হয় নি একেবারেই। তাই প্রেমের শিকড় ছড়ে নি মোটেই। বোধশক্তি নিরেট হয়ে জড়ত্ব পাবার উপক্রম। সমবয়সীরা বাঁশ দেখলে সন্তানা বাঁশরির জন্য বৃত্তান্ত এবং সেই বাঁশি হতে অভিসার ভাবনায় ভাসিত হয়। আর আমরা সেই বাঁশেই নৌকোর গুণ আর ঠাণ্ডারের লাঠি দেখতে পাই। ওদের বাগানে পাখি গান গায় আমাদের জঙ্গলে সাপের বাসা। একেই বোধহয় বলে মেরু তফাত, সমুদ্র-প্রভেদ। ওরা 'বই' পেলে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আমরা লুকিয়ে পড়ি, পালিয়ে যাই। তখন বুঝতে পারিনি যে সব বইই এক বই নয়। বই-এর ভুবনেও যে প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে তা বুঝেছি সময় পার করে দিয়ে। যে বই মনকে টানে সে সব বই আমাদের পাতে পড়ে নি, যে সব বই চোখের জলকে নাকের করে প্রবাহিত করে সে সব বই না-চাইতেও সামনে এসেছে।

অথচ ব্যাপারটা এমতো হবার কথা নয়। ক্ষিদে আছে বলেই তো পৃথিবীতে খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, অন্ধকার আছে তাই আলো অনিবার্য হয়েছে। চাহিদার সঙ্গে যোগানের, আকাশের সঙ্গে বাতাসের আর মাটির সঙ্গে জলের স্বাভাবিক সংযোগ সত্য হয়েছে। তাহলে এমন কেন হল যে প্রাণের মধ্যে তাপ আছে কিন্তু শীতল করার মতো বারির সেচন হল না? অন্তরে আগ্রহের আভাস আছে কিন্তু তৃপ্ত হবার মতো প্রাপ্তি নেই!

হল না তার দ্বিতীয় কারণ বোধহয় গুরুপ্রাপ্তি। এই গুরু-পাঞ্চির কথা অনেকও বোধহয় বলেছি। সকলেরই গুরু জোটে। আকাশ গুরু, বাতাস গুরু এবং সিনেমার নায়কও আমার গুরু। সেই গুরুকুলের প্রথম গুরু যিনি জুটেছিলেন তিনি বেরসিকের শিরোমণি। রসিক ভুটি দেখলেই তার ভেতরে শার্লক হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তো। চারধার অন্ধকার করে সেই ধোঁয়া বুদ্ধির মোড়ায় পৌঁছে যেতো বোধহয়। আমাদের গুরু-মশাই 'হাইপথেসিস' করতেন, হোমসের মতো 'ডিডাকশনও' করতেন এবং আমরা তার 'ওয়াটসন' হয়ে তাকে অনুসরণ করতাম। এর ফলে যারা আলোর ফাঁদে শ্যামা' হয়ে হনো হয়ে উঠতো সেই সব ফাঁদে পড়া প্রাণীদের জ্বাল থেকে উদ্ধারের জন্যে আমরা আমাদের ভেতরের 'শয়মা'-কে নির্বাসন দিয়ে বসে ছিলাম। তখন থেকেই কেমন মনে হত যেন প্রেম ব্যাপারটাই একটা বিপরীত মেরুর 'বুবি ট্রাপ'। পা দিলেই গেছ, একেবারেই ট্রাপড্ হয়ে যাবে।

তা বললে কি হবে? রোদ যখন ওঠে তাপ তখন অনুভূত হয়ই। মন যখন জমি থেকে ভূমিতে ডুব দিতে চায়, তার তখন ভরা-ভর ভাব হয়, অপরের আয়নায় নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। তখন তো আর গড়-মড় বোধ থাকে না। তেমন তেমন অবস্থায় তো শুনেছি সাপের জেদ ধরেও

সেরাল উপকূলে চায়, মৃত শবদেহ আঁকড়ে ধরে নদী পার হতে চায়। মন টেরও পায় না! তার মানেই তো নেশা।

আর এই নেশার একটা ওরু আছে একটা মধ্যগগন আছে এবং আছে একটা শীর্ষ। এই শীর্ষেই বোধি লাভ হয়, মুক্ত পুরুষের অনুভব আসে। ওরুতে যে জটিল-জবজব-গতা ভাবটি মনকে পাতলা পাতলা করে দেয় তখন যদি ঘুঁশিয়ার না হওয়া যায় তাহলে আর হয়েই না। বাইরে থেকে মাকে ফাঁদ বলে মনে হয় সেই ফাঁদই তখন আপন-ঘর হয়ে যায়, আর বাইরেটাই পর-দেশ। এটাও মনে হয় সেই 'এপার-ওপারের' চিরায়ত দীর্ঘশ্বাস।

প্রথম বার 'পাতলা-পাতলা' বোধ টের পেতেই সেই যে পা তুলে সরে পড়েছিলাম সেই থেকে ছায়া দেখলেই ভূত দেখি। আসলে আমিই সরে-ছিটকে এসেছিলাম না কাছে থেকে আমাকে দেখে সেই 'ফাঁদ' আমার রাঙা ঠাকুমা হয়ে গেছিল তা কে জানে! আমার চোখে 'প্যারালাক্স' দৃষ্টি ছিল এমনও তো হতে পারে। মাকে সরে সরে যেতে দেখেছিলাম সেই হয়তো স্থির ছিল আর স্থির-প্রাজ্ঞ আমিই হয়তো চলনশীল ছিলাম। যাই ঘটে থাকুক না কেন মোট ফলাফল ছিল শূন্য।

তবে একথাও ঠিক যে ভূত যেমন প্রতিটি পাতার আড়ালে, ঝোপের পেছনে আর প্রত্যেকটি পরিত্যক্ত ঘনকালো বাড়ির একাকিত্বে ওত পেতে বসে থাকে না, তেমনি প্রেমের ফাঁদও পাতা নেই প্রতিটি পথের মোড়ে, রকের ফাঁকিতে আর স্কুল-কলেজের ক্যানটিনে। তবুও সে আছে। আছে সর্বত্রই। আছে আগে-পিছে, ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে, স্কুল-কলেজের করিডোরে আর লাইব্রেরিতে। উর্ণনাভ পরনির্ভরশীল নয়। সে ভাল বোনে আপন খেয়ালে, মন্ত্র-তন্ত্র, নিজের দেহ-নিঃসৃত মসলিন-সূক্ষ্ম সুতোয়। মানুষের জন্যে ভালের সুতোটির সন্ধান পাওয়া ভার। তবে চোখের চাহনিতে, ভ্রূ-এর ভঙ্গিমায়, চলনের ছন্দে আর বাহুর দোলনে প্রকৃতি যেমন সহজেই পুরুষকে বশ করে অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধতে পারে, তেমনিই পুরুষের আছে অসীম ধৈর্য, অনন্ত অপেক্ষা আর অফুরন্ত সময়। একজন যেমন নমনীয় সুতোয় অন্যের জন্যে ফাঁদটি পেতে চলে, অন্যজন তেমনি পৌরুষের দৃঢ়তায় খাঁচাটি তৈরি করে তোলে। কম নয় কেউই। তবে ঐশ্বরিক বরপ্রাপ্তিতে প্রকৃতিই কুশলী, অঘটন ঘটন পটীয়সী। চোখের একটি মাত্র কটাক্ষে পুরুষের কটি-ভঙ্গ হতে পারে, ভ্রূ-যুগলের একটি মাত্র বঙ্কিম মটকানিতে মট্ করে শিরদাঁড়া ভেঙে যেতে পারে যে কোনও পুরুষের। এ-ক্ষমতা প্রকৃতি ঠাকরুন পুরুষকে দেন নি, দিয়েছেন তাঁর অন্দরমহলের আপন আত্মজাকেই।

স্কুল-কলেজের পথে ঐ দেখুন সকাল-বিকেল অবস্থান-সাধনায় কতো ছেলে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে বসে আছে। ছাত্রীরা কলকাকলি-উচ্ছল চলেছে সেই পথে, ফিরেও আসবে সেই পথে। পথের ধারে, পথের বাঁকে-বাঁকে এই সব অবস্থান সব সময়ে চোখের দৃষ্টির প্রসাদে অথবা মুখের অস্ফুট ভাষায় অভিসিঞ্চিত হয় না, হচ্ছে না। তবুও। তবুও অপেক্ষার একাগ্রতা কি একটুও কমে? ফাঁদে পড়বে বলে এই আকৃতি, এতো করুণ অপেক্ষা, অথচ সেই ফাঁদের দেখা নেই! হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন এদের একজোড়া দল-মধ্যে আর নেই, কখন যেন দু'জনে দু'জনের মধ্যে এক হতে হারিয়ে গেছে। অবাক হবেন না। এই নিরুদ্দেশের পথে যাত্রায় থানা-পুলিশের কিছুই করণীয় নেই, জানতে পারলে অভিভাবকদের অন্তর্জ্বালা আছে। বাড়ি থেকে দলবদ্ধ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় গমন শুধু ধোঁকা, অনাসক্তকেই বোকা বানানোর মন্ত্র। পথিমধ্যে দলভাঙা দলের অজানা নয়। কিন্তু সমর্থনের কর্তৃধারাটি নোতুন দ্বি-ত্ব দল গঠনে প্রবহমান। দুটি একটি চকোলেট-চুইংগামের

খরচে সহজ করে নেওয়া, কখনও বা রেস্টুরেন্টের খবরে ক্রমিক সান্নিধ্যের সুযোগ পাওয়া।

যারা কুল কলেজের পথ পায় না তারা? পাড়ার মোড়ে লাইটপোস্টের ভাঙা বাতির তলায়, পড়া শিব মন্দিরের দালানে আর গঙ্গার অপ্রচলিত ঘাটে এসের ফাঁদ পড়ার প্রশস্ত ব্যবস্থা। সিনেমা হলের জনবহুল একাকিত্বে, দাঁড়ানো স্টেশনের ভিড়ে-ভিড়াক্কার প্লাটফর্মের নির্জনতায় অথবা পাড়ার মুদিখানায় চা-পাতা চিনি অথবা দেশলাই কেনার সুযোগে এরা আপন-আপন ফাঁদকে নিজের নিজের বেড়ি বানাতে উর্ননাভের নিশ্চয়তায় ধীরগতি এগিয়ে চলে।

গানে শুনেছিলাম যে কোনও এক বগা ফাঁদে পড়ে অসম্ভব কাঁদছে। ছোটবেলায় বগাকে চিনি নি। এই ফাঁদটাই বা কি, কিসের তৈরি তাও পরিষ্কার ছিল না। তবে বগার কান্না শুনে, কান্নার কষ্টের কথা ভেবে অশেষ দুঃখ হত। আহারে! বেচারি বগা কতো অসহায়। মনে হত একটা সরলমতি প্রাণ কুটিল চক্রব্যূহের অভাবের অনন্ত দুঃখে কেঁদে চলেছে। অনেক পরে বুঝেছি যে এই বগা আমরা প্রত্যেকেই। ফাঁদটি দিল্লির লাড্ডু। আর আমরা যে ফাঁদে পড়ে কাঁদি সেটা ফাঁদের জন্যে নয়, মাইকা পড়েছি বলেও নয়। আমরা কাঁদি তার কারণ কাঁদাটাই একমাত্র 'নীট্' পাওনা বলে। প্রেমের আগুন যেমন জ্বলে না জ্বালায়, প্রেমের ফাঁদ-ও তেমনি কাঁদে না কাঁদায়।

আরও পরে, অনেক ভেবেচিন্তে, এখন বুঝেছি যে আসলে এই ফাঁদটা কোনও বাইরের বস্তু নয়, একটা ভেতরের ব্যাপার। জীবনের আয়নায় এই ফাঁদ-টা আসলে আমাদের ভেতরটারই প্রতিবিম্ব। সময় হলে ফাঁদটাকে আমরা তৈরি করি, বাইরে ছুঁড়ে দিই আর তার মধ্যে পা-গলিয়ে দিয়ে প্রথমে শিহরন, পরে নিজেত অনুশোচনায় জড়িয়ে পড়ি। অনেকটা সেই সরীসৃপটির মতো যে নিজের লাজটিকে পরের মনে করে মনের আনন্দে খেতে শুরু করে! আমরাও প্রেম-বৃত্তে ঢুকে পড়ে নিজেদের তৈরি ফাঁদে নিজেদের মাথাটিকে অবলীলায় গলিয়ে দিই। তার পরে আমার অহংকে প্রক্ষিপ্ত-অস্থির দিয়ে চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে থাকি ঘুসই প্রেম-বৃত্তের বৃত্তে। আমাদের খাদ্য নিজের লাজটি নয়, সময়। যৌবনে প্রেমের ফাঁদে পড়ে সময়ের চর্বণ যখন শেষ হয় তখন হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করি যে সময় শেষ হয়ে গেছে, বার্ধক্য শুরু হয়ে গেছে। আর সেই নিঃশেষিত সময়ের গর্ভে জন্ম নেয় আমাদের অনুশোচনা। অনেকাংশে এই অনুশোচনারা আমাদের নিজেদের মতোই দেখতে হয়, চিনতে পারি আত্মজ বলে। রাগ করবেন না। এই হল বগার ইতিহাস, ইতিহাস যা 'রিপিট্স ইটসেলফ'। বগা যে কাঁদে—ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দেরে—সে অনেক কষ্টেই কাঁদে, অনেক দেখেশুনেই কাঁদে।

আবার, ফাঁদে পড়লেও যেমন কাঁদি, না পড়তে পারলেও তো কাঁদি। এটাই তো অদৃষ্টের পরিহাস। দিল্লির লাড্ডু। যাদের 'আমি'-টির কাছে প্রেমের ফাঁদ বেয়ে একজন 'তুমি'-র আবির্ভাব হল না তারা নিজেদের অক্ষম-অক্ষাত হা-হুতোশ্মির পর্যায়ে ফেলে হাহুতাশ করে। তারা কষ্ট পায় এই ভেবে যে তাদের হৃদয় তন্ত্রীর গানের পসরা ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ জীবনে-জীবন যোগ করাই হল না। তারা তাই জানতেই পারল না যে জীবনে জীবন যোগের ব্যাপারই নয়, বিয়োগের বিষয়। এই জীবনটা একটা নিজের ব্যাপার, সম্পূর্ণ নিজের মধ্যেই সে ছিল-আছে-এবং-থাকে। যেই আর একজনের সঙ্গে 'যুক্ত' হল অমনি কিয়দংশে 'বিযুক্তই' হল। এই বিয়োগ যা তাম করে না নিয়ে দুই-এ মিলে এক হবে কি করে? তবেই দেখুন একটি অহং যার না খেয়ে অন্য অহং তৃপ্ত হয় না।

জীবনে জীবন যোগ করতে তাই বিয়োগ অনিবার্য। আর তখনই তো বগার ক্রন্দন রোল গানের মন্ত্রণায় ভাষা পায় ভাটিয়ালি সুরে, মেঠো পথে আর অনুশোচনার বিশাল প্রান্তরে।

তাই যদি বয়স কম হয় তাহলে সামনে দেখুন, যদি ওপারের দিকেই এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে পিছনের দিকে তাকান। দেখবেন ধাপে ধাপে যত ফাঁদ দেখা যাচ্ছে তার সবগুলোই কেন রমণীর বেষ্টনে মোড়া তিক্ত বড়ি! তরুণ বয়সে ফাঁদে পা দিয়েছেন তো মা-বাবার কানমলা, গৃহ-বন্দি চোখের জলের ধারা। অথবা কুড়িতেই বুড়ি, যদি ফাঁক ভাঙে 'খোলা' দিয়ে ফেলতে পারেন বয়ের উপকণ্ঠে অথবা কলকাতার কোনও অচিন-কোণে। যদি যৌবনে স্বখাত-ফাঁদ-সলিলে নিমজ্জিত 'হয়েন' তাহলে একদিকে 'কান-খোলকর-ওন-লেও' এর হংকার অন্যদিকে 'মায় কৈ বাচ্চি নেহি হুঁ'-র ঘাড়-শক্ত উচ্চারণে মাঝখানে আপনি উলুখড়ের কৈবল্য পেয়ে যাবেন। স্বতন্ত্র জীবন যাপনের নৈকট্যে প্রথম প্রথম পাখিতে পাখিতে কোকিলের কুহু, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন, নদীর স্রোতে স্রোতে জলের কলতান শুনতে পারেন। কিন্তু অচিরেই জেনে যাবেন যে রাশন একটি সংগ্রহের বিষয় এবং তাতে পয়সা লাগে, শয়নে বিছানা লাগে, প্রেমের জন্যে খাদ্য অনাবশ্যক হয়ে যায় না। ফাঁদটি ক্রমশই ফাঁস হয়ে চেপে বসতে চাইবে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমিক-প্রেমিকা স্বতন্ত্রভাবেই এই ফাঁসির দড়িটি হয়ে দেখা দেয়, অনেক ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যারাই মাথাই। অন্যে-পরে আর কি কথা? সে তো সব সামাজিক দায়, পারিবারিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত কর্তব্যাকর্তব্য সমূহ আছেই। বোঝার উপর শাকের আঁটি না শাকের আঁটির সঙ্গে সংসারের বোঝা সে বোঝা বুঝতে গভীর জ্ঞানের দরকার হবে না!

আর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যদি ইচ্ছা হয় সেই ফাঁদের কোমলতা পরীক্ষা করে দেখতে? অনেকেরই তো হয়ে থাকে। তাহলে? এই তাহলের উত্তর বড় সহজ নয়। ততদিনে জীবনের রোদে-জলে রুক্ষ-দেহ, শুষ্ক মন প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে। প্রাণের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার পশ্চিম গগনে হেলে পড়ে। জীবন তখন যৌবনের অঙ্কে আর জুড়ানোর আকাঙ্ক্ষা রাখে না, হিসেবের পক্ষে আকৃষ্ট হয়। তরা ডুবি বাঁচাতে তাই মদিও বা কোনও কোমল-অঞ্চল-অন্বেষণ-স্পৃহা উঁকি ঝুঁকি দেয়, তবুও তা শক্তির অভাবে, চাঞ্চল্যের অবসানে ঘুঁড়িয়ে ঘুঁড়িয়ে বেতো রুগীর মতো কামক্লেশে অবশিষ্ট রক্তার তাগিদে সন্তর্পণ হয়ে ওঠে। সেই অঙ্কের হিসেবে ঘড়ায় তোলা অবশিষ্ট প্রাণবারিটুকু মেপে মেপে খরচ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়ার রহস্য-রোমাঞ্চটাই মার খেয়ে যায়। তখন আর কানের ভয় নেই বাট, বদ্ধ ঘরে দিনযাপনের ক্লেশও অনুপস্থিত, নেই গৃহ-বহিষ্কারের সম্ভাবনা, নেই অর্থ-সম্পদের অভাবের ভয়। কিন্তু এই সব নেই-নেই এর মধ্যে জীবন-বোধের স্বাদ-টাও যে কখন কোন ফাঁকে নেই হয়ে গেছে তা 'টাকে' হাত বুলোতে বুলোতে, অথবা পাকা চুল দু'চার গাছির উৎপাটনের মধ্যে বুঝে ওঠা ভার হয়ে পড়ে।

শুধু কি তাই? অদূরে দাঁড়ানো যিঃ বৃদ্ধ তখন তার ফোকলা দাঁতের আড়ালে আসন্ন হাসছে, এদিকে সহযাত্রীরা ভবিষ্যতের সন্তান পালনের ভয় দেখাচ্ছে, বলছে 'কবে তাদের বড় করবি, মানুষ করবি?' সত্যিই তো প্রৌঢ়ত্বে ফাঁদে পা দিলে 'বগা' কান্নার আগেই তো তার সন্তানের কাছে সে 'দাদু' হয়ে যাবে। নিজের সন্তান যখন 'পিতাকে' খুঁজতে এসে 'দাদু'-কে দেখবে তখন? প্রৌঢ়ত্বে ফাঁদটা আর প্রেমের থাকে না দড়ির হয়ে যায়। ফুলের সৌন্দর্যও পাওয়া গেল না, সৌরভটি রইল ধরা ছোঁয়ার বাইরে, শুধু যেন কাঁটাগুলোই আসল হয়ে মজির হল। সব পাখিগুলোই যেন কাকের

কণ্ঠে ডাক দিয়ে যায়। মৌমাছিদের নিয়েই সত্য তখন তাদের হয়েই।

জীবনের জলস্রোত যখন সচল থাকে তখনই নদীপাড়ের বালি-বিছানাটি স্বচ্ছতা দেয় সেই বহমানতাকে। সুপেয় করে। জীবন নদীটি যখন শুকিয়ে যায়? বালির বিছানাটি তখন গ্রীষ্মের খরতাপে প্রেমের 'হট-বেড' হয়ে বুকে-পিঠে জ্বালা ধরায়। তাই ফাঁদের কুহক যত মধুরই মনে হোক না কেন সময় পার করে দিয়ে সময়কে ধরতে যেও না। সরস যন্ত্রণা, কানমলা, শৃঙ্খলিত হওয়া, তবুও সওয়া যায়, যৌবনের চিত্তিত্তার ধিক্কার তবুও সহনীয়। উপায়ন্তে পৌঁছোনোর আগেই তাই সময়ে চলা বিধেয়। ফাঁদ-কে এড়িয়ে চলতে গিয়েই প্রকৃত ফাঁদে পা দিয়ে ফেলা সহজ। প্রেমের ফাঁদে ট্রাজেডি আছে। তার থেকে বড় ট্রাজেডি হল সেই ট্রাজেডিকে এড়িয়ে যাবার ট্রাজেডি। প্রথমটা সর্বজনীন বলেই সাহিত্যের, এবং সুতরাং জীবনের নিজস্ব সম্পদ, দ্বিতীয়টা ব্যক্তিনির্ভর বলেই বাস্তবের, এবং সুতরাং সংসারের একাকিত্বে ট্রাজিক।

আমাদের স্লোগান - সময় থাকতে ফাঁদে পা দাও।

ঘরের টান আর মনের ডাক :

সকাল বেলায় চায়ের ট্রে সাজিয়ে মেয়ে আসে আমার বেড রুমে। মৃদু কণ্ঠে ডাক দেয় 'বাবা, উঠে পড়।' এই ভোর বেলাটায় আমি জেগেও থাকি ঘুমিয়েও থাকি—অনেকটা যেন একটা 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এ পদচারণা। পদচারণা? না, চেতনের আনাগোনা? রাতের নিদ্রাদেবী তাঁর অধিকার নিঃশর্ত ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক আবার দিনের আলো জানালাপথে প্রবেশ করে স্বাধিকার ঘোষণায় নাছোড়বান্দা! এই দোটানা উভালয়ের সন্ধিকালটা একটা মন মাতানো নেশা নেশা অনুভবে যেন একান্ত আপন। একজনকে ছেড়ে দিতে মনে বাধা লাগে অন্যজনকে আবাহন না করলে চেতনায় উষ্ণতার ছোঁয়া পাই না! তাই নড়ে চড়ে উঠতেই হয়, জড়ীকে জড়ের টিকা পরিয়ে অবসন্ন শরীরকে দিনমানের যোগ্য করে তুলতে আড়মোড়া ভেঙে কন্যার ডাকে সাড়া দিতে হয়।

পাশ থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে কন্যার অনেক কনক কথা শুনি। রোজই। মেয়ে আমার অনেক ভোরে ওঠে। ওর দৃষ্টিতে পূর্ব দিগন্তের অরুণ কিরণ, গবাক্ষ পথে নয় দিক্-পথে স্পর্শ বোলাতে সুযোগ পায়। তাই বোধহয় উভালয়ে ওর মনটা থাকে সরল। সরল আর গভীর। বলল, 'জান বাপি, আমি ভীষণ 'হোমসিক'! আগে বুঝিনি। এখন এই দূরে গিয়ে বুঝেছি।' মেয়েটি আমার অনেক দূরের একটা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা। সপ্তাহান্তে ঘরে ফেরে। আমার কাছে আসে। বাড়ি ওকে টানে, ডাকে। উষ্ণ চায়ের তৃপ্তির সঙ্গে যেন একটা উষ্ণমনের অনুভব মিশে গেল। বললাম, 'তা তো হবেই। বাড়ি বা গৃহ তো সকলকেই টানে। এটাই তো গৃহ-টান, হোমসিকনেস। স্বাভাবিক।'

দক্ষিণের জানালাপথে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মনে হল যেন স্মরণের পাখায় ভর দিয়ে অনেক দূর পাড়ি দিচ্ছে। বোধহয় যেন কিছু একটা খুঁজছে। বাইরের বৃষ্টি-স্নাত সবুজ পাতাগুলো তাদের রাতভোর জলপানের তৃপ্তিটুকু চিকন শ্যামলিমায় সর্বাঙ্গে মেখে আছে। মৃদুমন্দ বাতাসের হিল্লোল আর শিওরবির চিক চিক আনন্দ সেই সবুজকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। আমার দৃষ্টি সেই বর্তমানে। কিন্তু মেয়ের চোখে বোধহয় প্রকৃতির নয়, নিজের অতীতগ্রাম সবুজের পরে পরাবে

ঘুরে ঘুরে ফিরছিল। বলল, 'আগে তো কখনও এমন গৃহ-টান বোধ করিনি! যদি এই ঘরের ডাকটি স্বাভাবিক হত তাহলে তা এতদিন শুনি নি কেন? এখন যেমন ডাকটা পরিষ্কার শুনতে পাই, যেমন তীব্র করে অনুভব করি, যেমন আঁকু পাঁকু করে নাড়া দেয় তেমনটি তো কৈ আগে ঘটে নি?'

পট থেকে এবারে নিজের হাতেই দ্বিতীয় কাপ ঢেলে নিলাম। এ কাজটি আমার মেয়ের এক্তিয়ারে পড়ে। আজ কিন্তু সে নিজের অতলে হারিয়ে গেছে তাই তার দৃষ্টি পটের স্পাউট থেকে স্বর্ণবর্ণ প্রবাহের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও দেখাটা নিশ্চিতভাবেই অন্তরের অনুভবের প্রবাহের দিকে নিমগ্ন ছিল। বললাম, 'স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা সকলেই বলেন। অতি ব্যবহারে যেমন বস্তুর আকার ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, অতি ব্যবহারে তেমনি বোধহয় কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও মার খেয়ে যায়। দার্শনিক কান্ট তো এই স্থান-কালকে অনিবার্য চশমা বলেই মত প্রকাশ করেছেন। তুমি তা জান। পাত্রকে জানতে গেলে তার জানাটাকেই আগে জানতে হয়। আর আমাদের সকলের, এবং প্রত্যেকের, সেই জানাটা স্থান-কালের প্রকৃতি প্রোথিত কনটাকট লেনস মারফৎ-ই তো হয়ে থাকে।'

'একেবারে সাদামাঠা কথাকেও তুমি কেমন অবলীলায় কঠিন-দুর্জ্ঞেয় করে ফেলতে পার তার নমুনা আমার খলিতে অতর্নিহিত অজস্র!' সকালের চায়ের তরল-উষ্ণ আসরকে দর্শনের দোরগোড়ায় টেনে নিতে দেখে মেয়ে যেন একটু রাগই প্রকাশ করে বসল। বলল, 'কঠিন কথাকে সোজা করে বলার জন্যে হয়ত প্রতিভা লাগে, কিন্তু একটা সহজ কথাকে সহজ করে বলতে কি লাগে? খুব জোর একটু সহজ উপলব্ধির সরল ভাষা! সে কি তোমার ঝুড়িতে একেবারেই বাড়ন্ত?'

বিপাকে পড়লে আত্মসমর্পণ সহজতম বিধি বলে মানা। আর যদি প্রতিপক্ষ নিজের কন্যা হয় তবে কাল বিলম্ব মহাভারত সৃষ্টি করতে পারে! তাই দু'টি নীতিকেই একসঙ্গে প্রয়োগ করে বলে উঠলাম, 'নিজের ঝুড়িতে এত কথা আছে যে যোগানের আধিক্যে তারা নিজেরাই নিজেদের ভিড়ে মার খাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের বাজার দর বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী হতে পারি কৈ? সে সব কথা বলতে বিশেষ ভরসা পাই না, পাছে লোকে শুনেই ফস্ করে বলে বসে লোকটা কিছুই জানে না! তাই কথার মাঝে মাঝে যতি চিহ্নের মত, দেশের নয়, বিদেশের গণ্য-মান্যদের হাজির করে দিতে পারলে বক্তব্যের মাত্রা যেমন বাড়ে ওজনটাও তেমনি ভারি হয়ে ওঠে।'

মেয়ে বলল, 'তা, এই সাতসকালে বক্তব্যের মাত্রা আর ওজন নিয়ে না ভেবে একটু সহজ-সত্য নিয়েই না হয় ভাবলে। কথাটা ছিল গৃহ-টানের, হোমসিকনেস্ নিয়ে। তাই সেই ঘরের ঘরোয়া কথাটাকে গ্রীক-জার্মান ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার ঘোল না খাইয়ে নিজের কথায় একেবারে নিজের মত করেই বল না!'

ইংরেজি অনুভবটা নিয়ে তাহলে মাথা ঘামাব না। কারণ যারা হোম ছেড়ে নেটিভদের দেশে নানা কারণে এসেছে, আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের সেই দিনও নেই সেই অনুভবটাও তাই নেই। থেকে গেল ঐ প্রকাশটা, হোম সিকনেস্ শব্দ-প্রকরণটা। এখন এই নতুন দিনের নবাগতদের এই প্রকাশটাই, আমাদের প্রবাসী ভারতীয়রা ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা ঘরোয়া মনে গৃহ-টান বোধ করেন আর পার্টিতে মিটিং-এ হোম সিকনেস্ প্রকাশ করেন। দেশ ছাড়লেই দেশের টান বাড়ে, দেশ ছাড়া হলেও বাড়ে। আমরা অনেকেই তো একসময়ে দেশ ছাড়া হয়ে ঝরা পাতা জীবনের ভুক্তভোগী

খেয়ে খেয়ে কালক্রমে মাধ্যাকর্ষণের মত ঠাঁই পেয়েছি, সেই ঠাঁইতেই ঘর বানিয়ে গৃহ-সুখ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু হয়ে কি হবে, এই গৃহ দীর্ঘদিনই তো সেই গৃহের টানটি তৈরি করতে পারে নি?

'এই গৃহ আর সেই গৃহ ব্যাপারটাটা তো বেশ বুঝতে পারলাম না! তোমরা যারা বাস্তুহারা হয়ে এই দেশে এসেছিলে তারা সকলেই একটা গৃহ ছেড়ে অন্য একটা গৃহের অংশ হয়েছ। তাতে কি হল? টানের হেরফের কি করে হয়?'

এই বিখণ্ড হয়ে গিয়েই আমাদের হয়েছে জ্বালা। সেই জ্বালা সময়ের পর্দা পড়ে পড়ে অনেকটাই আবছা অনুভবে চলে এসেছে বটে কিন্তু একেবারেই নেই এ কথা বলা যায় না। গৃহের টানটা তাই আমাদের দিনে একরকম আর রাতে অন্যরকম করে বুঝেছি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তোমাদের বেলায় দিনরাত্রি একাকার হয়ে গেছে। তোমরা তো একই গৃহে জন্ম থেকে থেকে গেলে। তাই তোমরা গৃহের বাইরে গেলে গৃহকে দিনের চেতনে আর রাতের অবচেতনে সমানভাবেই খুঁজে বেড়াও, খুঁজে পাও। একটা টানেই তোমাদের মন টন টন করে। আর আমাদের বেলায়?

'তোমাদের বেলায় তফাতটা কোথায়? বাড়ি থেকে বাইরে গেলে তোমাদের বেলাতেও তো সেই গৃহটান দিনের চেতনায় আর রাতের অবচেতনায় টান ধরায়। তাহলে?'

'এই তাহলের উত্তর আছে আমাদের সর্বচেতনায়, অস্তিত্বের পরতে পরতে। আমরা যখন এই গৃহে থাকি তখন আমরা ফেলে আসা গৃহের ডাক শুনি, টান অনুভব করি। মন আনচান করে। রাত্রে নিজেদের অগোচরে, নিজেরই মনের টানে আমরা চলে যাই সেই টানে সাড়া দিতে। ফেলে আসা গৃহের প্রাঙ্গণে। সেই জন্ম-জঙ্গল, সেই মাঠ-ঘাট, সেই পথ-প্রান্তর, স্কুল-বাজার, হাট-হাসপাতাল—সেই সব, সবই আমাদের ডেকে নিয়ে গেছে, কাছে পেয়ে উদ্ভাস আনন্দে মেতে উঠেছে। প্রতি রাত্রের এই গৃহ-অভিযানের কোনও ব্যতিক্রম ছিল না, দীর্ঘদিনই—দীর্ঘরাত্রিই—আমাদের গৃহের ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে। জেগে উঠে বিরস মুখে বর্তমানের তিক্ত স্বাদ বোধ করেছি। মনে হয়েছে বর্তমানটাই স্বপ্ন, অসত্য। আর প্রত্যয়ে স্থির হতে চেয়েছি স্বপ্নটাই সত্য, স্বপ্নটাই বাস্তব। তবেই বোঝ গৃহের টান আর ঘরের ডাক আমাদের কতটা উতলা করেছে।'

'এ রকম তো আমাদেরও হয়। আমরা যখন বাড়ির বাইরে পাহাড়ের দেশে বা সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে যাই এবং বেশ কিছুদিন গৃহ ছাড়া থাকি তখন আমাদের এই সব ঘর-গেরস্থালী, লোকজন, রাস্তাঘাট, বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝেই রাতের স্বপ্নে আর দিনের অনুভব ভাবনায় দেখা দেয়। তফাতটা সঠিক বুঝলাম না তো!'

'তফাতটা তো এই এখানেই। আমরা আর তোমরা যখন একই সঙ্গে বাইরে যাই, যাই সেই একই পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে তখন কিন্তু তোমাদের গৃহ টানের উৎস থাকে একটি মাত্র ফেলে আসা গৃহের আঙিনে সীমাবদ্ধ, আর আমাদের বেলায় সেই উৎস থাকে দুইটি বা আরও বেশি। তোমরা যে ঘরের ডাক শোন তার মধ্যে ভেসে আসে প্রবাসীকে কাছে টানার সুর। আমাদের কাছে সেই ডাকটি বিচ্ছিন্নতার, চিরবিচ্ছেদের বেদনা হয়ে জারি হয়ে ওঠে কারণ ফেলে উঠেই আমরা আজও বোধ করি ফেলেআসার গৃহ-কোলাহলকে ছেড়ে। সে যে আর আমাদের নেই যেমন আছে তোমাদের বেলায় দৈবের গৃহকাদের ডাক। সেই একই গৃহের ডাক আমাদেরও আছে, কিন্তু তা

শৈশবের নয়। আর এটা তোমাকে মানতেই হবে যে সে-স্মৃতি শৈশবের অনাবিল আনন্দের স্পর্শে জীবন্ত নয় তা তেমন করে নাড়া দেয় না, দিতে পারে না। বাসাবাড়িটা আর তরুণ বেলাটা যা-কিছুকেই স্পর্শ করে, যেখানে যেখানে মনের ছোঁয়াটি রেখে রেখে যায় সেই সব কিছুই হয়ে ওঠে সজীব, সরস, প্রাণবন্ত। তাই সেই স্মৃতি সুখস্মৃতি। সেই স্বপ্ন সুখস্বপ্ন। তোমাদের সুখস্বপ্ন আছে, আমাদের হারিয়ে গেছে। তোমরা তোমাদের 'ইয়ারো রি-ভিজিট' করতে পার, আমাদের 'ইয়ারো' যে হারিয়েই গেল!'

'কিন্তু তোমাদের তো আর একটা 'ইয়ারো' আছে, আর একটা গৃহ। এই বর্তমানের ঘরগৃহস্থালী সেও তো বহুস্মৃতি বিজড়িত! এবং সেই গৃহ তোমাদের বেলাতেও যা আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। তাহলে আর সেই ফেলে আসা সুদূর, মৃতপ্রায় অতীতের গৃহকোণের প্রয়োজনই বা কি! একই বর্তমানের টানে আমরা তো একইভাবে পীড়নকে বা আনন্দকে অনুভব করতে পারি—বিরহের পীড়ন আর মিলনের আনন্দ! মনের গভীরে আর একটা গৃহের টানকে অন্তরের অঞ্জলিবদ্ধ সুরক্ষায় সদাসর্বদা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে একটা আবেগের অকারণ পোষণ ঘটছে বলে মনে হয় না কি? একটু যেন 'ম্যাসোকিস্টিক'? বেদনার আরোপ নিজের অন্তরে আত্মতৃপ্তির, এক ধরনের আনন্দ বোধের অনুভব জাগায়, সেই বেদনা বিধুর আনন্দই যেন তোমরা পান করতে চাও! অপরাধ নিও না, আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, জানার আকাঙ্ক্ষায় প্রশ্ন মাত্র!'

'নিজেকে আহত করে যে আনন্দ বোধ, যাকে ঐ 'ম্যাসোকিজম' বলা হয়, আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দেখতে অনেকটা সেমন হলেও কিন্তু আসলে তা নয়। তা যে নয় তা বুঝতে গেলে একটা সংবেদনশীল মনের দরকার। আর সেই রকম একটা মন, তুমি জান কি না জানি না, এই প্রজন্মের সন্তানদের বেলায় স্বাভাবিক গড়ে ওঠে না, অনেক যত্নে এবং কষ্টে তৈরি করতে হয়, করে নিতে হয়। এখনকার ছেলে মেয়েদের দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, অবস্থার বিবরণ দেওয়াটাই অভিপ্রায়। জীবন একটা সংগ্রামের নাম। তোমাদেরই কথা। সেই সংগ্রাম অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। থাকবে ভবিষ্যতেও কিন্তু সেই সংগ্রামের বাতাবরণ, চরিত্র, উদ্দেশ্য এবং ঠিকানা যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। আর তাই উর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা, অকারণ হানাহানি, অকরুণ আত্মমেধযজ্ঞ, কঠোর কঠিন পরপীড়ন এবং অহেতুক অর্থ-স্বার্থ-সম্পদের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়াটাই যেন বর্তমানের নাগপাশ হয়ে উঠেছে। আমাদের শৈশবটা ছিল একটা সুদীর্ঘ লীলাভূমি, জীবনের পুষ্টি সংগ্রহের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র। শৈশব তারুণ্যের মনোভূমি থেকে আমরা সারাজীবন রসদ সংগ্রহ করে চলার মত অফুরন্ত যোগান উৎসটি খুঁজে পাই। আর সেই আমরাই বোধহয় তোমাদের শৈশব বলতে বিশেষ কিছু আর বাকি রাখি না, তরুণ সময়টাকে সবুজের স্পর্শ আর শ্যামলের ছোঁয়ার চাইতে সম্ভাব্য একটা কাল্পনিক ভবিষ্যতের দড়িদড়ায় বেঁধে-স্বার্থ সমৃদ্ধির সাফল্য স্বার্থের কপিকলে, ঘুরোয় করে, লটকে দিই!'

মেয়ে বলে, 'তোমাদের শৈশবের সঙ্গে আমাদের শৈশবের তুলনা তোমরা হয়ত অনেকটাই করতে পার। আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কিন্তু গৃহের টানটা তো আমরা আমাদের মত করেই অনুভব করি। করতে বাধ্য। সেই টানটাই তো এখন এই প্রায় মধ্য জীবনে এসে অত্যন্ত তীব্র বলেই মনে হয়। আগেও এই অনুভবটা হয়েছে। যখন প্রায় মাসখানেক পাহাড়ে চড়া শিখতে বাড়ির বাইরে ছিলাম তখন যেন দিনের বহু সময়ে, একান্ত সময়ে, আর রাতের প্রায় সবটা সময়েই, স্বপ্নের

মাথা, বাড়ির ডাকটা মনের অতল থেকে সমতলে যোরাফেরা করত, উঠানামা করত। তাতেই তো আমরা বিকল বোধ করেছি। আমরা বন্ধুরা সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতাও করেছি। ডাকটা আমরা সকলেই কমবেশি শুনেছি, এখনও শুনি। কিন্তু কে ডাকে তা তেমন করে ভেবে দেখিনি।'

বলি, 'আমার মনে হয় সেই ডাকটা আসে স্মরণের সায়র থেকে। স্থির অচঞ্চল অতীত আমাদের অস্থির চঞ্চল শৈশবের, তারুণ্যের সজীব শত শত ছোঁয়া গায়ে মেখে কারো উপেক্ষিতাদের মত বাস্তু-বাস্তব জীবনের উপেক্ষিত হয়ে করুণ নয়নে আমাদের ধেয়ে চলা ঊর্ধ্বশ্বাস বর্তমানের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। আমাদের নজর দেবার ফুরসত হয় না। কর্মব্যস্ত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সংসারের সন্তান সন্ততিরা যখন উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যের টানে ছুটোছুটি করে তখন সেই সংসারেরই একান্ত নির্জনে অর্ধ-নিমিলিত-দৃষ্টি স্নেহশ্বরা মায়ের মতই সেই স্মৃতির সায়রটি আমাদের জীবনের মূল দৌড়ঝাঁপের পাশটিতে বোধহয় শান্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকে। তাই বোধহয় চলমান সংগ্রাম মুখর নিত্যদিনের ঝকমারি থেকে এতটুকু সময় পেলেই আমরা ফিরে তাকাই সেই শান্ত সায়রের অনাবিল অতীতে। টানটা আসে সেখান থেকেই, সেই অপেক্ষমাণ অতীত স্মরণ জননীই আমাদের ডাকে, ডাক দেয়। স্নেহের নিটোল স্পর্শটি সেই ডাকের মধ্যে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে, শিশু বয়সের ছোট ছোট আঙুলে মায়ের আঁচলের সন্তর্পণ টানটুকুর মত রিন রিন বেজে ওঠে সেই টান।'

'তাহলে কি ঘর বাড়ি নয়, গাছ-পালা, লতা গুল্ম, বাগ-বাগিচা, পথ-ঘাট নয়, কিন্তু এই সকলের স্মৃতি? মনের লেনদেনে, অন্তরের যোগাযোগে আর হৃদয়ের ছোঁয়ায় যে অনুভব সকল চারদিকের বাস্তু-বস্তুতে জড়িয়ে থাকে ছড়িয়ে থাকে তাই? সেই সব অনুভবই আমাদের টানে? ডাকে?'

'আমার তো মনে হয় তাই। বনবালা আজন্ম অরণ্যাশ্রমবাসী শকুন্তলার বিদায় ক্ষণটি মনে কর না কেন? পৃথিবীর কতভাগ সঠিক জানি না, আমাদের দেশের আশি ভাগ গ্রাম-সবুজের পরিবেশে বেড়ে ওঠা শকুন্তলারা প্রকৃতির অভাবে অভুক্ত নয়। যে কোনও বৃক্ষলতা যে কোনও প্রাণীই কিন্তু শকুন্তলার মনে অনুরূপ বিরহ বেদনার তীক্ষ্ণ করুণ সুরটি ধ্বনিত করত না। আশৈশব পরিচয়টিই আসল। পরিচয় প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রকৃতিকে সজীব করে তোলে, আবেগ বিধুর নৈকট্য দেয়, অন্তরের ছোঁয়াটুকু প্রতিটি কিশলয়ে, প্রতিটি লতাদেহে বৃক্ষকাণ্ডে পত্রপল্লবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়। হৃদয়ের সংবেদনশীল স্পর্শটিতে প্রতিটি গৃহ-প্রাঙ্গণ পথ ঘাট মাঠ প্রান্তর মনের বুনোট পেয়ে পেয়ে আপন হয়ে ওঠে। তাই তো সেই সব সমৃদ্ধ স্মরণরা সায়রের শান্ত প্রশস্ততা নিয়ে আমাদের টানে, টেনে ধরে, ডাক দেয়।'

'শৈশবের স্মৃতিতে দুঃখের কাঁটা থাকে না, তাই কি তারা এতো অনাবিল, এত মন কেমন করা মত আপন?'

'অনেকটাই তাই। পরবর্তী জীবনের সংগ্রাম সংগ্রহ প্রাপ্তির পরিসরে আমরা যা চাই তা শান্তি, একটু নিশ্চিন্ততা, একটু অবকাশের সুখ। সেখানেও গৃহ আমাদের টানে, ডাকে। শত-আনন্দ সহস্র দুঃখ নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত বাঁচি। সেই আনন্দ-বেদনার বুনোটই আমাদের বর্তমানগুলো আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন একাকী জীবনে ব্যক্তিকে, স্বতন্ত্র স্বনাম ব্যক্তিত্বকে, সত্য করে তোলে। গৃহের বাইরে

আমরা এক একজন লোক মাত্র, ইনডিভিডুয়াল মাত্র, হয়ত বা সংখ্যা মাত্রও। একমাত্র গৃহের অভ্যন্তরেই আমরা ব্যক্তি, আমরা মানুষ, পার্সন হয়ে উঠতে পারি। সকলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আমিটাকে আমরা খুঁজে পাই গৃহের বাতাবরণে—স্বামী হয়ে পুত্র হয়ে পিতা হয়ে, মা-দিদি-কন্যা হয়ে। এই পাওয়াটাই আমাদের টানে, ডাকে।'

'তাহলে কি আমরা নিজেকে খুঁজে পেতেই গৃহের উষ্ণতাকে অন্বেষণ করি? অতীতের স্মরণ-সাগরে অবগাহন করে স্নিগ্ধ শান্তি পেতেই আমাদের আনচান, আমাদের উদগ্রীব গৃহমুখী জীবন? তা যদি হয় তাহলে গৃহের বেদনা-যন্ত্রণা-বিবাদ-বিসম্বাদ মতদ্বৈধ-মতানৈক্য সব তুমি কি করে? সে সকলও তো কম বাস্তব নয়, কম সত্য নয়! এখানে একটা বিরোধ দেখা যাচ্ছে না?'

'প্রগাঢ় অন্ধকারের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে একটি মাত্র প্রদীপের ক্ষুদ্র আলোটুকু, শিখাটুকু অধিকতর সত্য হয় না কি? দিক-গ্রাসী অন্ধকার প্রসারে তীব্রতায় এবং অনুভবে সহস্রগুণ পরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও তো সে ঐ অতটুকু আলোর কাছে মার খেয়ে যায়, পরাভূত হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি প্রবাসী জীবনে, গৃহ থেকে দূরে সমগ্রের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া আমাদের অন্তর, আমাদের আত্মানুসন্ধান গৃহের আপন প্রদীপখানির ডাক শুনে প্রদীপ্ত হতে চায়, টান অনুভব করে সংখ্যার মিথ্যা থেকে ব্যক্তির সত্যে ফিরে আসার। পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা ভাই-বোন হতে মনটা ছট ফট করে ওঠে। পোষা মিনি, প্রিয় বাঘা, আর অন্যান্য প্রিয়-প্রিয়াদের প্রতীক্ষা হয়ে এই ডাকটা দূরদূরান্তে ছুটে যায়।'

'মানে হয় অনেকটা বুঝেছি। কিন্তু খটকা লাগছে অন্যত্র। বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, মাস পেরিয়ে বছর, বছরের পর বছর বিদেশ বিভুঁই-এ জীবন কাটায়, সন্ন্যাসীরা পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে, সমুদ্রের ধারে বা তরুমূলে যে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দেয় আর গৃহ ছাড়া বাউল-বৈরাগীরা যে ঘর ছেড়ে পথকেই সম্বল করে তাদের মনে কি স্মৃতির সাড়া, গৃহের নৈকট্য বা ব্যক্তিতে উত্তরণের কোনো ডাক আসে না? তারা কি শান্ত সুখের টান বোধ করে না? শৈশব স্মৃতি বিজড়িত পত্র-পল্লব লতাগুল্ম পথ ঘাট কি তাদের অন্তরের গভীরে ডাক দিয়ে যায় না? গৃহের টানটুকুকে বিশ্বের এপ্রান্তে ওপ্রান্তে ছড়িয়ে দেয় না?'

'প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তো সারাজীবন বহু কিছুর ডাক শোনে। ডাক আসে ক্ষেত্র থেকে—কর্মের ক্ষেত্র, কর্তব্যের ক্ষেত্র, জ্ঞানের ক্ষেত্র। তদ্ছাড়া আছে আপনজনের ডাক, মনের গভীর থেকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-আদর্শের ডাক। আছে মায়ের ডাক, জন্মভূমির ডাক এবং মাতৃ-পিতৃ-সত্যপুরুষের ডাক। অনেকের কাছে শিল্পের, সৃষ্টির আর ঈশ্বরের ডাক তাদের সারাটা জীবনকেই ধ্বনিময় বর্ণময় করে রাখে। আবার দেখ টানটা আসে প্রধানত বাসনা থেকে, আকাঙ্ক্ষার উৎস থেকে, কামনার গভীর থেকে। ডাকটা প্রধানত বাইরে থেকে আসে। টানটা আসে ভিতর থেকে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিটি থাকে মূল বিন্দু হয়ে। এই ডাকটা যত বড়, যত ব্যাপক আর যত তীব্র হয় ব্যক্তি ততই বিন্দু থেকে বৃহত্তর দিকে প্রসার পায়। ছোট ছোট ডাকগুলো বড় বড় ডাকের আড়ালে হারিয়ে যায়। টানের বেলাতেও এই একই কথা সত্য। গৃহের টান যত বড়ই হোক না কেন যে ব্যক্তির জীবনে আরও বড়, আরও তীব্র কোনও ডাক হাজির হয় সেই ব্যক্তি সেই বৃহৎ ডাকের হাতছানিতে জীবনের পথকে নির্ধারণ করে ফেলে। আমরা যারা শতসহস্র গৃহ-বলি-ভুক, জন্ম-মৃত্যু সারাৎসার,

আত্মিক-বাত্মিক-গতি জীবন যাপন করি তারা বড় কোনও ডাক যেমন শুনতে পাই না, তেমনি বৃহৎ কোনও টানের শক্তিকেও অন্তরের মধ্যে অনুভব করি না। তাই সন্তানের জীবনযাত্রা শুরু করে আমরা পরাজয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করি মাত্র। মায়ের আঁচল আমাদের শৈশবের টান, সংসারের নিত্যকর্মে আমাদের জীবনের ডাক আর শেষ জীবনে অহেতুক বেঁচে থাকা এক একটা অনির্বচনীয় জীবন-উপায়ে দাঁড়িয়ে আমরা অন্য একটা অবাঙমানসগোচর অস্তিত্বের ডাকের অপেক্ষা করে থাকি। সেই অপেক্ষা কতটা সার্থক হয় তা আমরা দেখে-বুঝে যেতে পারি না অর্থাৎ গৃহের বাইরেটা আমাদের তেমন করে কোনও ডাক দেয় না বলেই বোধহয় আমরা গৃহের মধ্যেই সেই ডাকটাকে খুঁজে মরি। নিম্ন আত্মা আমাদের টানে না বলেই বোধহয় খাওয়া-বাসনা-কামনার টানটাই সারাজীবন অনুভব করতে থাকি। এটাকি আমাদের ভবিতব্যলিপি না বিধিলিপি?'

তোমার কথায় একটা নৈরাশ্যের সুর যেন রিন রিন করে চলেছে। এটা কেন? সকলেই তো আর ভূমার অন্বেষী হতে পারে না? কোথায় যেন পড়েছিলাম যে দেশের বা বিশ্বের সকল লোকই যদি দার্শনিক বা কবি বা বিজ্ঞানী বা শিল্পী হয়ে যায় তাহলে পাকস্থলী তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। সিঁড়ির সব ধাপগুলোর পক্ষে কি শেষ ধাপ হওয়া সম্ভব? সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই তো সহস্রের অস্থিতে দুটোর জনের অমরতার বস্তু তৈরি হয়ে এসেছে। অস্থি দানের মধ্যেই তাদের সার্থকতা ঘটেছে। যে ধাপটি আছে মাটির একেবারে কাছে সেই ধাপের পর ধাপ নির্ভর করেই তো শেষ ধাপটির সমাপ্তি সম্ভবপর। শিল্প চেতনা বা দর্শনভাবনা যদি সহস্রের মনে স্পন্দন না তুলতে পারত তাহলে কোনও শিল্পী-দার্শনিক প্রাণী সম্ভব হত কি? সকলে অবশ্যই কবি হতে পারে না। কিন্তু কোনও কবিই কি কবি হতে পারত যদি সহস্রের মনে সেই কাব্য চেতনা আর রস বোধটি অনুভবের ঝংকারে তেমন সংক্রান্তাহী হয়ে না বাজত?'

'তোমার কথা মেনে নিতেই হয়। কিন্তু সহস্র তো আর লক্ষ বা কোটি নয়। আমার ইশারা ছিল সেই অবশিষ্ট লক্ষ-কোটির দিকে। বাংলা আকাদেমির প্রবেশদ্বারে লেখা আছে একটি প্রশ্ন—আজ আপনি কি বই পড়লেন? লেখা আছে সচেতন করার জন্যে, পরিসংখ্যান সংগ্রহের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণের জন্যে নয়। জীবন যদি কঠিন হয় সত্য তাহলে কঠিনতর।'

'তুমি কি বলতে চাও যে আমাদের মধ্যেই শত সহস্র আমরা আছি যারা অস্থি প্রদানেও অক্ষম? যারা কবি শিল্পীদের জন্যে প্রথম ধাপটি হতেও অনুপযুক্ত? অথবা, যারা বিজ্ঞান-দর্শনের পিরামিডের একটি পাথর খণ্ড হতেও প্রস্তুত নয়? অধিকাংশ সেই আমরা কি প্রবৃত্তির বাসনা কামনার, সংসারের হৈহল্লোড়ের আর সস্তা ইন্দ্রিয়সুখের তাড়নায় জীবনকে অনুভূমিক যাপন করি? অপরে যতদিন না আমাদের চোখে-মুখের মাছি তাড়ায় ততদিন কি আমরা আশৈশব নিজেরা নিজেরাই ইন্দ্রিয়ের মাছি তাড়াই?

'তোমার প্রশ্নের মধ্যে যে খোঁচা আছে আমি সেই রক্তক্ষরা কণ্টকের বিষয়ে কিছুই বলতে চাই না। তবে অনেকের জীবনেই সে সংবেদনশীলতার কিশলয় কদাচিৎ পাতা ছাড়ে না, গৃহের গভীরে যে স্মৃতিসাগররূপ আঁচলখানি অন্তরের ছোঁয়ায় প্রাণ পায়, প্রাণ পাবার কথা, তা যেন অঙ্কুরিত হবার অবকাশই পায় না। এটাই রূঢ় বাস্তব। এই জৈব চেতনার অনুবর্তিতা শতসহস্রের পার্থিব অস্তিত্বের কথাই বোধহয় তুমি বলতে চেয়েছ। এই বাস্তব জগতে এই বাস্তব জীবনও তো বাস্তব। তাই এদের নিয়ে খেদের তো কারণ দেখি না। যা নেই তা কেন নেই তা নিয়ে বেদনা বোধ করার

চাইতে যা আছে তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবার আনন্দ বোধ কি কম মূল্যের?'

'এতক্ষণে আশাবাদীর মত শোনাল। ঘরের ডাক আর অন্তরের টান। দুটোকেই সমান মূল্য দিয়ে বৃহতের প্রতি দৃষ্টি রাখলেই তো তাহলে মিটে যায়।'

'তা যায়। তবে সেই বৃহতের ডাক আর অন্তর প্রকৃতিতে সঞ্চিত প্রবাহিত সুললিত ধ্বনির টান যে যতটা শুনতে পায় সে ততটাই তার জীবনতরীতে ফসলের সম্ভার সাজিয়ে নিতে পারে। গৃহমুখ মানসিকতায় যার শুরু, যে ঊর্ধ্বমুখ, অদ্ভুত একটি ডাকে সাড়া দিতে পারলে তার সমাপ্তি সুন্দরের স্পর্শ পায়। সেই স্পর্শটাই নানা ভাবে ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী করে তোলে। ঐ ডাকটাই প্রথম সোপান, ঐ স্পর্শটাই উত্তরণের পাথেয়।'

আমার মেয়ে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে হাইচিতে বেরিয়ে গেল। আমি পূবের জানালা পথে দিনের তারুণ্য প্রত্যক্ষ করে উঠে পড়লাম। একটা ডাক যেন পরিষ্কার শুনতে পেলাম। আমার ট্রেবিল আমাকে ডাকছে।

হারানোর ভয়ঃ

সারাটা জীবনই তো আমরা ভয়ে ভয়ে কাটাই। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু হয় ভয়ের সাম্রাজ্য গঠন। দিনে দিনে, ধাপে ধাপে চলতে থাকে সেই সাম্রাজ্যের প্রসার আর বাড়তে থাকে প্রতিপত্তি। প্রথম প্রথম ভূতের ভয় দিয়ে যে শৈশবের শুরু হয় ক্রমশই সেখানে আগমন ঘটে সাপ-খোপের, ভূত-প্রেতের, দৈত্য-দানোর, রাক্ষস-খোক্কসের। জন্তু-জানোয়াররাও বাদ যায় না। বাঘ-সিংহ, হায়েনা-বেড়াল-বাঘাকুকুর, শিং-তোলা-ষাঁড় আর দাঁতাল-কুমির সেই ভয়ের সাম্রাজ্যের অধিবাসী হয়ে সদাসর্বদাই আমাদের তেড়ে আসার জন্যে ওত পেতে থাকে। আমরা যেমন মন্বন্তরে মরি না এবং মারি নিয়ে ঘর করি তেমনি এতো সব ভয়েও আমরা মরি না বরং এই সব ভয় নিয়েই ঘর করি, জীবন যাপন করি।

এই সব ভাবতে ভাবতে মনে একটা খটকা লেগে গেল। এতো সব ভয়ের মধ্যে কোনও ভয়ই কি নেই যা আমাদের জীবনে সারা জীবনই আঠার মতো লেগে থাকে? যে ভয় সামনে এসে শিং নাড়ে আর পেছন থেকে লাজের ঝাপটা মারে? এমন ভয় কি কেউ আছে যে নানা ভাবে আমাদের 'কাঁটা' করে তোলে? মনে মনে সেই প্রকৃত ভয়ের অন্বেষণ করতে করতে হঠাৎই যেন সত্যদর্শন ঘটে গেল—হারানোর ভয়?

কিছুক্ষণ থমকে যেতে হল। মনের মধ্যে একটা থমথমে ভাব যেন আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। নড়তে-চড়তে চায় না। বুঝলাম এইটিই 'তিনি'—সেই ভয়, যা কখনও সঙ্গ ছাড়ে না। ছোট বেলার ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। শত কাজে ব্যস্ত মায়ের আঁচলটি ছাড়তে চাই না, পাশে পাশে সারাদিন ঘুর ঘুর করি, ঘুমের মধ্যে তাঁর কাপড়ের খুঁটটুকু হাতের মুঠোয় পুরে নিশ্চিন্ত হই। কেন? হারাতে চাই না। মা-হারা হয়ে সর্বহারা হওয়াটাকে যেন তখনই বুঝে যাই। মাকে হারানোর ভয়ে মাঝরাতে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ চিৎকারে আকাশ ফাটাই। তাঁকে ক্ষণমাত্র খুঁজে না পেলে গৃহের বাতাসকে কান্নার চাবুক মেরে মেরে সচকিত করে তুলি। হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পেয়ে শান্ত হই। সেই কি তবে হারানোর ভয়-এর জন্মলগ্ন?

মাকে হারানোর ভয় থেকেই কি নিজেকে হারানোর ভয়? মাঠে-ময়দানে, হাট-বাজারে, মেলায়-উৎসবে, স্টেশনে-প্ল্যাটফর্মে বারে বারেই যে হারিয়ে যাবার ভয় ঝরে বারেই মনের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে যায় সে তো শুধু মাকে হারানোই নয়, সে তো নিজেকে হারানোরও ভয়! তারপরে স্কুলে যেতে বাড়িকে হারাতে হয়েছে, শহরে যেতে গ্রামকে, বিদেশ যেতে দেশকে হারাতে হয়েছে অনেককেই। একটু ভেবে দেখলেই ধরা পড়বে যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনটাই এক একটা হারানোর প্রসঙ্গ।

গৃহকোণের অনন্ত শান্তি আর অসীম নৈকট্য হারিয়ে আমরা সকলেই পাঠশালায় যাই। পাঠশালা যেন পান্থশালা! কদিনের এই অবস্থান? লেখা-লেখা খেলা আর পড়া-পড়া ঐকতান ছেড়ে আমরা বিদ্যালয়ের নীরস বালুবেলায় প্রবেশ করে সেই গৃহকেও হারাই, সেই পাঠশালার খেলাঘরকেও আর খুঁজে পাই না। বই-এর চাপে আর শিক্ষার চাপে আমরা ওকোতে ওকোতে একসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার টপকে জীবনের এক-চতুর্থাংশ যে সবুজ-সতেজ প্রথমাংশ তাকেই হারিয়ে বসি। বাস্তব জগৎ বড় বড় গোল গোল চোখে আমাদের মুখে তাকায় আর সংসারের ঘানিতে যুতে দেবার জন্যে দড়ি-দড়া নিয়ে নির্দয়-কর্কশ অপেক্ষা করে। তখনও কি সেই হারানোর যন্ত্রণা আমাদের মনে ঝিনি ঝিনি বাজে না? মনে হয় না কি যে হারিয়ে এলাম, হারিয়ে ফেললাম, সজল-শ্যামল কিশোর-তরুণ সময়টাই।

তবে একথা একশো বার সত্যি যে সব হারানোই একরকমের হারানো নয়। একটা দেখার ব্যাপার আছে। সামনে তাকালে যা পাওয়া বলে মনে হতে পারে, পেছনে তাকালে তাই হারানোর বলে বোধ হতে পারে। অতীতের নাম হারানো, ভবিষ্যতের নাম প্রাপ্তি। তাকানোটাই আসল ব্যাপার, দিময়া বা দিকটা নির্ভরযোগ্য। হারানোটা যখন একটা লব্ধি তখন সে প্রাপ্তির মধ্যে সুদসমেত ফিরে আসার কথা। পাঠশালার খোলামেলায় যে গৃহ-শান্তি আর গৃহ-নৈকট্য হারাই তাই বহুগুণ হয়ে ফিরে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার জীবনের পারের কড়ি হয়ে। যে শ্যামলকে হারাতে হয় তরুণ বয়সে সেই আবার ফিরে আসে আকাশের নীল হয়ে মধ্যজীবনে। এই সব হারানোতে তাই দুঃখ মুছে যায় আনন্দের হাতে।

কিন্তু যে হারানোতে শুধু হারানোই আছে লব্ধি নেই, বিয়োগব্যথাই আছে যোগের চিহ্নমাত্র নেই? অনেকেই তো আমরা মাকে হারাই, হারাই বাবাকে, প্রিয়জনকে? অসময়েই? সেই হারানোতে তো আমরা প্রায় সকলেই পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ি, মরণকে শ্যামতুল্য করে, সৃষ্টির বেদনায় অভিশাপ করে, উত্তরণের ভবিষ্যতে সর্বজনীন করে তুলতে পারি না। নিজের বেদনাবোধকে সর্বজনের করে তোলার মধ্যে যে পরজের জন্য সে তো সাধারণের জন্যে নয়। আর যিনি তা পারেন তিনিই নিজের হারানোটুকুকে সকলের প্রাপ্তিতে পূর্ণতা দান করেন। অবশ্যই, কিন্তু তাতে হারানোর বেদনাটুকু মিথ্যা হয়ে যায় কি? সত্যতর হয়, এই সত্য।

আমরা যারা সাধারণের দলে তারা হারানোকে স্মরণের মনন লাগিয়ে ভরাট করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারি মাত্র। তাপিত চিত্তে আমরা তর্পণ করি, অতীতমুখী অনুধ্যানে বেদনাকে বর্তমান রাখি মাত্র। আর তাইই বা আমরা বেশিদিন পারি কি? শত-সহস্র আরও হারানোর ভয় ঢেউ ঢেউ আমাদের বর্তমানকে আচ্ছন্ন করে রেখে নোতুন নোতুন হারানোর ভয়কে সতেজ-তীব্র করে তোলে যে। ভয়টা থেকে যায়, হারানোটা একদিন কখন যেন অজান্তেই হারিয়ে যায়!

আবার কিছু কিছু হারানো আছে যা হারানোই প্রিয়-নৈকট্য পায়। স্মরণ যোগ্য শৈশব এমন একটি হারানো। বাংলার দূর্বাশ্যামল মাঠ-প্রান্তর পাখিডাকা সকাল সন্ধ্যা, শিশির ভেজা মসৃণ-মাটির ক্ষেত, পুকুরের মাঝমধ্যিখানে ডুব-ডুব পানকৌড়ি, মৃদু হাওয়ায় দে-দোল বাবুই-এর মসৃণ বাসা, প্রাণের মৃদু-গুঞ্জনে সদা চঞ্চল মৌমাছির চাক, দুটো-তিনটে পাতার আড়ালকে একত্র-করা পিঁপড়ের গৃহস্থালী—এ-সবই প্রত্যেকের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু বেলা পড়ে এলে এ-সবই যেন হাজার-আয়নার ঝলমল হয়ে স্মরণকে খুঁজে পায়, আপন হয়ে দেখা দেয়।

ছোটবেলার বন্ধুত্বও এমন এক হারানো। যে বন্ধুত্বে স্বার্থের গন্ধ-থাকে না, যে নৈকট্য প্রাণের চঞ্চল আবেগেই গড়ে ওঠে, বাল্যের সেই বন্ধুত্ব হারিয়ে গেলেও ফিরে ফিরে আসে। কখনও মনে মনে, কখনও সামনা-সামনি। তরুণ কালের পরিধিতে অনুভব আর চেতনার গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ধারা প্রবাহ অনেককেই কাছে টানে, আপন করে নেয়। জীবনের গতিপথে সেই সব আপনরা কে-কখন-কোথায় হারিয়ে যায়। হারিয়ে গেলেও তারা কোথায় যেন মনের কোনো গভীরে থেকেই যায়। তাই এই সব হারানো ওলোও সময় মতো অনায়াসে ফিরে আসে, ফিরে আসতে পারে।

যৌবন অতি মধুর কাল, অতি নিষ্ঠুর কাল। জীবন সমুদ্রের মন্থনের সময় এই যৌবন। অনেক অমৃত, অনেক গরল উত্থিত হয়। স্বার্থ এই প্রথম জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত দর্শন-প্রত্যক্ষে নিজের ছাপ মেরে দিতে থাকে। সারল্যই যৌবনের প্রথম 'কাভুয়ালটি', আর সেই সূত্রে প্রথমেই তাই আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের খেলা-পাগল মনটিকে, অকারণ হাসি-আনন্দের উৎসটিকে। বিস্ময় ছেড়ে আমরা বিস্মৃতি হয়ে উঠি, উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্য-পূরণের তাগিদ আমাদের স্বাভাবিকতাকে প্রতি পদে পথরোধ করে দাঁড়ায়। টাকা-আনা-পাই থেকে সংসারের যাবতীয় খড়-কুটো সংগ্রহে মন দিই। এই হারানোর তাই আর অন্ত ঘটে না, হারানোটা তাই তখন সম্পূর্ণ করেই ঘটে যায়। কারণ জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছেও, বৈতরণীর পাড়ে দাঁড়িয়েও, আমরা হিসেবের খাতাখানা খুলেই বসে থাকি। মনের পাখনা বন্ধ হয়ে এলেও দেনা-পাওনার পক্ষতাড়না আমাদের চারদিকেই যেন অহরহ আলোড়ন সৃষ্টি করেই চলে।

এই সময়ের যা কিছু হারানো তা সবেরই একটা আলাদা রূপ আছে। সেই রূপটি বেদনার। অবশ্য সব হারানোই তো বেদনার। হারিয়ে ফিরে পাওয়াটাই আনন্দের। কিন্তু ফিরে আমরা কি পাই? কাকে পাই? কজনে পাই?

এই সময়ে চাকরি করতে গিয়ে স্বাধীনতা হারাই, ব্যবসা করতে গিয়ে ভালমন্দ বোধকে হারাই, কলকারখানায় মজুর হয়ে স্বাস্থ্য হারাই, আর যারা বিদেশ-বিভুঁই-এ পাড়ি দিয়ে সম্পদ-উন্নতি খুঁজতে যাই তারা স্বদেশকে হারাই, আপনজনকে হারাই আর রসের যোগানটি হারাই। এবং সব থেকে বড় কথা সংসার করতে গিয়ে সংসারকেই হারিয়ে ফেলি!

এই সংসারের কথাটা একটু জটিল। ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে সংসার করতে চায়। এই করতে গিয়ে মেয়েরা পিতৃগৃহ হারায়। এই হারানোটা সানাইয়ের মধুর-করুণ সুরের আড়ালে, শঙ্খের গম্ভীর নিনাদে আর উলুধ্বনির ঘন ঘন মূর্ছনাতেও ঢাকা পড়ে না। নোতুন বাক্স-পাঁটরার গর্ভে সুসজ্জিত ঘরে-বিঘরে ভাঁজকরা শাড়ি, সর্বাঙ্গে মোহন-মূর্তি গহনার আল্পনা আর চন্দন চর্চিত কপাল, কাজল টানা চোখ—এ-সবই কল-বর্তমান, বধূ-ভবিষ্যতের দোলনায়, ফল্গুধারার মতো,

কিনারা-বিস্মরণের হারানোর ভূমিকা' মাত্র। বর্তমানটা ক্ষণস্থায়ী, হারানোটা দীর্ঘায়ত। 'সুখের কোটিতে' বর্তমানের দৃষ্টিসীমা মোড়কে অতীত হারানোর 'কুইনিনটুকু' সমূহে আবরিত!

এদিকে ছেলেরা? মনে মনে ছেলেরা ও-পারের ডাঙা থেকে এ-পারের প্রাপ্তিকে বড়ো করে দেখে। জীবন নদী, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, ও-পার ছেড়ে যেন সবাই এ-পারই পড়ছে। ও-প্রান্তের হারানোটুকুকে সাগ্রহে সংগ্রহ করে এ-প্রান্তের সম্ভারকে উপভোগ করতে চায় ছেলেরা। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এ-প্রান্তের হারানোটা বিবিধ, বিস্তৃত হয়ে, ভিতরে ভিতরে সংসারের হারানোটাকেই বাড়িয়ে তোলে। মেয়েরা অতীত হারায়, ছেলেরা তাদের সবটুকুই নবীনতার মধ্যে হারিয়ে ফেলে! অর্থাৎ 'নিজেকেই' হারায়। এই নিজেকে হারানোটা দৈহিক না হয়ে মানসিক ভাবে হয়। তাই ছেলেরা নিজের সংসার থেকে, মা-বাবা থেকে হারায় এবং, দ্বিতীয়ত, নিজেই হারায়। আর যদি মায়েরা পুত্রকে 'হারাতে' না চান তাহলে 'সবই' হারানোর পথে পা বাড়ান। তাই বলছিলাম সংসার করতে সংসার হারানোটা বেশ একটু জটিল ব্যাপার।

এই সংসার হারানোটা যদিও অত্যন্ত বেদনার, তবুও সমূহের টানে, বর্তমানের মাদকতায়, একে প্রাপ্তি বলেই মনে হয়। যে হারানোতে হারানোর বেদনা নেই, প্রাপ্তির আনন্দ-বোধ মোড়কের মতো জড়িয়ে থাকে সেই হারানো অবশ্যই 'ঐতিহ্যিক'। কিন্তু আমার কথা এই যে এটা সার্বিক, অনিবার্য। 'মানুষ মরণশীল' এই সামান্য-সত্য জেনে মৃতপ্রায় ব্যক্তি যেমন বাঁচতেও সান্ত্বনা পেতে পারে, এই হারানোর সামান্যত্ব জেনেও তেমনি আমরা, সংসারীরা, মনের সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পারি।

এ-বারে মানব জীবনের সব থেকে বড় হারানোর কথাটা বলি। সময়। সব হারানোর বেলায় গোঁজামিল গোছের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারি। কিন্তু সময় হারানোতে কোনও গোঁজামিল চলে না। তাছাড়া অন্যান্য সকল বিষয় হারানোর পাশাপাশি একটা পাওয়ার ব্যাপার খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু সময় হারানোতে নিছক হারানোটাই অবশিষ্ট পড়ে থাকে। হিসেবটা সরল অঙ্কের মতোই সরল। জীবনের সব অঙ্কে-অঙ্কে, পর্বে-পর্বে, দশে-দশে আমরা হারাতে হারাতেও কোনও না কোনও উত্তরের প্রাপ্তিতে পৌঁছোই, শেষ দশে শূন্য আসে না। কিন্তু সময় চলে গেলে শূন্যই হাতে থাকে, সময়কে তো আর খুঁজে পাওয়া যায়ই না, বরং সময় তখন পিছন থেকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। সব কিছুই বার বার আসে, যায়, অপেক্ষাও করে। কিন্তু সময় একবারই আসে, এবং যখন সে চলে যায় তখন আর শত চেষ্টাতেও তাকে ধরা যায় কি?

কিন্তু এত কথা! বিন্দুতে সিন্ধুর ইঙ্গিতি ঘটে আমাদের অন্তরের গভীরে। সমাজ সংসারে হারানো-প্রাপ্তি বেদনার, কিন্তু মৃত্যুতুল্য নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজের অন্তরের অমৃত-বিন্দুটিকে যখন হারাই তখনই সে-হারানো সিন্ধুতুল্য, মৃত্যুতুল্য হয়ে ওঠে। সম্ভাবনার মৃত্যু, প্রকৃতি মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি, অন্তত একটি, সম্ভাবনাকে উপ্ত করে দিয়ে থাকেন। অজ্ঞানে অবহেলায় আমরা যখন সেই সম্ভাবনার উৎসটিকে হারিয়ে বসি, মোহনা মুখী করে তাকে প্রাণের উজ্জীবনী স্রোত ধারায় প্রবাহ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ি, তখনই তো তা হারিয়ে ফেলি। মানব জমিন পতিত থেকে যায়, সোনা ফলানোর অবকাশ ঘটে না। এই হারানোর তুলনা কোথায়? এই ট্রাজেডির সীমা?

আমি, তুমি এবং সে ঃ

আমি, তুমি আর সে। এই নিয়েই তো আমরা সকলেই। আমাদের পরিবার, সমাজ, এবং পাড়া-প্রতিবেশী। আমি আর তুমি মিলে যে আমরা তা কখনই প্রকাশ পায় না, ফুটে ওঠে না যদি সে না থাকত। এই বহু সে একসঙ্গে মিলে আমাদের বাস্তব ছবিটির, অস্তিত্বের, যথার্থ দেয়। অথচ এই সব বহু অপরিচিত-অর্ধপরিচিত-পরিচিত সে বা তারা আমাদের আমি-তুমির অন্দর মহলে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না। কারণ যখনই প্রবেশের ছাড়পত্রটি পায় তখনই তার সে-ত্ব ঘুচে যায়, তুমি-ত্ব এসে যায়। আর এই সে-গণ যখন একেবারেই অপরিচয়ের গণ্ডির বাইরে থাকে তখন তারা হয় ভিড়। না-হয় একটা ধারণা মাত্র। এ-দিক থেকে আমি-তুমির ঘনিষ্ঠতা সীতার গণ্ডি হয়ে সে-তারার রাবণ কে দূরে রাখতে চায়।

আবার দেখ এই আমি আর ওই তুমির মধ্যেও তো কতো রকমের সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকতে পারে। তুমি ছাড়া যেমন আমার জগৎ অন্ধকার, তুমি ছাড়া আমি বাঁচব না, তুমিই আমার ইহকাল-পরকাল, ঠিক তেমনি তুমি আমার দু'চক্ষের বিষ, তুমি আমার মরণ, আমার শত্রু, আমার কাল। এই দুই 'পজেটিভ' আর 'নেগেটিভ' তুমি-আমি-র বাইরেও তো একটা 'নিউট্রাল' আমি তুমি সম্পর্ক আছে। তুমি আমার কেউ নও, আমাকে ছাড়াও তোমার বেশ চলে যাবে, এখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তুমি আছ তোমাকে নিয়ে আর আমি থাকি আমাকে নিয়ে। তাই দেখা যায় যে যতোটা কাব্যিক মনে হয় এই তুমি-তুমি আর আমি-আমির একক বা যৌথ ভাবনা ততোটা কাব্যিক বোধহয় তারা নয়। অনেকটাই গাণিতিক হয়েও কপালের ফেরে হতে পারে!

অবশ্য আমার আমিটা যখন প্রথম নিজের আমিত্বের খোলস ভেঙে বাইরে এসে তোমার তুমিটিকে দেখতে পায় তখন গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বৃক্ষ-কুঞ্জ আর উদার আঙিনা অনেক ভাবের সৌধ রচনা করে। তখন যেন মনে হয় আমিটা আসলে সৃষ্ট হয়েছে তোমার অসীমে হারিয়ে যাবার জন্যেই। জীবনকে মনে হয় স্বপ্ন, পৃথিবীকে রমণীয় আর একাকিত্বের দ্বৈত নিঃসঙ্গতাকে মনে হয় মধুরের মৌচাক রচনার অবকাশ। প্রাণের জলাশয়ে ঝির ঝিরে হাওয়ার মৃদু তাড়নায় যে ছোট্ট ছোট্ট ঊর্মিমালা তির্-তির্ করে নড়ে-চড়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যায় তাদের মনে হয় কবিতার উচ্চারণ, গানের কলিগুলো যেন জল-বিহারে অফুরন্ত। ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে আমি-তুমির এই ঘুর-পাক চলন যেন অনন্তের ডাক বলে মনে হয়। এই সব আমি-তুমিময় জীবনে সে যেন একটা ছন্দ-পতন, দৈত্য-সম আগমন, বিধ্বংসী উপস্থিতি। সে-র মৃত্যু দিয়ে তবে মুক্তি হবে 'মোর-তোমার'! তবেই দেখুন সে সব সময় আমি-তুমির প্রকাশের 'ক্যানভাস' নয়।

অথচ সে-রূপ অনসূয়া-প্রিয়ংবদা না থাকলে আমি-দুষ্মন্ত আর তুমি-শকুন্তলা কতোই না অসত্য হয়ে পড়ে! শব্দ বা ভাষার সে-তারা না থাকলে আমি-র অনুভব আর তোমার-কল্পনা মুক্তই হতে পারতো না। কবির প্রেম-ভালবাসা-ভক্তি শব্দে-শব্দের সেতুবন্ধনেই তো ওপারের প্রেমিকার কাছে, দেবতার পাশে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারে। সে-রূপে ঘটক এলেই আমি-তুমির ছলনাহলা সম্পূর্ণ হয়। তাই সে শুধু ছন্দ-পতনই ঘটায় না ছন্দোবদ্ধও করে তোলে। সে আছে তাই তুমি আছ আমি আছি। আমরা যখন প্রথম দর্শনের রক্তা-খোলসে আটকা পড়ে কষ্ট পাই তখনই তো

বন্ধু-মিত্র-সুহৃদ বেশে একজন সে এসে আমাদের মধ্যে জমে থাকা বরফকে গলিয়ে সুগম করে তোলে। আর সেই গলিত বরফের জলাশয়ে আমরা যখন উজান আমি-আর-তুমি হয়ে স্বর্গ খেলনা গড়তে চঞ্চল তখনই সেই সে'র জন্যে বিসর্জনের বাজনা বাজে। আমি আর তুমি অনন্তের পথিক, সে কেবলমাত্র জীবনের 'বইল-নেক' খোলার প্রয়োজনীয় যন্ত্র!

কিন্তু জীবনে তো আপনারাও কম দেখেন নি। অনেক তুমিকেই তো শেষ পর্যন্ত সে হয়ে যেতে দেখেছেন এবং অনেক সে উঠে এসেছে তুমির রূপে? তাই এক ধাপ এগিয়ে বলা যায় যে আমি-টাই নিরন্তর, অনন্ত। তুমি আর সে, সে আর তুমি আপেক্ষিক। কখনও বা তুমিই আমার সে হয়ে যাও আবার কখনও বা সে-ই আমার তুমি হয়ে আলো জ্বালে আমার মুখে। তাই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায় যে সে হয়ে কেউ যেন বাঁচতে না চায়, সব বাঁচাই তুমি হয়ে বাঁচা। আমি অমৃত, তুমি-ও অমৃত। একমাত্র অমৃত হল সে। এখানেই সে-র মৃত্যু-চিহ্ন আঁকা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন একা কেউ থাকিও না। আমার মনে হয় তার চাইতেও বড় নির্দেশ সে হয়ে কেউ বাঁচিও না।

অথচ 'ট্রাজেডি' এখানেই। আমরা সকলেই এক-একজন প্রকাণ্ড সে হয়ে বেঁচে থাকি। চাই না, কিন্তু অনাথা হয় কে? আমি তুমির উন্মুক্ত পসার ধার বা মেমোরিয়ালের উদার পরিসর যখন সংসার-দ্বিপের একটানে চার-দেওয়ালের মেরাটোপে আটকা পড়ে যায় তখনই তো আমার যেমন 'সে' হওয়া শুরু তোমারও তেমনই সে হওয়ার শুরু। আমরা দুজনে দুজনকে বাস্তবের রচনায় দ্রুত তালিম দিতে থাকি। প্রেম সূর্যের আলো ক্রমশ চাল-ডাল-রেশনের তাড়নায় হারিয়ে যায়, ভালবাসার চাঁদনী-কোমলতা টাওয়েল-কাঁচিঙরম-কোবরাসিঙ্কের দুকূল-প্লাবি অর্থ-স্রোতে মরু-রুক্ষ হয়ে যায়। তখন মনে হতেই পারে যে স্বর্গ শুধু দেবতাদের অধিষ্ঠানে ধন্য নয়, অসুরের প্রতাপেও কম্পমান। ধরণীতে স্বর্গ রচনার দিন শেষ হলে সেই আবাসনে কারা বাসা বাঁধবে তা কে বলতে পারে? সেই হাসি সেই গান সেই স্ত্রীরাবনত সলজ্জ মৃদু-চাহনিই এখন আর তেমন 'তুমি-তুমি' করি প্রাণ-মাতায় না বরং মনে হতে পারে হাসিতে এখন ব্যঙ্গ, গানে অ-সুর আর ঘাড়ে যেন সাপের মতো ফণা তোলাই আছে। সংসারের ঘাঁতাকলে আমার আমি-ই হারিয়ে গিয়ে তোমার কাছে সে হয়ে গেছি। আর আমার কাছেও তুমি তোমার তুমিটি হারিয়ে সে হয়ে গেছ। এটাই সে-র ট্রাজেডি।

জীবনের অন্য প্রান্তে চলুন। মা-সন্তান। শিশুর কাছে মা-তো তার বিশ্ব ভুবনের আলো। মা'র কাছে তার সন্তানও তাই। সন্তানের আমি টা মায়ের কোলে তুমি-তুমি-র গভীরে অপার শান্তি পায়। মা জড়িয়ে ধরেন তার সন্তানকে নিজের বুকে, তার 'তুমি-আমার-সব'-কে। এখানেও দেখুন সন্তানের আমি আর মায়ের আমি পরস্পরের তুমিতে আকণ্ঠ অতিসিঞ্চিত। (বেচারি পিতার অবস্থা অবশ্য তুমি থেকে সে-র উপরে কষ্টে পরিস্পন্দমান!)। দিন দিন করে রাতের ঘুম আর দিনের বিশ্রামের মূল্যে সন্তান বড় হয়ে উঠছে। সন্তানের কাছেও তার স্বর্গ এই ধরণীর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে, তার মায়ের মধ্যে বাল্যের খেলাঘর, কৈশোরের উন্মেষ আর তারুণ্যের চঞ্চলতাকে অফুরন্ত-অতলান্ত করে উপলব্ধি করছে, অন্যজন তার সন্তানের মধ্যে যৌবনের আশা প্রৌঢ়ত্বের তৃপ্তি আর বার্ধক্যের নির্ভরতানিভ অতল-সুন্দর মুক্তিকে খুঁজে পাচ্ছে।

এবারে এই মাতৃহৃদয়ের খাঁচায় স্নেহের শিকলে বাঁধা সন্তান-পাখিটি যখন মনের পাখাটির সন্ধান পেল, বনে নয় মনে তার, তখনই শুরু হল পাখা ঝাপটানো। জীবনের সঙ্কটে পা যেই পড়ল, অমনি মন উড়ু-উড়ু সেই খাঁচার পাখি অন্য পাখির কলরবে মাতোয়ারা হয়ে যা কে তার তুমির

আসন থেকে এক ঝটকায় না হলেও ধীরে ধীরে সে-র পিঠিতে নির্বাসন দিতে পা বাড়ালো। ভবিষ্যৎ ট্রাজেডির বীজ এখানেই উপ্ত। মায়ের হৃদয় ভাঙে, সন্তানের 'সংসার' গড়ে। মায়ের এতোদিনের এতো সাধের তুমিটি, তিলে তিলে গড়া তুমিটি, হারিয়ে যায় সেই তুমির সদা পাওয়া অন্য তুমিতে। এ-পাড়ে সন্তান তার তুমিকে গড়ে তোলে, ওপারে মায়ের তুমির-পাড় ভাঙে। রীতি, প্রকৃতি!

বেচারি পিতা! আগেও একবার বলেছি 'বেচারি'। কেন? পুত্রের কাছে তো সব পিতাই তিনি, যা সে। মনোবিজ্ঞানীর পরিভাষায় 'ইডিপাস্ কমপ্লেক্স', সমাজ-বিজ্ঞানীর কথায়, 'ইগো-কনফ্লিক্ট', জীবন বিজ্ঞানীর ভাষায় 'ফিকশন'। পিতারা তো আর 'পিয়ুষ করেছি দান, তোর লাগি পুত্র মোর জীবন করেছি পণ' বলতে পারে না! তাই পিতা আমিটির কাছে পুত্র তুমিটি এবং ভাইসুডারসা সমান ভাবেই প্রায় সহজ 'সে'-তে পর্যবসিত। এই ট্রাজেডি তাই চলছে, চলবে।

তবে একটা অন্যতর বিন্যাসেও এই অন্যান্য সে আত্মস্থ হতে পারে। বিশিষ্ট মিঃ এবং মিসেস সে নৈকট্য প্রকাশ করে ভারতীয় নারী-জীবনে তা এখনও পর্যন্ত সড়গড় হয় নি যদিও কোনও কোনও উচ্চকোটি জীবন-মানে স্বামীকে তার মূল নামে আর স্ত্রীকে তার নরম-নামে ডাকাটা ধীরে ধীরে প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীর ডাকে নামের উচ্চারণ থাকে না। কাছে-কাছে যখন উঠা-বসা তখন নামটা প্রয়োজনের নয়। ওগো-হ্যাগো-র আন্তরিকতায় প্রত্যেক আমি তার তুমিকে কাছে পায়। সমস্যা হয় যখন দূরে থাকে। তখন 'ওকে একটু ডেকে দেবে?' 'তাকে একবার এখানে আসতে বল' করে সেই নিকটের তুমিকে দূরের সে করে দেওয়াটা কোন ব্যতিক্রম নয়, নিয়মই। কাছের 'তুমি' যখন দূরের সে হয়ে যায় তখন একটা মোচড় প্রাণের প্রতি যেন সেই সে-তে আরোপিত হয়। তাই বলছিলাম, একই সে অন্যতর বিন্যাসে তুমি'রই পরিপূরক হয়ে ওঠে। ট্রাজেডি নয়, আত্মস্থ আনন্দের বাতাবরণটিই সে-কে দূরে ঠেলে দেবার বদলে কাছে টেনে ধরে। এই সে সেই সে নয়। আমি-তুমির ক্ষেত্রে এই সে তুমি'রই প্রতিভূ মাত্র।

কিন্তু অনেকের জীবনে তুমিও আসে না সে-ও প্রাণের স্পর্শ না পেয়ে কাছে আসে না। আমিটা একটা মরুভূমির কর্কশতায় হারিয়ে যায়। হারিয়ে যেতে থাকে। তুমি'র একটা সজল-শ্যামল উপত্যকায় যদি বিচরণ আদৌ সম্ভব না হয় তা হলে সেই আমিময় জীবন কোনও একটা সে-র জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। অন্ততঃ একটা মরূদ্যানের শান্তি দিতেও তো একজন সে থাকাটা দরকার ছিল। এরা সেই জীবন-ট্রাজেডি-কে বরণ করে নেয় নিজেদের অহংপ্রাবল্যে। তুমিকে এরা পায় না সেই তুমির মধ্যে একটা আমি সতত প্রবল বলে, কোন সে'ই তার কাছে প্রাধান্য নয় কারণ সে তো সে'ই, আমার আমি নয়! আমি-বোধের অহং-এর চারপাশে চিন্তা-অনুভব-চেতনার এমনই একটা বেড়া এরা তৈরি করে যে তা অপ্রবেশ্য হয়ে ওঠে। এরা জীবনে জীবন যোগ করতে পারে না, অহং-এর বিষ এদের অহর্নিশ কেন্দ্র-ভ্রষ্ট করে রাখে। এরা অপরের মধ্যে নিজেদের খুঁজে না পেয়ে নিজের মধ্যেই হারিয়ে যায়। এরা সকলেই আত্মমগ্ন অহং-পাথারে নিরুদ্দেশের যাত্রী। এদের ট্রাজেডি ঘটে তখনই যখন জীবনের হাতছিটি এদের অবসন্ন প্রাণের মেরুদণ্ডে আঘাত করে এবং এরা ফেটে চৌচির হয়ে খান খান হয়ে ব্যর্থতার উদাহরণ হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। একাকিত্বের জীর্ণতাই এই আমিদের হাতড়ি-পেটা অহং-এর পরিণতি।

আরও আসল কথা আছে। কৌমুদির অহং-আবাম-বরম, তৎ-তে-ত্বমি-স-তৌ-তে সেই ছেলেবেলার সুসজ্জিত সৈনোর ছবি হয়ে চোখের সামনে আর জিহ্বার অগ্রে দেখা দিত। তখন তো জানার কথা নয় যে এই আমি-তুমি-আর-সে কত রূপে, কত ভঙ্গিতে আমাদের পরবর্তী জীবনে 'পুন-পুন' হয়ে প্রত্যেককেই মোক্ষ-মোটা করে ননী-মাখন-ঘোল করে ছাড়বে! তখন যদি জানতাম যে এই আমি-তুমি-সে-র বাগানটি যথাযথ পরিপালন করতে পারলে ভবিষ্যতের অনেক আগাছা-জঞ্জালের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা হলে পণ্ডিত মশাই-এর কিম্ভূত দুর্গ আর তস্য কিম্ভূত ইকিটির দিকে নজর না দিয়ে কৌমুদিতেই চোখের নজর ধরে রাখতাম। বই-এর শিক্ষকেরা আমাদের মনকে 'বই'তে প্রবেশ করাতে পারেন না, পরে সারাজীবন সেই মনকেই বইতে হয়। ছেলেবেলার আমিগুলো সবই বাবার তুমি মায়ের তুমি হয়ে বেড়ে উঠতে উঠতে কখন যেন একদিন অন্য কারো তুমি হয়ে উঠলে সে হয়ে যায়! ট্রাজেডির বীজটি তাই কৌমুদির সৈনোর আক্রমণে সতেজ বেড়ে ওঠে।

ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়। তাই বেশি দোষ দেখি না তাদের গ্রামারের গম্ভীর ঢাকনাতে। সেখানে 'আই'-এর সঙ্গে 'এ্যাম' চলে ইউ-এর সঙ্গে 'আর' এবং থি-এর সঙ্গে যে প্রকৃত গোলমাল তাহাতে তা বুঝে যাই কচি-বয়সেই। সেখানে স্বাভাবিক 'ইজ'। আমি-তুমি-সে যে আলাদা, হাত ধরাধরি করে যাবার নয়, একাসনে চলন-বলন-খাদ্য-খানা অচল তা আর অজানা থাকে কৈ। আবার আমিও যাই, তুমিও যাও কিন্তু সেই সে এলো অমনি 'গোড'! কেন? সে যে পর, দূর, অন্যপন। আসা-যাওয়া-যাওয়া-বসা সব ক্ষেত্রেই একটা আলাদা-আলাদা, পর-পর ভাব। একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। আমি-তুমি মিলিও এক দাওয়ায়, এক বিছানায়, এক কক্ষে থাকতে পারি সে কখনই নয়। আর কে না জানে যে ভাষা ভাবের বাহন। আমি-তুমির ঘনিষ্ঠ জীবনে সে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়। এখানেই তো সে-র ট্রাজেডি।

তাই তো দেখি অনন্তকাল ধরেই মানুষ একটি মাত্র বাসনা ব্যক্ত করে চলেছে: হে মহাজীবন, আমাকে তুমি সে করে দিও না। আমাকে তুমি তোমার করে নাও। তুমি যদি অসীমও হও তাহলে আমার আমিটিকে তোমার সেই অসীমে স্থান দাও। এই অনাদিকালের আকুতি। মানুষের জ্যোতির্ময়ের প্রার্থনা।

কিন্তু যখন দেখি সো-অহং, তৎ-ত্বম-অসি? সে তো অন্য ভাব, অন্য পৃথিবী, অন্য জীবন। মাটির ধরণী ছেড়ে যখন বৈদান্তিক অনন্তের জ্ঞান-পথে পদার্পণ করি তখনই তা সত্য। তখন তো আর আমাদের আমি-তুমি-সে ওলোর পায়ে মর্তের ধূলিকণা লেগে থাকে না, তখন যে আমাদের আত্মা অন্য কোনো বিশ্বআত্মার স্বরূপে আমাদের চাক-ঢাক-ভেল-নুনের দৈনন্দিনতা থেকে ছিন্ন করে নেয়। তখন আমি-তুমি-সে-র চক্রব্যূহ ভেদ করে সত্য-শিব-সুন্দরের দিব্য-চক্রে আরোহণ সম্পূর্ণ হয়। সেই পথেও কি ট্রাজেডি নেই? আমি-তুমি-সে-র ভেদাভেদ জ্ঞান লোপ পেয়ে যাদের চোখের জল আসে, যাদের পৃথিবী শূন্য হয়ে যায় ট্রাজেডি তাদের। তারা বুদ্ধ-জননী, চৈতন্যের বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণের রাধারাণী।

জানবে তাই আলাদা থাকলেও ট্রাজেডি, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেও ট্রাজেডি। আমি-তুমি-এবং-সে সেই ট্রাজেডির নাম। ট্রাজেডির নামকরণ।

ভূতের বেগার ঃ

দুপুর বেলায় রুগ্ন পিতা বিছানায় দীর্ঘশ্বাসের চাদর মেলে দিয়ে ভাবেন, সারাজীবনই ভূতের বেগার খেটে মরলাম। রান্নাঘরের শেষ কাজটুকু সেরে পড়ন্ত দুপুরে গৃহিণী ঘরের ছিটকানি তুলে দিতে দিতে অসন্তুষ্ট বলে ওঠেন, হেঁসেল ঠেলে ঠেলেই জীবনটা গেল। বিকেল বেলায় স্কুল-কলেজ থেকে ছেলে মেয়ে ঘরে ফিরে হতাশ হয়ে টেবিলের উপর বই-খাতা-ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে—ভবিষ্যতের তাড়নায় বর্তমানগুলোর একেবারেই জলাঞ্জলি হয়ে গেল। সারাদিন একা একা কাটিয়ে আর বার বার ঘরের অনাবশ্যক-আবশ্যক টুকিটাকি কাজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে ক্লান্ত পুত্রবধূ সজ্জার প্রসাধন সেরে অফিস-ফেরত স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে বসে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধিককার দেন, পরের জন্যে অপেক্ষা করে করেই কি জীবনটা যাবে! ওদিকে আর একটি কর্মপীড়িত দিনের শেষে পথক্লান্ত-শ্রম-শ্রান্ত মনে অবসন্ন তার স্বামীটি ঘরে ফিরে বুকের দুটো বোতাম খুলতে খুলতে খাটের কোণে বসে, অথবা টাই-এর গিঁট ঢিলা করতে করতে সোফায় এলিয়ে পড়ে বলে উঠবেন, আর পারি না, তোমাদের জন্যে জীবনটাই নষ্ট হতে বসেছে!

তাহলে আমরা কি সবই মুটে মজুর? অপরের বোঝা বয়ে বয়ে মরছি? পিতা পুত্র-কন্যার বোঝা, পুত্র-কন্যারা পিতা-মাতার বোঝা বইছে, স্বামী স্ত্রীর বোঝা আর স্ত্রী স্বামীর, ভাই বোনের বোঝা, বোন ভাইয়ের। যে চাকরি করছে সে বেকারের বোঝা, অফিসের বোঝা, পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া দেনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের গিন্নী সংসারের বোঝা, কর্তা পরিবারের বোঝা, ছেলে-মেয়েরা মার বাবা স্ত্রী আর স্বামীর বোঝা বইছে। মা সন্তান মানুষ করার দায় আর বাবা অর্থ উপার্জনের দায়িত্বের বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে। এ-সবের বাইরে যাদের সভাসমিতি আছে, রাস্তা-ঘাট সংস্কারের কাজ আছে, পুজো-উৎসব-অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আছে তারাও সকলে অপরের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট থেকে বড় বড় নেতারা দেশের কাজ, সমাজের উদ্ধার আর দশের সেবা ব্রত ঘাড়ে নিয়ে খাওয়া নাওয়া ভুলে যায়। এবং মাঝে মাঝেই, বার-বারই এদের মনে হয় এরা সকলেই বেগার খাটছে, ভূতের বেগার। মনে হয় প্রত্যেকেই মুটে মজুর। নিজের উপর রাগ হয়, অপরের উপর বিরক্ত হয়, জীবনের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এ-সব হয় ঠিকই কিন্তু অচিরেই আবার জীবন প্রত্যেকের কানেই কিন্তু একটা মন্ত্র দেয়। প্রত্যেকেই আবার সেই বোঝা বইবার জন্যে উঠে পড়ে, উঠে-পড়ে লেগে যায়। মা রান্না ঘরে যান, বাবা বাগানের দেখভালে লেগে পড়েন, ছেলে মেয়েরা বইখাতা গুছিয়ে স্কুল-কলেজে রওনা হয়। স্ত্রী ঘরের টুকিটাকিতে মন দেয়, স্বামী অফিসমুখো যাত্রা করেন।

এই দ্বৈত কেন? এই দ্বৈধ কেন? একদিকে 'আর পারি না!'-র জ্বালা, অন্যদিকে 'আবার পারার আশা'—এই দ্বৈত ভাব, বিরোধ প্রকৃতি, সর্বজনীন। অন্যদিকে জীবনের প্রতি পদে পদে, প্রতিটি সিদ্ধান্তের সামনে একটা 'টুবি অর নট টুবি'-র দ্বিধা—এটা করব না ওটা করা ঠিক হবে—এমন একটা অনিশ্চয়তা বোধও তো কোনো একা-একা অনুভব নয়। এই দ্বি-ত্ব, এই দ্বিধা-উচাটন দৈত্যের মতোই আমাদের প্রত্যেককে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মহাজীবনের প্রবাহের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমরা ব্যক্তি জীবন নিয়ে মোচার খোলার মতো ভাসতে থাকি, ডুবতে থাকি আবার ভেসে উঠি। জীবনের এই প্রতিনিয়তর ওঠা-পড়ার সাথে সাথে আমাদের ভাব-অনুভব-আবেগ যুক্ত

হয়ে যায়। সচেতনে-অচেতনে-অবচেতনে। চিন্তা-ভাবনা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, আশা-প্রত্যাশা, অতীত-ভবিষ্যৎ এবং ইত্যাদি। সব সময়েই আমরা কিছুটা স্বাধীন, বেশিটা পরাধীন। জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা, এই স্বাধীনতা-পরাধীনতার অবস্থাটি সমান টানা। নবজাত শিশু চিৎকারে আর চিত্র-বিদায়ী বাঁকি বিদায় বেলার উৎস্বাসে তাদের এই অবস্থার প্রমাণ দিয়ে থাকে। আমরা তাই সারাজীবন কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করি না, পূর্ণ পরাধীনতাও ভোগ করি না। কিন্তু দুবার সম্পূর্ণ পরাধীন থাকি—একবার জন্মের পূর্বে, জন্মের স্থান-কাল-পাত্রে, আর দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পরে, সেই প্রস্থানের স্থান-কাল-পাত্রাপাত্র নির্ণয়ে। জন্মের কূলেও যেমন আমাদের হাত নেই, মৃত্যুর অকূলেও তেমন হাত থাকে না!

কিন্তু এই মাঝখানের জীবনটা নিজের অধিকারে বাঁচতে গিয়ে আমরা সকলেই কমবেশি নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ি। শিশুরা নিজ নিজ অধিকার বাঁচাতে কেঁদে-কেটে-বাড়ি মাথায় করে তোলে, কিশোর-বালকেরা হাত-পা নেড়ে পা-দাপিয়ে সোচ্চার হয়, তরুণ-যুবকেরা বুদ্ধি আর অভিনয় কৌশলে কাজ হাসিল করে, করার চেষ্টা করে। জীবনকে সার্থক করে চেনার আগেই এরা অধিকার রক্ষার কলাকৌশল আর বাঁচার রীতি-রেওয়াজ রপ্ত করতে থাকে। এই পর্যায় থেকেই বেগার খাটার, মুটে মজুরীর ভূতের বোঝার বোধ গজায়।

ব্যাপারটাকে যতো সহজ বলে ভেবেছিলাম ততো সহজ নয়। সমাজের মাদামকে এর আগে একবার তিনভাগে ভাগ করে দেখে নিতে চেয়েছিলাম : আমি, তুমি আর সে – এই তিনভাগে। এখন এই 'ভূতের বেগার'-এ এসে দেখছি 'তুমি'-টা একেবারেই নেই - সব তুমিগুলো 'সে'-এর শ্রেণীতে একাকার মিশে গেছে। ভাগ দেখছি দুটো, আমি আর না-আমি বা, সে। আমি ছাড়া এই মহাবিশ্বে আর যা কিছুই আছে সে সবই 'অপর'। একমাত্র এই আমিই আপন।

এই আমিটা গড়ায় ধীরে ধীরে কিন্তু বাড়ে বহু-বৃত্ত ডালপালা ছেড়ে ছেড়ে। কাঁচপাতা আমির অনুভবে যখন জীবনের হাওয়া লাগে, অভিজ্ঞতার সেচনে যখন তার শিকড় তরতর করে গৃহ-পরিবার ছেড়ে সমাজের দেহে ছড়িয়ে পড়ে আর কাণ্ড-শাখায় পুষ্টির ছোঁয়া লাগে তখন এই আমিগুলোই আমাজ্ঞানের গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়ে ওঠে। তখন প্রত্যেকের আপন-আপন বোধগুলো সেই আমি বনস্পতির পত্র-পল্লবের শিরায়-স্নায়ে, কাণ্ড-শাখার কুঠে-কুঠে শিহরণ তোলে।

শিহরণ তোলে ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা 'অপর'-এর বোধও অনিবার্য জড়িয়ে থাকে, ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণটা বোধহয় এই যে কোনো আমি-ই একটা সে-এর বাতাবরণ ছাড়া জন্মাতে পারে না। জন্মাতেও পারে না, বাঁচাতে তো পারেই না। যে মায়ের গর্ভে আমরা জন্মাই, দুই থেকে ছিন্ন হয়ে নিজের এককে খুঁজে পাই, সেই মা যে একজন সে মায় তা টের পেতে যৌবন পর্যন্ত বিলম্ব হতে পারে—অথবা বিয়ে করা পর্যন্ত! 'বহুনো-পরে কা কথা'। নিজ নিজ অতীতে দৃষ্টি ফেরালে অথবা অপরের বর্তমানে চোখ রাখলেই এই সত্য জলবৎ ঠেকবে যে মা-বাবা ভাই-বোন এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত এই সে-র দলে, অপরের শ্রেণীতে পড়ে।

কেউ কারো নয় ভুবনে। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ! একাই এসেছি একাই চলে যাবো। আমাদের দেশীয় জীবনকে অভিজ্ঞতার কড়াইতে ভাজ দিতে দিতে দর্শনের হাকনিতে ছেঁকে তোলা এসব সত্য। [সত্য না ভোগাম তা অবশ্য পণ্ডিতদেরই বিবেচ্য।] তাই এই ভুবনে যখন আমরা আমি

থাকি, কাজ করি তখন তার বেশিরভাগটাই তো চলে যায় সেই অন্য 'কারো' ভাগে—অপরের জন্যে। মাইনে ঘরে আনি—স্ত্রী নিয়ে নেয়, প্রথম প্রথম হয়তো মা নিয়ে নিতেন। বাজার করে আনি, সকলে খেয়ে ফেলে। রোদে ঘেমে জলে ভিজে অফিসের লোন নিয়ে বাড়ি বানাই—অন্যলোকে ভোগ করে। সকাল-বিকেল বাড়ির সামনে বাগান বানাই পরিচর্যা করি অন্য লোকে ফুল তুলে নিয়ে যায়, ফল পেড়ে খায়। এমনি করে যা কিছু করি না কেন তা তো আমার 'আমি'-র ভোগেই শুধু লাগে না — অন্যের উপভোগেও যে লেগে যায়। আর তখনি মনে হয় 'ভূতের বেগার খাটছি'।

কিন্তু এই ভূতের বেগার তো অন্য সকলেই তা হলে খাটছে - সেটা দেখছি না কেন? দেখছি না কারণ ট্রাফিক চলাচলে যেমন ওয়ান-ওয়ে ব্যবস্থা আছে, দৃষ্টিভঙ্গিতেও তেমন আমি-ওয়ের চলন আছে। প্রত্যেক 'অপর' তো স্বার্থপর, নিজের জন্যেই যা কিছু করে, নিজের বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না, অপরের জন্যে কিছুই করে না। যদি প্রশ্ন করা যায়: কিছুই করে না? যদি বলা যায়, উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করা যায় তাহলে শুনতে হবে: কম কম করে, চক্ষু-লজ্জার জন্যে যেটুকু না করলে নয় সেইটুকুই করে। ওই করাটা আবার একটা করা নাকি? অনিচ্ছায় করা, মা-বাবার চাপে পড়ে করা, অথবা বৌ-ছেলে জন্যে করা, অথবা ছেলে মেয়ের ভয়ে করা, অথবা লোকে কি বলবে বলে করা। প্রত্যেক 'আমি' শুধু বেগার খাটে, নিজের ইচ্ছায়, বোকামিতে মুটে মজুর হয়ে জীবন পাত করে। আর প্রত্যেক অপর শুধুই ভোগ করে।

এই পর্যন্ত এসে একটা অস্পষ্টতা টের পেলাম। পরিষ্কার করে না নিলে চলছে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আমি আছে তা এক রকমের নয়। তৈল আমি আছে, পারিবারিক আমি আছে, সামাজিক আমি আছে। এমনতো অনেক আমি-র যোগফল আমাদের সর্ব আমি। আর একটা আমি-ও আমাদের ভিতর আছে। এই আমি-কে অনেকে অনেক নামে চিহ্নিত করেন। দৈব আমি, ঈশ্বরিক আমি, আধ্যাত্মিক আমি, আমার নিজের আমি। আসল কথা যার যার নিজের নিজের আমিটি তার তার কাছে কিছুটা কল্পনা কিছুটা আবছা-অনুভব আর বেশিটাই অজানা-অচেনা, অর্থাৎ অস্পষ্ট একটা বোধ মাত্র। এই অস্পষ্টতার জন্যেই সেই আমিটা কখনই সদর্থক নির্দিষ্ট নয়, সর্বদাই নঞর্থক—নেতি নেতি—অনির্দিষ্ট। যত যন্ত্রণা এই এখানেই গজায়। এই এটা-নয় ওটা-নয় আমিটার পাশাপাশি এটাই-ওটাই আমি জাগ্রত চেতনাকে দখল করে থাকে। তাই কিছুটা চেনা বেশিটা অচেনা আমি নিয়েই আমাদের কারবার।

আমির এই কারবারে সকলেরই লোকসান বাঁধা। এই লোকসান থেকেই যন্ত্রণার শুরু। আমরা সকলেই বলি: আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার চাকরি, আমার সংসার, আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে, আমার বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি। এক ধরনের মালিকানা, তাদাত্ম্য প্রকাশ পায় এই সব পজেসিভ আমি-র প্রকাশে। সদর্থক। আবার আমার হাত-পা, আমার দুঃখ-কষ্ট, আমার চিন্তাভাবনা — এরকম যখন বলি তখন বিভেদ, স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছিন্নতাও তো ভিতরে ভিতরে প্রকাশ পায়। নঞর্থক।

এই সদর্থক মালিকানাযুক্ত আমি আর নঞর্থক বিচ্ছিন্নতাকামী আমি-র টানাপোড়েনে আমাদের বেশির ভাগটাই দীর্ঘজীবন ধরে আমির সুতোটাকে জাটাইয়ে জড়ো করতে থাকি। একটা নিটোল আমির কোকুন তৈরি হয়ে যায়। দু'চার জনই আছেন যাঁরা এই প্রথম অংশের সদর্থক আমিকে ছড়িয়ে দেন, নিজের বাইরে প্রসারিত করে দিতে পারেন। পরিবার ছাড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম

হারিয়ে দেশে, দেশ হারিয়ে বিশ্বে প্রসারিত করে দিতে পারেন। এই করতে গিয়েই তাঁরা তাঁদের নঞর্থক আমিকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্ত করে সমাজ্ঞরতার অচরণে সদর্থক করে তোলেন —সর্বভূতে নিজের আত্মাকে দেখতে পান। লাইনের নোঙর ছেড়া আমি বিশ্বের কুনেটে নিজেকে হারিয়ে নিজেকে খুঁজে পায়, কোকুনের নিরাকার অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রজাপতির মতো মুক্তাকাশে সত্তা হয়ে ওঠেন। এঁদের সংখ্যা এতোই কম যে এঁদের ব্যতিক্রম বলে, অ-স্বাভাবিক বলে পাশ কাটাই অথবা জন্মদিনে মৃত্যুদিনে ফুলের তোড়ায় আর করজোড় পূজায় এঁদের অ-মানুষ করে দেবতা বানিয়ে ছাড়ি। নিজের দায় পূরণ হয়, যন্ত্রণা কমে যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা নিজ নিজ লাইটাই-আমির নিটোল আশ্রয়ে, কোকুন-আমির নিরাকার মেরাটোপে প্রবেশ করে আমি-তে তা দিতে থাকি।

এই তা দিতে থাকি বলেই 'ভূতের বেগার খাটি'। নিজে নিজে যখন ভাবি তখন মনে মনে বলি : অপরের মুটি মজুরী করে করেই জীবন গেল, পরের কারণে নিজের সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। আর যখন সেই অপরকে সামনে পাই তখন বলি : তোমার জন্যেই আমার কিছু হল না। ভূতের বেগার খেটে খেটেই জীবনটা গেল। এই তুমি কখনও স্বামী কখনও স্ত্রী, কখনও অন্যকেউ কখনও অপর কেউ।

এখানেই শেষ নয়। বরং বলা যায় এখানেই শুরু। একটা সময় আসে যখন জৈব আমির সঙ্গে 'ঈশ্বর' আমির বিরোধ বাঁধে। তাণ্ডব শুরু হয় তখনই। তখন লোকসানের আর শেষ থাকে না, যন্ত্রণার আর তল পাওয়া যায় না। তখন প্রত্যেকেই হিংস্র নেকড়েরা ভীত হয়ে কপালে করাঘাত করে আর ভূতের বেগার খাটার অনুশোচনা করে। সারাটা জীবনই তো জৈব বেঁচে থাকার সংগ্রামে উঠে পড়ে লেগে থাকতে হয়। শৈশব বলে নির্দেশ আসে – প্রস্তুত হও, শেখাপড়া শেখ, হাতেকলমে কাজ রপ্ত কর, রসদ সংগ্রহের পথ-প্রক্রিয়া নিশ্চয় কর। প্রৌঢ় বেলায় সংশয় যাই—সব কাজ ঠিক ঠাক মতো করা হয়েছে তো? কড়াই-পড়াই-মাইতি কাজ মেটাতে দৌড়ঝাঁপ লেগে যায়, মেলে আসা জীবনের নড়বড়ে অংশগুলোকে সারাই-সংস্কার করতে হয়, তাপ্পি-তাপ্পি দিতে হয়। তখনই ধরা পড়ে যায় যে যতো আঁটো-সাঁটো করেই জীবনকে বাঁচা হয়ে থাকুক না কেন সেই জীবনে ফাঁক-ফোঁকর থেকেই গেছে। অক্ষমতার জ্বালা, ভয়ের বীজ আর ভবিষ্যতের আশংকা তখন তোলপাড় করতে থাকে। বাধক্য যোষণা নিয়ে আসে—জৈব বাঁচাটা বাঁচতে গিয়ে নিজের আসল বাঁচাটার সময়ই পেলে না। তখনই মনে হয় যে সারাটা জীবনই পরের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল, ভূতের বেগার খেটে এলাম।

নিজেকে নিয়ে যারা সময় মতো একা একা হতে পারে, মিটিং করতে পারে, যারা জৈব বাঁচার মধ্যে মধ্যে এবং বাইরে নিজের মূল্যবোধের, আদর্শবোধের বাঁচাটার কথা ভাবতে পারে তারা সময় থাকতে থাকতেই সময়কে কাজে লাগায়। বেশিরভাগই তো জীবনের প্রস্তুতিপর্বে প্রবৃত্তি নিয়েই উর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ত থাকে বলে জীবনকেই দেখতে পায় না। সংসার পর্বে, সংসারের অক্টোপাস বেষ্টনে আপাদ্য হয়ে ভেসে-ডুবেতে ডুবে যায় বলে নিজের সন্ধানে সময় দিতে পারে না। প্রৌঢ়াবস্থায় জীবনের জাবেদা খাতাখানা খুলে বসে হিসেবের ধারাপাতে লাভ-লোকসানের খতিয়ান করতে গিয়ে জীবনের গরমিল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। দীর্ঘশ্বাস বাঁধকের কথা ছেড়েই দিন। এক বোবা কুইনিন মুখে তেমাথা জীবনে পুরো জীবনটাই তখন ডেবিটের ঘরে চলে গেছে।

এমন হবার কথা নয়, তবুও হয়, হচ্ছে। কেন? মনে হয় আসল মারটা প্রকৃতির হাতেই আমরা খেয়ে থাকি। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির হাতে। দুই জায়গায়ই নিয়মের রাজত্ব—উঠিতেও নিয়ম, বসিতেও নিয়ম। জড় প্রকৃতি, প্রাণিপ্রকৃতি এবং সব শেষে মানব প্রকৃতি। জড়ের মধ্যে প্রাণের ধর্ম নেই, প্রাণের মধ্যে মনের নিজস্ব গুণটি নেই। অথচ বিপরীত ক্রমে ব্যাপারটা একরকম নয়। মন যেখানে আছে সেখানে প্রাণও আছে জড়ও আছে। মানুষের বেলায় তাই তিনটি ধর্মের, স্ব-ভাবের, টান আছে। তাই মানুষ ভূতের মার খায়, প্রাণ ধর্মের জৈব পীড়ন সহ্য করে। শুধুমাত্র মনের মনন নিয়ে থাকাটা তার প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়। এইখানেই তার মার খাওয়ার উৎসটি খুঁজে পাওয়া যাবে। নিজের অস্তিত্বের জন্যে ভূতের বেগার খাটতে হবে, বাঁচার জন্যে প্রাণধারণের সব যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই দুই জড়-জৈব টানের বাইরে তার যে মন, মনের নিজস্বতা, তাকে নিয়ে একা একা হওয়ার সময় বা সুযোগ তার কতটুকু? মন একটা আছে, সেই মনের অনুভব আছে, আছে মূল্য এবং আদর্শবোধের একটা অস্পষ্ট উপলব্ধি। কিন্তু এ-সবই মাধ্যাকর্ষণের মতো জড়-জৈবাকর্ষণের অনিবার্য টানে 'নিম্নমুখী', ধরার ধূলির ধূসরতার মাখামাখি হয়ে যায়। আদর্শ আর মূল্যবোধের 'গ্যাস' একমাত্র মনকে ঊর্ধ্বমুখী, স্ব-মুখী করে তুলে, বেগার খাটার অনুভব থেকে মুক্তি দিতে পারে, প্রাণের মুষ্টিগিরির মধ্যেও মনের অক্সিজেনের যোগান দিতে পারে।

পারে, এবং নিয়ম লঙ্ঘন না করেই পারে। যান্ত্রিক নির্ধারণবাদ, অ-যান্ত্রিক অনির্দেশ্যবাদ আর স্ব-নির্ভরবাদের বাদানুবাদে না গিয়েও বলা যায় মনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মানুষের জীবনে, স্ব-নির্ভরতা নিয়মেরই নিয়ম। একটা সাধারণ সার্বিক বিশ্বনিয়মের মধ্যে অন্যান্য শত শত বিশেষ নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম। জৈব নিয়ম যেমন জীবনের ক্ষেত্রে সার্বিক নিয়ম, মনের নিজের এলাকায় মননের নিয়মও তেমনি মনের নিজস্ব নিয়ম।

কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য যে তার এই মননের নিয়ম প্রতিনিয়ত জৈব নিয়মের খেলায় পীড়িত হতে থাকে। শৈশব-বাসনা যদি পড়ার বই থেকে খেলার মাঠে মন দেয় শিশু-বালক তাহলে প্রবৃত্তি মার খায় বলে অভিভাবক-সমাজ রক্তচক্ষুর শাসনে ধেয়ে আসে। প্রান্তরের সবুজ আর আকাশের নীল মনের খাদ্য হিসেবে যতো পুষ্টিকরই হোক না কেন জীবনের তুষ্টিতে অবান্তর-অপ্রয়োজনীয় বলে পরিত্যক্ত। ছাত্র জীবনে প্রাণাবের জেলখানার বাইরে মনের প্রাঙ্গণে যদি প্রভাত বেলার রবির কর প্রবেশ করে তাহলে মনের মনন সিঞ্চিত হয় ঠিকই কিন্তু প্রবৃত্তি বঞ্চিত হয় বলে মনে করা হয়। যে বালকের প্রাণের পর প্রভাতের রবির কর কেমনে পশিল বলে প্রশ্ন জাগে সেই বালক জড়-জৈবাকর্ষণের বাইরে, ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে—মনেরই নিয়মে। যাদের মনের চারদিকে প্রবৃত্তির চাহিদার বেড়া আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা থাকে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে 'বেগার খাটা' ছাড়া আর কোন অনুভব ঘটতে পারে?

একই ভাবে যে তরুণ অন্তরের কাব্য অনুভবে অবগাহনের পরিবর্তে ইতিহাস-ভূগোলের গভীর অরণ্যে পথ হারায়, যে যুবমানস সুন্দরের প্রেতনাকে তৈলতভুলের আরাধনায় কবর দেয় আর যে মগ্ন জীবন মঙ্গলের অনুধ্যানে সময় না দিয়ে ভোগের পলা-যোগানে হাবুডুবু খায় তাদের মনের মরণশীল অংশ সময় কালে মুক্তি পায় না বলেই অসময়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে—সারাটা জীবনই ভূতের বেগার খেটে গেলাম। ছোটবেলা থেকে এই যে সত্তার জানালা-দরজার চাইতে বাস্তবের

প্রকৃতির মেরাইপে কৃষি আর ব্যাবসার অধিকা, পরিবার সুন্দরের চাইতে পরিবারের অভ্যন্তরের জৈব জীবনের তীব্রতর টান আর সমাজের মঙ্গলের চেতনার চাইতে বাণিজ্যিক জীবন-ব্যবসার হিসেবের ঝোঁক—এখানেই মুষ্টি মজুরীর বীজ বোনা আছে। একটা জীবন দুবার বাঁচা যায় না। তাই শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ছবের নিজ নিজ মাথার চাঁক ফেলা ছাড়া আর গতি কি?

বইয়ের পাতা মুখস্থ করতে গাছের পাতার সবুজকে হারাই, জীবনের জ্ঞানকে গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে আকাশের নীলকে হারাই, আর শেষ বেলায় হিসেবের খাতায় মুখ ডুবিয়ে শান্ত-স্নিগ্ধ সান্নিধ্যটুকু হারাই। এই হারাই বলেই চেঁচিয়ে উঠি—সবকিছুই বেগারে গেল, ভূতের বেগারে।

সব সমস্যাকেই যেমন মাইক্রো এবং ম্যাক্রো দৃষ্টিতে দেখা যায়—ক্ষুদ্রসূক্ষ্ম এবং বৃহৎ-ব্যাপক প্রেক্ষিতে দেখা যায় তেমনি এই আত্ম-পর—নিজের আপন আর বাইরের অপর হিসেবেও দেখা যায়। এতক্ষণ প্রথম দেখাটাই চলছিল। এবারে একবার বৃহৎ-ব্যাপকে বা বাইরের অপর-দৃষ্টিতে দেখা যাক।

ওনেছি একটা আরশিন তৈরি করতে কম করেও ছত্রিশটা পর্যায় পার হতে হয়। হিসেব সঠিক হলে এ পর্যায় সংখ্যা তিনশ-ছত্রিশ অথবা আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে তিন হাজার ছত্রিশ হতে পারে। তা, একটা ক্ষুদ্র আরশিনেই যদি এমন জটিলতা—জটিল এবং বহুবিধ প্রক্রিয়ার সমন্বয় অনিবার্য হয়—তাহলে একটা জ্যান্ত আমি তৈরি হতে ব্যাপারটা কতোদূর গড়াবে কে জানে। সংখ্যায় আর ক্ষণ পরিমাণের হদিস পাওয়া আমার কর্ম নয়। এই আমি যখন কোন কাজ করে—কাজ তো তাকে প্রতিনিয়তই করতে হয়—তখন তাকে কতো জনের সঙ্গে, কতোভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে হয় তার বোধহয় লেখাজোখা থাকে না। আমরা রোজ বাজার করি, অফিস যাই এবং তিনবেলা আহার এবং একবেলা ঘুমে কাটাই। [ঘুমের বেলায় এবং আহারের ব্যাপারে মতান্তর হতে পারে! তা, হতে, সেই মতান্তরে, আমাদের বক্তব্যের কোনো ফেরফের হবে বলে মনে হয় না!] যিনি পনেরো মিনিটে চৌপট বাজার করে ফেরেন আর যিনি দুপেদুপে পথের মাঝে, দোকানে দোকানে অফিস, সমাজ আর রাজনীতির আলোচনা বিনা পয়সায় কেনা বেচা করেন, তাঁদের দুজনই কম-বেশি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে যান। একই ভাবে অফিসে যেতে এবং অফিসে গিয়ে, বেড়াতে পথে এবং পরবো গিয়ে, ব্যাবার আসরে দর্শক হয়ে অথবা নট-নটী সেজে হাজারো ক্রিয়ায় এবং লক্ষ প্রতিক্রিয়ায় আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলি, ছড়িয়ে দিই। যে কোন কাজেই আমরা আমাদের নিজ নিজ আমি ওনোকে অনেক অনেক অন্য আমি-র সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে প্রসারিত করি, প্রতিনিয়তই করে থাকি। সব সময়ে যে সচেতনে ঘটে তেমনও নয়, তাই অপরাপর আমি ওনোকে আমরা আয়ত্ত করে নিতে পারি না। পারি না, এবং অনেক সময়ে বিরূপতার কারণে করে নিতে হয়তো চাই না। অন্য আমি ওনো হারিয়ে যায়, হারিয়ে ফেলি। তবে, আমাদের আমি ওনোর প্রসারণ ঘটে—তা সঙ্কুচিত প্রসারণ অথবা প্রসারিত প্রসারণ হতে পারে। আমাদের ইচ্ছার জগতের—ইউনিভারস অব ডিস্কোর্স-এর যেমন ব্যাপ্তি ঘটে অনেকটা তেমনি এই আমি-জগতের ব্যাপ্তি।

আমি-র দ্বিত্বও এখানে দ্বৈধও এখানে। ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম-মহৎ আমির জড়-জৈব আকর্ষণ এতোই প্রবল যে বৃহৎ-ব্যাপক আমির প্রসারে সে পিছটানের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। ঘাস পোরা বেরুন হয়ে আকাশের নীলে উঠে যাবার জো থাকে না। সেই জড়-জৈবের অনিবার্য আকর্ষণের টানকে আমরা সারাজীবনই অনেক অনেক বার কাটিয়ে উঠতে চাই। চাই এবং মাঝে মাঝে আদর্শের আর

মুমূর্ষুবোধের গ্রাসের চাপে আমির সুতোকে লম্বা করে, মাটাইতে বাঁধা ঘুড়ির মতো, কাছে দূরের আকাশকে অনুভবও করে ফেলি। এই উড়ন্তনের সুযোগ ঘটে বলেই আমরা, মনের মননে এই বৃহৎ-ব্যাপ্ত আমির ছোঁয়া লাগে বলেই, আমরা বিস্ময় বোধ করি। ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম আমির অহংবোধে ক্ষুব্ধ বোধ করি। তখনও কিন্তু মনে হতে পারে 'সারা জীবনই ভূতের বেগার খেটে মরলাম'। হতে পারে কারণ ব্যাপ্ত-বৃহৎ আমির স্বাদ দু একবার তো অন্তত আমাদের সকলের জিভেই—মনের জিভেই টের পেয়ে গেছি।

আগে দেখেছি মাটাইয়ের নিয়ন্ত্রণে আমি অথবা কোকুনের আকাশহীন বদ্ধ দশায় আমি কেমন বেগার খাটার যাতনায় ক্লিষ্ট বোধ করে; এবারে দেখলাম প্রসারিত-ব্যাপ্ত আকাশ-আমির বেদনা। ক্ষুদ্র আমি আর বৃহৎ আমির এই দ্বিত্ব আমাদের প্রকৃতির দান। দ্বিধা-দ্বন্দ্বও তো হাই এই দুই বিপরীত আমির আকুল পাওনা। জড় জৈবের মুটে-মজুরী যেমন আমাদের স্ব-ভাবের প্রকৃতি-লিপি, ঠিক তেমনি ক্ষুদ্র কুণ্ডে পাক খাওয়া বলদের মতো—কলুর বলদের মতো—বাইরের প্রসারিত আমির দেখা পেয়েও প্রসারিত-ব্যাপ্ত না হতে পারার বেদনাও আমাদের স্ব-ভাবের দান। এই বিরোধের ফাঁদে পড়ে, দ্বন্দ্বের ফাঁদে পড়ে আমরা সকলেই এক একজন বগা—ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দে রে!

এই ক্রন্দনের অপর নাম, একটি প্রকাণ্ড—ভূতের বেগার খাটা। অপরের বিপদে মারা ছুটে মারা তারা নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়; ভাইয়ের বিপদে ভাই নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ক্ষুদ্র আমির কোকুনে নিরাপদ হতে পারে, আবার সেই ভাইই নিরাকাশ ক্ষুদ্রতার মোরাটোপ ছিঁড়ে ব্যাপ্ত-বৃহৎ ভালবাসার আকাশে জীবনের নীল আর প্রাণের সবুজকে স্পর্শ করতে পারে। মারা পারে তারা বেগার খাটে না, অপরের জন্যে নিজেকে 'নাই' করে না। বরং নিজেকেই বড় করে পরিপূর্ণ পরিব্যাপ্ত করে তুলে পারা। মারা পারে না তারাই গৃহ-বন্দি হয়ে বাইরেটাকেও হারায়, ভিতরটাকেও দূষিত করে তোলে। এবং এরাই পড়ন্ত বেলায় কপালে করাঘাত ক'রে অদৃষ্টের নিন্দা করে। নিন্দা করে, ধিককার দেয় আর বলে—মুটে মজুরী করেই জীবনটা গেল, ভূতের বেগার খেটেই জীবনটা নষ্ট হল।

সংগ্রহের সিন্দুকে—এখন অবশ্য ব্যাঙ্কের পাশবুকে আর কম্পানির কাগজে—বহুমূল্য সম্পদতাকে জমা করতে করতে কখনই মনে হয় না যে অর্জনের ঘরে শূন্য থেকে গেল। জড়-জৈব আমির ভোগ তৃপ্তিকে স্ফীত করতে করতে মন-আমির দিকে নজর দেবার সময় জোটে না। পড়ন্ত বেলায় যখন জড়-জৈব আমির আকর্ষণ ক্রমশই কমতে থাকে আর মন-আমি নিজ নিকেতনে ফিরে তাকানোর অপ্রতিরোধ্য অবকাশ পায় তখনই নিজ নিজ করতল ধোয়া যেতে চায় কপালের তাগাদে, অথবা কপাল খোঁজে দেয়ালের কঠিনতা—কপাল চাপড়ানো অথবা দেয়ালে কপাল ঠোকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। আর সেই সঙ্গে নীরব চিৎকার অনুতাপের কষ্টে নিজেকেই ধিককার দিতে থাকে—ভূতের বেগারে, অপরের মুটেগিরিতে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

গল্পের অন্তপানী ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী—অন্যের শ্রাদ্ধের দান ও আহার গ্রহণ করতে করতে একদিন নিজের সন্তানের শ্রাদ্ধের দান-আহারে মহানন্দে পাত পেড়েছিল। আমরা বেশিরভাগই এক একটি পূর্ণ চক্রবর্তী। ভোগের লালসায়—কনজিউমারইজমের তাড়নায়—সর্বভুক-সর্বভোগী হয়ে কবে যে নিজের নিজের আমিটাকে শুদ্ধ হজম করে ফেলি তা টেরই পাই না। ক্ষুদ্র আমির কোকুনে

আটকা পড়ে বৃহৎ আমিকে অবহেলা করি, প্রকাশে বাধা দিই এবং অবশেষে একদিন তাকে হত্যা করে জৈব জড়ত্বে পৌঁছে নিস্তরঙ্গীর পড়ে হাঁপিত্যেস করে বসে থাকি। বসে থাকি আর নিজেকেই অভিশাপ দিই—ভূতের বেগার খেটে খেটেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল!

অনেকে অবশ্য নিজ নিজ সন্তান সন্ততির মধ্যে নিজের মনের প্রসার ঘটিয়ে বাঁচতে চান। স্বাভাবিক। বৃহৎ আমির ব্যাপ্তি না পেলেও ওঁরা একটা পারিবারিক আমিতে সুখের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করেন। ব্যাপারটায় মনের ব্যাপ্তি ঘটে না, স্বার্থের বৃত্ত-টি বাড়ে মাত্র। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে প্রকৃতির সবুজ আর আকাশের নীল আছে-তার টানে নয়, ভবিষ্যতের অনিবার্য অক্ষম দিনের সুরক্ষার টানেই এই প্রসারটুকু ঘটে। তাই এই প্রসার নেহাতই জৈব-জড় চেতনার ফসল, অত্যন্ত স্বার্থগন্ধযুক্ত। তাই এই ব্যাপারটা সর্বজন বিদিত হয়ে ধরা পড়ে যায়—অবশ্যই মনে মনে। জীবনের বেলা যতো বাড়ে ততোই এই সব স্বার্থ-ভূতের আপনরা ক্রমশই অপর থেকে পরে নির্বাসিত হতে থাকে, আঘাতের পর আঘাতে তখন কপালে 'কড়া' পড়ে যায়, অবস্থার কোনো ইতরবিশেষ হয় না।

নিঃস্বার্থ প্রসার না দিতে পারলে মন নিজের নিকেতন খুঁজে পেতে পারে না। ভালবাসার সার্থকতা ভালবাসাতেই, স্বার্থের পুঁজিতে যে ভালবাসা, ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক লাভ লোকসানের হিসেবে যে ভালবাসা তা মনকে ছড়িয়ে দিতে পারে না, প্রসারিত করতে পারে না। আমরা ফুলকে ভালবাসি, প্রকৃতিকে ভালবাসি, সুন্দরকে ভালবাসি। নিঃস্বার্থেই ভালবাসি। এদের ভালবাসি এরা মনোহরণ বলেই, কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নয়। সন্তানরা যখন ছোট থাকে, শিশু থাকে, নিষ্পাপ সুন্দর থাকে তখনও তো তাদের আমরা সর্বসংস্কারমুক্ত মনে সর্বপ্রত্যাশা শূন্য চিত্তে আবাহন-অভিবাদন করতে পারি না! ছেলে-মেয়ের বিভেদ তুলিতে কারণে, বর্ণের এবং অঙ্গ-সংস্থিতির হেতুতে ভিন্ন-মন হয়ে পড়ি। স্বার্থের প্রবাহটা ফল্গুধারার মতোই বহমান থাকে—হয়তো ততোটা বাহ্য প্রকাশে বাস্তব হয়ে ওঠে না। শিকড়ে ওঠে না বটে কিন্তু প্রত্যাশার স্বার্থের বীজটি যে অনিবার উপ্ত ছিল তা টের পেতে বড় বেশি বিলম্ব হয় না। মা-বাবা বৃদ্ধ হলে ছেলে-মেয়েরা [মেয়েরা?-ও?] দেখবে—এমতো একটা আশা, বা, বলা ভালো, প্রত্যাশা কারো কারো মনে সোচ্চার জানান দেয়, কারো কারো মনে অনুচ্চার প্রবাহিত থেকে যায়। একটা ভয়-ভয় ভাব তাই এদের তাড়িত করে। একটু সমীহ করে আচার-আচরণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে, বৃদ্ধাবস্থা যতো বেশি বেশি অসহায়তার দিকে গড়ায় পান-থেকে-চুন খসার প্রবাদটা ততো বেশি বেশি স্মরণ হতে থাকে।

তাহলে কি একথা বলা ঠিক হবে না যে আপনজনেদের মধ্যে যখন আমরা নিজেদের ছড়িয়ে দিই তখনও নিজেকে ছাড়িয়ে যাই না, যেতে পারি না। ফুলের বেলায় যেমন, মানুষের বেলাতেও যদি তেমন প্রত্যাশাহীন, স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসায় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলেই ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। নরমে তারার যেমন মিটি মিটি করে চোখ, তেমনি যদি শুধুই নরমে, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসায় আমাদের আমিগুলো অপরের দুঃখে কষ্টে মিটিমিটি ক'রে সেই অপরের দিকেই বেয়ে যেতে পারে, দৃষ্টিপাতে নিজের প্রসারকে সম্ভব করে তুলতে পারে তাহলে ভূতের বেগার খাটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনের যাথার্থ্য কিছু করার চেতনায় সার্থক সুখ ছুটতে পারে।

এখানে একটা কূটতত্ত্ব পাতা আছে। স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। হক

কথা, একেবারে ঠিক কথা। আবার মানুষই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারে, করেও থাকে। এটাও হক কথা, ঠিক কথা। তাহলে? স্ব-বিরোধ, না আপাতবৈপরীত্য-প্যারাডক্স?

বসত বাড়ির সীমানা ছয় টঙ্গি বাড়াতে পেরে স্বার্থ সিদ্ধি হয়, আনন্দবোধও জন্মে। চাকুরে ছেলেকে তোয়াজ করতে তার জন্মদিনে উপহার দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে লগ্নি করতে পারি, অথবা পুত্রবধূকে তার জন্মদিনে বেনারসী দিয়ে। এখানে প্রত্যাশা-স্বার্থ সিদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা। ছেলেকে যে আমরা অনেক যত্ন নিয়ে বড় করে তুলি, পড়াশুনো শেখাই, মেয়েকে নয়, তাও তো এই লগ্নি মানসে! কতো জনের কাছেই তো যাই, মাঝে মাঝে যাই অথবা অনেক দিন পরে হঠাৎ যাই। একটা স্বার্থ ছাড়া এসবের কোনোটাই তো আমরা করি না। "বলুন, কি মনে করে এলেন?" অথবা "কায়সে আনা হুয়া?"—এ ধরনের প্রশ্নে আমরা আমাদের মনের ইচ্ছা, মতলব, স্বার্থ অনায়াসেই টের পেয়ে যাই, দেখতে পাই।

এবারে একটু অন্যভাবে দেখা যাক। প্রান্তরের পথে একা এক আর্ত জন। মরণাপন্ন। আপনার শত তাড়া আর শতেক কাজ। মনে আপনার বেদনাবোধ, ঐ মুমূর্ষুর জন্যে। আপনি তার চিকিৎসার জন্যে চেষ্টা আর সময় দিলেন। কোনো লগ্নি নয়, আনন্দ পেলেন। তৃপ্তি, যেন একটা উত্তরণ ঘটল আপনার। এটাও তো স্বার্থ সিদ্ধি—মনের উপস্থিত বেদনাবোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল আবার সার্থক সমাধানে আনন্দ উপভোগ।

আবার, মনে করুন, পথ দুর্ঘটনা। বহুজনের হাহুতাশ। এক-দুজনই এগিয়ে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঁচাতেই হবে। যেন পণ। [সকলেই তো দুর্ঘটনাগ্রস্তের গলার সোনার চেন, পকেটের মানিব্যাগে দৃষ্টি এমন নয়!] যেমন উচিত তেমন করে হয়তো তারা হারিয়ে গেল। আর কিছু নয় শুধু মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা, এগিয়ে যাওয়া। হয় না? হয় এবং হবেও। এদেরও কি একই রকম স্বার্থ নয়? সেই মনের বেদনা বোধ, অথবা মনুষ্যত্বের দায়ভার, অথবা আনন্দের আহরণ। উত্তরণ এখানেও।

এক কথায় বলা যায়। কাজের চালিকা শক্তি যেখানে জ্ঞাত-অজ্ঞাত প্রত্যাশা সেখানেই স্বার্থ। কাজের প্রেরণাশক্তি যেখানে আনন্দ সেখানেই উত্তরণ, নিঃস্বার্থ। মনের বেদনাবোধ যখন ছন্দে-বাক্যে প্রকাশ পায় তখন তা আনন্দের, তাই নিঃস্বার্থ। স্বীকৃত কবি সাহিত্যিক যখন কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রত্যাশায় কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করেন তখন তা স্বার্থ। পল্লবের আড়াল ছেড়ে কুঁড়িটি যখন পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে তখন তা প্রকৃতির আপন নিয়মেই ঘটে। আমরা বলি আনন্দের প্রকাশেই ঘটে। প্রত্যাশা ছাড়াই ফুলের এই পাপড়ি মেলাটা ঘটে যায়। ঠিক তেমনিই শিশুর বেড়ে ওঠাটার মধ্যেও কোন স্বার্থ গন্ধ নেই, আছে লালন পালনে, যেমন, ফুলকে নিয়ে মালী যখন দোকানে-বাজারে যায়।

বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে জৈব জড়ের নিয়মে প্রত্যাশার কারণে স্বার্থপর, আবার মানব-প্রকৃতির আপন অন্তরের নিয়মে আনন্দেরও পূজারী। এই প্রেরণার উৎসেই তার আপনাতে উত্তরণের পথ। ভূতের বেগার খাটার হাত থেকে মুক্তি।

পথ তো আছে, ইচ্ছা এবং চেষ্টাটাই মার খেয়ে যায়, অভাব পড়ে যায়। তাই তো কপালে করাঘাত অনিবার্য ঠেকে। সারা জীবন নিজেরাই জৈব জড় অস্তিত্বের মুটে মজুরী করতে করতে, খিদমদগারি করতে করতে আর সময় থাকে না যে নিজের মধ্যে যে অ-ভূত অ-জৈব আমিটি আছে

তার কাছে দুদণ্ড বসি, তাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। সময় আসে সময় পার করে দিয়ে। এটাই বোধহয় আমাদের সুইটেস্ট সঙ!

মন এক মন্তর

কথায় বলে লোকে তিন ভাবে শেখে—শুনে, দেখে আর ঠেকে। যাঁরা শুনেই শিখতে পারেন তাঁরা উত্তম, যাঁরা দেখে শেখেন তারা মধ্যম আর আমরা যারা ঠেকে শিখি তারা অবশ্যই অধম। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে আমরাই দলে ভারি। এবং সুদূর অতীতের কথা জানি না, হাল আমলের কথা অবশ্যই জানি—এবং, অবশ্যই, ঠেকে জানি। জানি যে দলে ভারি হতে পারলে, পরিচিতের দলে সামিল হতে পারলে, সব কিছুই সহজ হয়ে যায়, তর্-তর্ করে এগিয়ে যাওয়া যায়। ঠেকে শেখাটা তাই অধমের পর্যায়ে পড়লেও মানাতাদা উত্তমের মাথার উপর দিয়ে যায়।

ঠেকে শেখার সম্ভারে আমরা কেউই কম যাই না। তার মধ্যেও যে শত বার ঠেকে ঠেকে আর সহস্রবার ঠেকে খেয়েও সঠিক শিখতে পারলো না সে আর কেউ নয় আমাদের নিজ নিজ 'মন'। এতো কাছের, এতো আপন এবং দিনান্তে এতোবার তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তা সত্ত্বেও মনকে জানা বা বোঝা কতজনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে? আমি তো নিশ্চয় করে বলতে পারি আমার পক্ষে তা এখনও সম্ভব হয় না, আর হবে কি না তাও আমার সন্দেহের বিষয়। বহুবারই ওকে নিয়ে ঠেকেছি, ঠকেছি এবং ঠেকে খেয়েছি, আরও শতবার সেই একই ঘটনা ভাগ্যে লেখা আছে তাও জানি কিন্তু কোনও দিন যে ওই মনটাকে নিজের মতো করে জানতে-বুঝতে-চিনতে পারব তার সুদূরতম সম্ভাবনাও মনের কোনে স্থান দিতে পারছি না।

মন একটা মন্তর, মন্তর বললে অনেকেই রাগ করতে পারেন। কিন্তু রাগ করেও মনে মনে স্বীকার করে নেবেন। মন্তর কেন? কারণ ভাগ্যে থুক না লাগে ঢাকা! কাউকে নিজেদের দলের বানাতে চান তো মনকে পাকিস্তানী মন্তর করে তুলুন। মনের গভীরে আপনার আসল উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রেখেছেন আর বাইরে মিষ্টভাষী বা মাখন ডবুর স্বাদ ছড়িয়ে দিন। মন্তরের মতো কাজ হবে। বোকারা বুঝে যাবে আপনি যা বোঝাতে চান, যা আপনি জানাতে চান, যেমন আপনি চেনাতে চান। ব্যাস্।

কেবলমাত্র অপরের কাছেই বা কেন আপনি প্রয়োজনে মনের দ্বার হাত পাতুন দেখবেন সভ্যতার সর্বদায়, কৃষ্টি-সংস্কারের সকল দায়িত্ব কেমন অবলীলায় সমাধান করে যাবে আপনার মন, নিজেই অভিভূত হয়ে পড়বেন মনের ক্ষমতা দেখে। মন্ত্র যেমন পশু তৈরি করতে পারে, অস্ত্র তৈরি করতে পারে তেমনি দেখবেন ফরমাস মতো আপনার মন কেমন অনায়াসে 'সভ্য'-তার নিটোল আবরণটি তৈরি করে আপনার প্রকৃত মনোভাবকে আড়াল করে দেবে, দেখবেন কেমন নিটোল অস্ত্রটি মাখনে-ছুরি করে অপরের মনটাকে নিরোধ হতো করে দেবে, কিন্তু সে টেরও পাবে না। তাই বলছিলাম যে মন মন্তর ও যেমন মন্তর ও তেমনি।

মন একটা গোলকধাঁধাও তো বটে! মনের মধ্যে মন, আবার তারও মধ্যে মন আছে। ভাবেই বুঝুন! মন তাই ত্রিশিখীর মতোই শুধু নয় তার চাইতে বেশি কিছু। কারণ সে আছে, আমাদের মধ্যেই অবস্থান করে চলেছে, কিন্তু তার হাল-হকিকৎ তত্ত্ব-তালাশ অজ্ঞাত। বাইরে থেকে ঘাড় মটকালে তবুও টের পাবার, আগে থেকে তৈরি হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে আছে আপনি মেরে অন্তরের অন্দরে, অন্তঃকরণের কন্দরে, সে যখন ঘাড় মটকাবে? কে আমাদের মুখ

ফসকিয়ে দেয়? নাম-ভুলিয়ে দেয়? যেখানে যা বলার কথা তা বলতে দেয় না, যেখানে যা বলার কথা নয় তা ঝরঝর করে বার করে আনে। স্থান-কাল-পাত্র মানে না, বিপদে ফেলে অকারণে বিপন্ন করে কে? অথচ সেই মনকেই দুধ-কলা দিয়ে নিরন্তর পুষে চলেছি, বাধ্য হয়েই!

নিজ নিজ মন নিয়ে প্রত্যেকেরই দেনদার শেষ নেই। সব প্রয়াস তাল থাকতে চাই, কিন্তু মন তা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে। মন-মরা অবস্থা কে ঘটায়? অসাফল্য তো জীবনে বাস্তব সত্য, সকলেরই তা ঘটে। কষ্ট-যন্ত্রণা-বেদনা-বিষাদ কার নেই জীবনে? এ-সব সাদামাঠা সত্য আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু মনটি টুক করে depression ঘটিয়ে আপনার জীবন কেমন বিষাদময়, সাঁতসেঁতে, নিষ্প্রভ করে ছাড়বে! অফিসে দেরি কার না হয় বলুন? ট্রেন লেট, বাস তিলধারণে অক্ষম, রাস্তায় নদীভূমীর মতো যান-জট। জানা কথা, এ-সবই নিত্য-নৈমিত্তিক। কিন্তু দেখবেন ভিতর থেকে আপনাকে Stress আর Strain-এর টান টান দহনে জ্বালাচ্ছে। কে? আর কে, সেই অকাজের কাজী মন! কেন বাবা এহেন ব্যবহার? যা স্বতঃ সিদ্ধ, জানা-কথা তা নিয়ে শরীরের পেশী আর হৃদপিণ্ডের দম নিয়ে টানাটানি করা কেন?

ছেলে অফিস থেকে ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেল, মেয়ে এখনো, এতো রাতেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরল না, স্ত্রী বিকেলের চা রাতের অন্ধকারে নিয়ে এলেন—কতো কি ই তো ঘটছে, ঘটবে, ঘটতে পারেই। হাজারো কারণও তার থাকতে পারে, থাকেই কিন্তু তা হলে কি হবে? আপনার ভিতরের তিনি, আপনার মন, মোচড় মারবে, ঘাই দেবে, অশান্তির একশেষ করে ছাড়বে।

ঠোকে ঠোকে শিখছি যে সহজ পথ কখনই মনের পছন্দ নয়। সোজা রাস্তায় চলার তার মতির অভাব। একটা শিশুতে যা বোঝে, এক এক সময়ে, মন তা বুঝে উঠতে পারে না। আবার এক এক সময়ে এমন বুড়ামি করবে যেন বিশ্বে কোনও কিছুই সহজ নয়, সবই জটিল-কুটিল। যদি-কিন্তু-কেন-তাহলের চাল-চালোয়ার নিয়ে পাহারায় বসে যাবে! সারা জীবন একজন স্ত্রী/স্বামী নিয়ে ঘর করা যায়, কিন্তু এমন একটি মন নিয়ে ঘর করা যে কি কঠিন তা মানুষ কোন ছার দেবতারাই কি ছাই জানেন? (এখানে জনাদিকে বলে রাখা ভাল যে পুরাণে-মহাকাব্যে, ধর্মে-দর্শনে সেই দেবতাদের বিষয়ে যা জানা যায় তাতে তাঁরাও যে নিজ নিজ মন নিয়ে শান্তিতে-সোয়াস্তিতে ঘর করেন তা হলপ করে বলা যায় কি? তাঁদের মতিভ্রমের খতিয়ান মুনিদের তুলনায় কমতো মনে হয় না!)

সব থেকে মুশকিল হল মনের বহুরূপী স্বভাবটাকে নিয়ে। গাছের বহুরূপীই বলুন আর 'ছিনাথের' কথাই বলুন, তাদের এক অঙ্গে বহু-রূপ মাত্র। আর মনের বেলায়? প্রথম তো অঙ্গ বলেই মনের কিছু নেই, আছে রঙ্গ। সেই রঙ্গ আবার বয়সের পর্বে পর্বে নানা রূপে ছলকায়-ঝলসায়-ঠিকরায়। অনেকটাই হিমালয়ের শীর্ষতলে দাঁড়িয়ে সূর্যের উদয়-রঙ্গ-রূপ পরিবর্তনের মতো। সেটা চোখে দেখার বিষয় বলে মনোহর, কিন্তু মনের উদয়-অস্ত কোথায়? তাই সে মনোহর নয় মনো-বিকলনের উৎস হয়ে সারাজীবন চোখ-বাঁধা বলদের মতো এই দেহ-সর্বস্ব আমিটাকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। নিজের মনেরই যখন তল পাওয়া যায় না তখন আর আর সকলের মনের খবর পাবার তো কোথায়?

একটা সোজা পথ আছে বোধহয়। মন নামের এই যন্ত্রর-মন্ত্রর কে অন্য কোথায়ও পাচার করে দিতে পারলে কেমন হয়? খেলার মাঠে, চাকরির টেবিলে, স্ত্রীর খাঁচায়, স্বামীর কলায়, বই-এর পাতায়, সিনেমার পর্দায়? আর যদি কোথায়ও জায়গা না হয় তাহলে সাদা কাগজের বুকে কলমের ডগা দিয়ে? কেমন হয়?

মন-মুখ-মুখোশ :

(১) আমির খোঁজে বিপাকে :

নিজেকে জান, তোমার তুমিকে জান—এমতো একটা কথা বহু তামার বহু জনের কাছেই শুনেছি। শুনেছি শোনার বয়স হতে না হতেই। শুনে আসছি সেই প্রথম বয়স থেকে মাঝ বয়সে পর্যন্ত, মধ্য বয়স থেকে বড় বয়স হয়ে বুড়ো বয়স পর্যন্ত। এখন আর শোনার ব্যাপার নেই একেবারে ভাবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম প্রথম মা-বাবা বলেছেন, পাড়াপ্রতিবেশীরা বলেছেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা বলেছেন। তার পরে দেখেছি প্রবুদ্ধ প্রপিতামহ থেকে বর্তমানের আচার্য-গুরু-চিন্তাবিদরা বলেছেন। গলে-পদ্যে দর্শনে কাব্যে শাস্ত্রে-পুরাণে। শুনেছি, ভেবেছি আর মনে মনে নাড়াচাড়া করে করে নিজের নিজটাকে চিনে নেবার চেষ্টা করেছি। লাভ যে বিশেষ কিছু হয়েছে তা বলতে পারি না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে জটিলতা সবিশেষ বেড়েছে।

ছোট বেলায় বাড়ির মধ্যে ঘর দেখেছি, গ্রামের মধ্যে মাঠ-ঘাট-পুকুর দেখেছি। প্রান্তরে সবুজকে আর আকাশে নীলকে দেখেছি। এখন একটা জীবন ধরে দেখতে দেখতে ঘরগুলোই যেন চোখে ঠেকে, বাড়ি প্রায়ই আর দেখতে পাই না, মাঠগুলোকে ফালি ফালি জমি, পুকুর-আর-ঘাট গুলোকে ডোবা ডোবা দেখায়, গ্রামের যেন আর হদিস খুঁজে পাই না। সবুজ ক্লোরোফিল হারিয়ে কেমন যেন ধূসর, নীল হারিয়ে আকাশ যেন স্তূপাকৃতি অন্ধকার বলে মনে হয়। সব সময় যে এমন হয় তা নয়, তবে মাঝে মাঝেই দেখে শুনে এখন যেন সব কিছুকেই কেমন শূন্য শূন্য মনে হয়। চোখে ছানি পড়ে শুনেছি, মনেও কি ছানি পড়ে? কে জানে!

ছোটবেলায় জামাকাপড় রঙের বাহার দেখেছি, কল্পনে তাদের বুনোট দেখেছি, মানুষের মনে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার আনাগোনা প্রবাহ দেখেছি। এখন বড় বেলায় জেনেছি যে সুতো আর রঙ বাদ দিলে পোশাক 'রাজার পোশাক' হয়ে দাঁড়ায়, উলগুলো না থাকলে কল্পনে আর কোনও সম্বল থাকে না। কিন্তু জানা হয় নি প্রেম-প্রীতি স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতা বাদ দিলে মানুষের, মানুষের মনের, কি অবশিষ্ট থাকে। এই জানতে গিয়েই আমার বেহাল অবস্থা।

বন্ধুবর প্রীতিতোষ কদিন যাবত আসে নি। নিজের মনের এই বেহাল অবস্থায় তার কথা তাই বারে বারেই মনে হচ্ছিল। তার সংসার আছে তাই দায় দায়িত্বের বোঝা আছে। তার স্ত্রী আছেন তাই তার নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। আমার এখানে এলেই সে নিজেকে খুঁজতে বসে। সেই প্রীতিতোষই আমাকে খুঁচিয়ে দিয়ে গেছে—নিজেকে জান, তোমার তুমিকে চেন। বলেছে, "তুমি বলতে পার ধূর্জটি এই নিজেটা কে? এই তুমিটা কি?"

ছোটবেলায় হলে বুকে টোকা মেরে উত্তরটা দেখিয়ে দিতে পারতাম। বড়বেলায় মাথায় ঝিম ধরে গেল। মাথার ঢাকনা-খানায় আঙুলের টোকা মেরে মেরে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। প্রীতিতোষের প্রশ্ন একবার বাইরে একবার ভিতরে—একবার বাইরের আমিকে একবার ভিতরের আমিকে ঘিরে—মাকুর মতো ছুটে ছুটে বেড়াল। আর পিছু করতে লাগল। সেই প্রশ্ন মাকুর ছুঁচলো মাথায় কোনো উত্তরের সুতো দেখা দিল না। সেদিন তাই প্রীতিতোষকে বলেছিলাম, "পরে একদিন সময় করে এই আমিটার সন্ধান করা যাবে।" প্রীতিতোষ যে আমার সময়-সন্ধানে সন্তোষ লাভ করে নি তা বুঝে গেলাম তার সংযোজন-প্রশ্নের পরাঘাতে। বলেছিল, "যে

আমিকে খোঁজার কথা সকলে বলেন তার কতটা আসল আর কতটা নকল, কতটা নিজের মুখ আর কতটা মুখোশ সে বিষয়টা অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া চাই।"

অনেক ভেবেছি। ভাবনার কূল পাইনি, তবে একটা কিনারা মতো যেন দেখা দিয়েছে। মুখোশ যদি সত্যিই থাকে তাহলে একটা মুখ অন্তত তো চাই। মুখ আছে বলেই মুখোশ সম্ভব। আবার, মুখ যদি একটা থাকে, প্রত্যেকেরই থাকে, তাহলে একটা মানুষকে থাকতে হয়, ব্যক্তিকে সত্যি হতে হয়, একটা মনকে সেই মুখের মাধ্যমে প্রকাশ হতে হয়। তিনটি বিষয়কে পাওয়া গেল—মন, মুখ, মুখোশ। এই মনটি কি? মন সমান সমান ব্যক্তি সমান সমান 'নিজ' বা 'তুমি'। মুখটি কি? প্রকাশের মাধ্যম সমান সমান আচার-আচরণ সমান সমান অপরের চোখে দেখা আমাদের নিজ নিজ স্বভাব-স্বরূপ, প্রকৃতি-বিশিষ্টতা। এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল। কিন্তু ওই মুখোশ? মুখোশ হল ছদ্মবেশ, ধোঁকা দেবার আবরণ, আমরা যা নই তা বোঝানোর জন্যে, অপরের কাছে প্রতিভাত দেখানোর জন্যে আমরা যা হই সেটাই কি মুখোশ?

এ পর্যন্ত ভাবতে পেরে বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। কিন্তু না, কল্পচোখে পরিষ্কার দেখতে পেলাম প্রীতিতোষ মিটি মিটি হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষড়ে পড়লাম। ত্রুটিটা কোথায় ঘটল তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। বিপদ কি মনে? না, মুখে? না-কি মুখোশে? প্রীতিতোষের মুখের হাসিটি যেন অধিকতর ধারালো হয়ে উঠলো। বিপদ কি তাহলে ওদের যে কোনো একটিকে নিয়ে নয়, সকলকে নিয়ে সমন্বয়ের মধ্যে? বাধ্য হয়ে কৌতূহলভরে করতে হল। আর এই ফিরে দেখতে গিয়েই বিপদটি টের পেলাম।

মনটিকে মতো সোজা মনে করেছিলাম এখন আর তেতো সোজা বলে মনে হল না। বস্তুর মতো মন তো কোনো মোটামুটি স্থির-অবিচল-অপরিবর্তনশীল বিষয় নয়। মন চঞ্চল। শুধু চড়াই পাখির মতো একই স্থানে, একই বৃত্তে সে চঞ্চল নয়, সে ঝরনার মতো চঞ্চল, সে নদীর মতো চঞ্চল। শৈশবে কৈশোরে সে চঞ্চল, তরুণ-যুবক বেলায় সে বেগবান-বহমান-অস্থির। প্রৌঢ়ত্বে সে সব চঞ্চলতা আর সকল বেগকে প্রসারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থির রাখার চেষ্টা করে। বার্ধক্যে নুয়ে-পড়া পারানির কড়ি-গোনা মনকে নিয়ে, নিস্তেজ পাখা গুটিয়ে, দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে, সেই মনই কেমন থেমে থাকে। বিচিত্র বিভিন্ন মনের এই চেহারাগুলো কি চেনা যায়? একই মন প্রথম শৈশব থেকে দ্বিতীয় শৈশবে পৌঁছায়? একই ব্যক্তি এবং একই মানুষ কি সকল সকালে আর অবেলা বিকেলে একই থাকে? তা তো থাকে না, সে তো থাকতে পারে না!

মন নিয়ে প্রশ্নের খোঁচায় মুখের চেহারাও তো পাল্টে যেতে বাধ্য। গেলও তাই। একটা যদি আসল মনই না থাকে তাহলে একটা মুখ হবে কেমন করে? মুখ মনকেই প্রকাশ করবে। মন চঞ্চল, তাই মুখে আসে চঞ্চল ছোঁয়া। মন অস্থির তাই মুখ কোন স্থির শিল্প কর্ম নয়। মনের অভিব্যক্তি আছে, পরিবর্তন আছে তাই মুখকেও তাল রেখে রেখে অভিব্যক্ত হতে হয়, পরিবর্তিত হতে হয়। শিশুর মন ঈশ্বরের মতো পবিত্র, সুন্দর। তার মুখ তাই অপার্থিব, দেবসুলভ। কারণ মুখ সমান সমান মাধ্যম সমান সমান আচার আচরণ সমান সমান অপরের চোখে দেখা আমাদের নিজ নিজ আমি।

কিন্তু শিশু কোনো আমি নয়, শিশুর মধ্যে ব্যক্তি উপ্ত-সুপ্ত-গুহ্য মাত্র। বীজের অন্তরে বৃক্ষ, জীবের মধ্যে ব্রহ্ম। শিশু মনে-মুখে এক। কেন এক? শৈশবের কোন মুখোশ নেই, লাগে না বলেই

নেই। কেন নেই? কেন লাগে না? উত্তর মনে হয় কেন সোজা। কেন এক?—না, সেই দৈব মনে পার্থিব মুখ যুক্ত হয় নি যে! মুখোশ নেই কেন?—না, ব্যক্তি হয় নি বলে, মানুষ হয়ে সংসারের অভিজ্ঞতার অগ্নিকটাহে এখনও পোড় খায় নি বলে। তাহলে কি মুখোশ লাগে সংসারের জন্যে, সমাজের কারণে আর সভ্যতার পতাকা বহন করতে?

একটু চকচকিয়ে গেলাম। এ কোথায় এসে পড়লাম? একটা সাদামাঠা প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম। প্রীতিহাসের মিটি মিটি হাসিতে জটিলতার আভাস পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপার অনেকদূর গড়াবে।

(২) মুখোশের ক্রমবিকাশ : (ক) সৃষ্টিকালে —

ভয়ে ভয়ে তরুণ যুবকদের নিয়ে ভাবতে বসলাম। কারণ সরল বিশ্বাসে শিশুকে নাড়াচাড়া করতেই জটিল সব বিষয় সমস্যা তুলে দাঁড়ায়। শরীর-মনের জটিলতম উদাহরণ হল তরুণ যুবক কাল। ভাঙা-গড়ার সময়। সেই তাদের বেলায় মন-মুখ-মুখোশের বিষয়টাকে দেখে নিতে চাইলাম।

ওদের বেলায় দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়া নালিকা-বিহীন গ্রন্থির রাসায়নিক কারিকুরিতে মনের মধ্যে আনে অসীম গতি, অন্তরের গভীরে তৈরি করে তোলে সাইক্লোনিক ঘূর্ণি আর সেই চঞ্চল-সমেন মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেহের কোষে কোষে কেন্দ্র-কম্পন তুলে আবর্তিত ভবিষ্যতকে নিরাবরণ বর্তমান করে তুলতে থাকে। মন পালটায়, তাই মুখও পালটায়। অন্তরের চেতনায় ঝড়ের আভাস দেখা দেয়, তাই মুখের চেহারায় ঘটে ঝরঝরে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। উঁকি মারে মনের মধ্যে মন, তার মধ্যে মন। মন মানেই তো ইচ্ছা, বাসনা, কামনা। অতীতের দৈব মন-মুখের ঐশ্বরিক একাত্মতা হারিয়ে যেতে থাকে কিন্তু বেদনা বোধ থাকে না সেই হারানোর মধ্যে বরং মেন উল্লাসের অট্টহাস আর উচ্ছ্বাসের আনন্দ শরীর-মনে সেতারের ঝংকারে, অন্তরঙ্গের সুরলহরীতে, সানাই-এর দীর্ঘ-তন্ত্র আবেশে প্রবাহিত-প্রকাশিত হতে হতে উচ্ছকিত অনুধ্যান-অনুতান হয়ে ওঠে।

তরুণ-যৌবনের এই চকিত-চঞ্চল উচ্ছল-উদ্ভাস ঝরনা জীবনকে অন্যেরা বোঝে না, বুঝতে চায়না অথবা বুঝেও অবুঝের ভান করে। প্রাক-তরুণ শিশুরা বোঝে না কারণ তাদের বোঝার বয়স হয়নি। উত্তর-যৌবন প্রৌঢ়রা বোঝে না কারণ তাদের ঘাড়ে জীবনের বোঝা সুতীব্র চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। সংসারের বোঝা, সমাজের চাপ, সভ্যতার দায়ভার আর নিত্য নিত্য অক্ষমতাসমূহকে পুরুষের সন্তানা কুলীনবংশের ঘিরে ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা—এ সবের পাশাপাশি এবং মধ্যে মধ্যে সমাজবন্দনায় আবহসঙ্গীত 'পাছে লোকে কিছু বলে'-র চাপ। বড়রা তাই নিত্য নিত্য মুখ দেখানোর তাড়নায়—মুখ দেখাবো কেমন করে? — তরুণ-যুবক মনের মনের মধ্যে মনকে রক্তচক্ষু বারণে-তাড়নে আর পুষ্ট-কণ্ঠ স্ফীত-শিরা শাসনে-পেষণে পদে পদে বাধা দিতে থাকে। তাই, যা স্বাভাবিক প্রকাশে সরল পথ ধরে চলতে পারতো তাইই অস্বাভাবিক পথে জটিল-কুটিল-বঙ্কিম পথে পথ খুঁজতে লেগে গেল। শৈশবে যা ছিল মনের মুখ, তরুণ-যুবক বেলায় তাই হল দ্বিধায় হয়ে দাঁড়াল বহু মনের বহু-মুখ। যে মুখ মনকে প্রকাশ করতে পারল, সে আর মনের মধ্যের মনকে প্রকাশ করতে পারল না। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম তার মুখের চেহারায় বিভেদ আবাহন ঘটাল। কোনটা তার মুখ আর কোনটা মুখোশ তা একদিন আর তার নিজের কাছেই ঠাহর হয় না। কোনটা

তার নিজের মন, আর কোনটা তার মনের মধ্যের মন তা একদিন হারিয়ে যেতে বসে। তাই, মন থেকে মনে, মুখ থেকে মুখোশে আনাগোনা করতে করতে কোনটা আসল তার ঠিকানা খুঁজে পায় না।

এই তরুণ যৌবন সময়ে দেহের ভাঙাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা মনের নড়াচড়া টের পায়। নিজেকে চিনতে গিয়ে এরা হিম শিম খায়। পড়ায়-মন তরুণ পাড়ায়-মন তরুণকে চেনে না, অঙ্কে বিজ্ঞানে-ইতিহাসে যে-মনকে নিবিষ্ট দেখে তার হদিস পায়না কবিতা-গল্পে-উপন্যাস অনুসরণে। ঘরের মধ্যের মন বিদ্যালয়ের-বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় নিখোঁজ হয়ে যায়। বন্ধু-সান্নিধ্যে যে মনটি একান্ত বোধে নিকট-নিকট মনে হয় সেই মনটিই, ক্ষণপরেই, অভিভাবক-নৈকট্যে কেমন উদাস-দূরত্বে আহত বোধ করে। নিরস নোট-লেখা আর সরস পত্র-লেখার সময়ে দ্বৈত মনের ঠিকানা যেন কলমের ধীর চলনে আর মনের ধাবমান গতিতে মনের অনুভবে লেখা পড়ে যায়। এই বিচিত্র-চলন, বিভিন্ন অনুভব মনকে নিয়ে তাই তরুণ যুবক বয়স ছুটে চলে, তোলপাড় হয়ে যায়। কোনটা তার মন, কোনটা তার আসল মুখ আর কখন সে মুখোশের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখে তা পরিষ্কার বোঝে না, কিন্তু জীবনের পাঠ অবশ্যই প্রথম গ্রহণ করে নেয়।

যারা লেখাপড়া শেখে না, যাদের উপর অভিভাবকদের নজর তেতো কড়া নয়, যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তথা স্বল্পতম সীমার মধ্যে ঘুরপাক খায় তাদের ক্ষেত্রে মনটা যেমন থাকে প্রকৃতিতে পথেই সহজ তেমনি তাদের মুখটাও থাকতে পারে সেই ভাবেই সরল। মুখোশ তাদের জীবনে প্রায় প্রয়োজনের তালিকায় পড়ে না। আর একটু পিছনে গেলে, প্রকৃতির আপন গৃহস্থালীর অন্দরমহলে উঁকি দিলে, আমরা তাই মন আর মুখের একাত্মতা দেখতে পাই। ইঁদুর-ছুঁচো-বেড়াল, গরু-হরিণ-শূগাল বাঘ-সিংহ-বরাহ। এদের মুখ আছে মুখোশ নেই। নেই, কারণ এদের মনের বিচিত্র-বিভিন্নতার মধ্যে কোনও বিরোধ-বৈপরীত্য নেই। এই মন অবশ্যই প্রকৃতিজ মন—তাই বলা ভাল এতোলা মন-ই নয়। এ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কমপ্রোমাইজ নেই। এরা নিজেরা অদলা থেকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, কিন্তু মনের ভাবকে মুখে অ-দলা রাখতে পারে না। ক্যামোফ্লাজ গ্রহণ করে, কিন্তু মনে-মুখে এবং শরীরের অবস্থানে একখানা খোলা-পৃষ্ঠা নির্বিরোধ দলা-সত্তা হয়ে প্রকাশ পায়। মনের গভীরে অ-দলা মনোভাবকে মুখের দলা-ভাব-রেখায় লুকিয়ে রাখা একটি শিল্পকর্ম। ক্যামোফ্লাজ। সে কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তখনই মুখোশ। নিম্নতম প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষ-অস্তিত্বের উষাকাল পর্যন্ত—শৈশব পর্যন্ত—তাই মুখোশের দেখা মেলে না। তরুণ বয়সের উদ্ভাস পাখায় দিনে এবং যৌবনের মন্ত্রণার কালে মুখোশের চাহিদা উৎসারিত হয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে। ছাত্রে খড়ি থেকে স্নাতক পর্যায় পার হয়ে জীবনে প্রবেশ ঘটে—জীবনে মানে সংসারে, সমাজে, নানাবিধ কর্মকাণ্ডে। নিজ নিজ যোগ্যতায় এবং ক্ষেত্র-কর্ম-বিধি মতে যে যেমন পারে মাস্টার, পি এইচ ডি, ডি. লিট ডিগ্রিধারী হয়ে ওঠে। চাই কি ছোট-বড়ো নানাবিধ প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানের কেউকেটা হয়ে হয়ে এবং হতে হতে উত্তরোত্তর উন্নতির ধাপে ধাপে নক্ষত্র-পর্যায়ের বাতিঘরে স্থির হতে পারে।

তাই মনে হয়, প্রাইমেটস নয়—বানররা নয়—ক্যামেলিয়নরাই—গিরগিটিরাই মানুষের মানসিক পূর্বপুরুষ। ডারুইন সাহেব জীবনের—স্পেসিসের—উৎস এবং উদ্ভবন-বিবর্তন অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর প্রধান ঝোঁক ছিল শরীর-সংস্থানের দিকে, জৈব-পরিবর্তন ধারা অনুসরণে। ফ্রয়েড সাহেব পাকা ডুবুরীর মতো মনের গভীরে পাতি পাতি অন্বেষণ চালিয়ে তথ্য ও সত্যের সংগ্রহ

আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞান আর নৃবিদ্যা মানব জীবনের ও সমাজের অনেক জটিল কুটিল টানাপোড়েনের উৎস-বিকাশ-বিনাশ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছে। কিন্তু এই কাম্যেলিয়ন-প্রকৃতির বিষয়ে মধ্যেই আলো যে কেন পড়ে নি তা বিস্ময়ের বিষয়।

জিরাফের গলা কেন দীর্ঘ, চিতার গায়ে কেন চিতা-চিহ্ন, বাঘের কেন দেহ ডোরা কাটা দাগে এবং এবম্বিধ বহু তথ্য আমাদের জানা। ছবি-গ্রাফ-চৌরচিহ্নে আঁকা বিবরণে আর টেলিভিশনের মনোগ্রাহী দৃশ্য-শব্দ-সঞ্চালনায় যুগের পর যুগ পার হয়ে কেমন করে আমরা সোজা ঋজু দাঁড়াতে পারা শ্রেষ্ঠ প্রাণীটি হয়ে এখন সোফায় বসে টিভি খুলে বিশ্বকে এক-নীড় করে কাছে পাই, পাচ্ছি, তা আমাদের জানা। কিন্তু কেন যে আমরা আমাদের সর্বজন-আচরণ-সিদ্ধ ইউনিভার্সাল কাম্যেলিয়ন স্বভাবের জন্যে একবারও সেই আমাদের প্রকৃত প্রপিতামহ গিরগিটি প্রজন্মকে স্মরণ করি না তা অবোধ্য! বানরেরা এখনও আছে, এবং নরকুলও অতিবাস্ত হয়ে চলেছে। গিরগিটিরা এখনও আছে, এবং নরস্বভাবে মুখোশ-ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে বেড়ে সর্বজন স্বীকৃত না হলেও সর্বজন অনুসৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বানরেরা জ্ঞানের পূজায় নৈবেদ্য পায়, কাম্যেলিয়নদের বেলায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থাও কেন নেই?

ক্রয়েড সাহেবকে স্মরণ করতে পারতাম। মিস্ট মিস্টিং—অপরাধ বোধ? প্রাণিজগতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম যন্ত্রণা আছে, আছে মানুষের জগতেও। ওরা বাঁচে কৃষ্টিতে, আমাদের বাঁচার মধ্যে কৃষ্টির যোগান অনিবার্য হয়েও যেন একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে দাঁড়ায় নি। কৃষ্টির বাইরেও আমাদের রুচি-র ব্যাপার আছে—বুদ্ধির, অনুভবের এবং বহুবিধ আদর্শের আর মূল্যবোধের টান বা রুচি। রমণনাম এনিমালের রমণনাম অংশে, সোশ্যাল এনিমালের সোশ্যাল অংশে—এককথায় মানবিক অস্তিত্বের উচিত্যের অংশে। এই সব রুচির এলাকায় আর উচিত্যের অংশে বাঁচার জন্যে অত্যন্ত নিম্নমানের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রয়োগ অনিবার্য হয়েই কি এই অপরাধ বোধের জন্ম দেয়? তাই কি এই রিপ্রেশন—অবদমন? অস্বীকার?

(খ) সংসারের পরিচিত প্রাঙ্গণ:

বিষয়টিকে শেষের দিক থেকে না দেখে প্রথম দিক থেকে দেখা যাক।

নিজ নিজ মনের মাধ্যার মনকে লুকিয়ে রাখতে যে মুখোশ ব্যবহারের হাতে খড়ি, তরুণ যুবক বয়সটা সেই পাঠে রপ্ত হয়ে ওঠে। তাই নিজের কামনা বাসনার অন্তরঙ্গ এলাকা পার হয়ে যখন সে বাহিরঙ্গ সংসার-সমাজ জীবনে প্রবেশ করে তখন সেই মুখোশ-ব্যাপার অধীত বিদ্যার প্রয়োগে ক্রমশই পারঙ্গম হয়ে ওঠে। দু'চারটি নমুনা দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক।

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দিন বেশি বাকি নেই। সবই ফাইনাল করে ফেলতে হয়। কর্তামশাই আসন পিঁড়ি হয়ে মেঝেতে বা ডিভানে বসে কলম বাগিয়ে কাগজের বুকে বা পুষ্টদেহ ডায়েরির পাতায় হুমড়ি খেয়ে আছেন। কলমের ডগা বেয়ে একে একে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সেই সাদা কাগজের অমলিন অঙ্গনে লাইন দিয়ে হাজিরা দিচ্ছে। গিন্নী এসে পাশে বসলেন। দু'কাপ চা উপস্থিতিকে উষ্ণতর করে হাল্কা করে তুলবে। -"নকুলমামার নাম লিখেছ?" কর্তামশাই বিস্ফারিত চোখে একবার স্ত্রীকে দেখবেন আর একবার ধূসর মানসদৃষ্টিতে সর্বশেষ লেখা ক্রমিক সংখ্যায় মনোযোগ দেবেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যার সঙ্গে কাটারাবাস বিয়ের যে ডি. পি.-সম্পর্ক তা কর্তার মাথায় নামতার হাতুড়ি পিটবে, পিটতেই থাকবে। কিন্তু গিন্নীর মনের বায়স্কোপ পিটে গত

দশ-পনেরো বছরের ডেবিট ক্রেডিট কত ভাল ভেসে ভেসে উঠবে। কোন অনুষ্ঠানে কে কি উপহার দিয়েছে, কে কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছে, এই অনুষ্ঠানে কাকে কাকে অবশ্যই বলতে হয়, কাকে কাকে না বললে সম্মান থাকে না—এমতো ক্রমশ প্রকাশ্যই নেজার রেফারেন্স একের পর এক ধরাশায়ী তালিকাকে পুষ্ট-স্ফীত করে তুলবে। অন্যদিকে হাতুড়ির ঘায়ে অবশ-অসাড় আঙুলগুলো কর্তামশাইয়ের হাতে নিথর খেমে যেতে চাইবে। মনের মধ্যের মন মুখের গহ্বরে নিমের স্বাদ ঠেলে দিতে মুখের চেহারার সাহারার শূন্যতাকে হাহাকারে ফুটিয়ে তুলতে চাইবে। কিন্তু মনের সামনের মনটা স্ত্রীর সামনে শিশির ধৌত ফুলের পেলবতায় বার বার প্রকাশিত মুখে 'সে তো ঠিকই, ওকে তো বলতেই হবে, তাগিস তুমি মনে করিয়ে দিলে'—ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে বাঙ্ময়তা, উচ্ছ্বাসে ধ্বনিময় রেখে দেবে।

আর সেই সময়ে যদি ছেলে বা মেয়ে, মতান্তরে জিন-ধারী নাতি; প্রথবা স্টোন-ওয়াশ পরিহিতা নাতনী এসে ঘাড় বাঁকিয়ে তালিকার দিকে বাঁকাদৃষ্টি ক্ষেপণে সংখ্যা অনুমান করে ধপাস করে পাশের সোফায় স-ক্ষন্দ অধিষ্ঠিত হয় তাহলেই বিপদ সমাসন্ন। "ওয়েস্টেড, সীমার ওয়েস্টেজ। এতো লোক নিমন্ত্রণ করার কোন মানে হয়? একটা চান্সের আসরে যে কাজ হতে পারে সেই অনুষ্ঠানের জন্যে এমতো ডুরিডোজের ব্যবস্থা সামাজিক অপরাধ।" নাতনী চাকে কাঠি দেয়া তো নাতি সানাইয়ে ফুঁ ধরে—"মাহেরুজী বলেছেন না? বলেছেন—ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান-আপ্যায়নে যে পরিমাণ অর্থের অনাপ্রোডাকটিভ অপচয় ঘটছে তারতে তা অমার্জনীয় অপরাধ!"

ভঙ্গ হয়ে যায় এক এক মনের আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, এক মনের সঙ্গে অন্য মনের মিল-অমিলের বোঝাবুঝি সোঝাবুঝি। ছেলে-মেয়ের বিয়েতে—একবার বইতো নয়!—আড়ম্বরের বাসনা, প্রতিবেশী-পরিজনদের কাছে নিজেকে, নিজেদের, প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা, সদাস্থাপিত আত্মীয়দের চোখে লোকবল, অর্থবল এবং গোষ্ঠীবলের রূপরেখা এঁকে দেওয়ার ইচ্ছা। আর পাশাপাশি মনের গভীরে পি. এফ-এর দরিদ্রতর অবস্থা, আগামী দিনের দুঃসহ চাপ, দ্বিতীয় মেয়ের বিষয়ে দুশ্চিন্তা এবং ইত্যাদি। গভীর মনের নিজেকে জানলেও তাকে নিজেরই নির্বাসনে রেখে কর্তামশাই সামাজিক মনের নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একই ব্যাপার ঘটে গিন্নীর বেলায়, সকলের ক্ষেত্রেই।

যদি সন্দেহ থাকে তাহলে অনুষ্ঠান শেষে একবার কর্তা গিন্নীর একান্ত কথোপকথনে কান দিন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা থেকে যদি আগতজনের সংখ্যা বেশ কম হয় তাহলে উদ্বৃত্ত এবং অপচয়, যদি বিপরীত হয় তাহলে অসময়ে টানাটানি। উভয় ক্ষেত্রেই মনের বিস্ফোরক প্রকাশে অনাগতদের অথবা 'অনাকাঙ্ক্ষিত' আগতদের ঘাড়ে সব দোষ চাপানো হয়ে থাকে। অনুমানের সঙ্গে বাস্তবের অমিলের দায় অপরের ঘাড়ে ফেলে আমরা অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ সেই নিজেরই নির্বাসনে রাখা মনের অবুঝপার টের পেতে থাকি। মুখোশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, ভেংচা-ভুঁকে মুখ বেরিয়ে আসতে চায়।

আর একটা উদাহরণ নিন। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সন্তান। অন্নপ্রাশন। নিমন্ত্রিতের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতার নিকষ নয়, কে কি দেবে এই প্রশ্নে তালিকার অগ্রগতি ঘটেছে। নিতান্ত না বললে নয় এমন কিছু স্বজন-পরিজন থেকে যাচ্ছে সেই তালিকায়। কলমের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস নেই তিক্ত স্বাদ আছে কারণ তারা কিছুই সবিশেষ দিতে পারবে না।

লোকসমাজ। তা ছাড়া ছেলের কাছে ঘরের বাড়ির আত্মীয় স্বজনরা সকলে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠে নি বলে—কে কেমন দিতে থুতে পারে বা দেবে খোবে—তাদের এক একজনকে নিয়ে মৌখ মুজামান চলবে ক্রমান্বয়ে। এসবই চলবে মনের মধ্যের মনকে নিয়ে নাড়াচাড়ার সময়। একক ভাবে এবং যৌথ ভাবে, যদি একই ওয়েভ লেংথ-এর হয় দুজনই।

অনুষ্ঠান দিনে মধ্যেই সেক্ষেত্রেও নিজ নিজ মুখমণ্ডলকে মুখোশ বানিয়ে ছোট্ট এবং গেইরা খিল খিল হাসিতে, কল কল প্রীতিসম্ভাষণে এবং উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সামাজিক মনকে ঝরনার মতো বইয়ে দিয়ে ছাই হবে। ভিতরের মনকে কৃপণ ঐষ্ট নির্জলা উপোসে একান্তে সরিয়ে রাখবে। সব মিটে গেলে স্বামী স্ত্রী বসবে ট্রাঙ্গাল ব্যালান্স কমাতে—ট্রেডিং এ্যাকাউন্ট, প্রফিট এণ্ড-লস-এর হিসেব প্রথম সুযোগেই মনের কলমে ঝর ঝর প্রকাশ পেয়ে যাবে? প্রফিটের পূর্বপরিকল্পিত অঙ্ক সঠিক বলে মনে হলেই স্মিত মুখে ডিনারে বসবে। অনাথা বিরস বদনে আত্মীয় স্বজনদের কঞ্জুস প্রকৃতির প্রতি অবিরাম কটাক্ষ চলবে। রাতের ঘুম বিলম্বিত হবে। 'আর অন্নপ্রাশন নয়' বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত মনে মনে ঘোষণা করে হয়তো বা ফ্রয়েডীয় ইচ্ছাপূরণ মতবাদকে স্বপ্নে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দেবে!

আর যারা নির্মন্ত্রিত? রান্না-বান্না পরিবেশন-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্তামশাই, অথবা স্বামী-স্ত্রী, বার বার খোঁজ খবর নেবে, জনে জনে। তারা বলবে 'অপূর্ব হয়েছে, সব সুন্দর' ইত্যাদি। কিন্তু বিদায় পর্বের পরে, গৃহ প্রত্যাবর্তনের পথে সমালোচনা আর ব্যবচ্ছেদ চলবে। সব কিছুর, সমস্ত বিষয় ব্যাপারেরই। ত্রুটি বিচ্যুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ, ফিরেই-ফিরেই, ফালি-ফালি হয়ে উদ্ঘাটিত হবে। একটা মন সামনের, সামাজিক স্তরের সভ্যতার দায়ভার বহন করে। মুখোশ নয়? অন্যটা?

নববধূ? পতিগৃহে প্রথম দেখা ভাসুরের স্মিত হাসিমুখে শাশুড়ি? দুধে আলতা গৃহ প্রবেশের ক্ষণ থেকে অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত দিনগুলো, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও প্রলম্বিত সপ্তাহান্ত-মাসান্ত দিনগুলো পার হলেই পেলব মুখের অভ্যন্তরে যে দন্তপঙ্‌ক্তি দেখা দেয়, নেলপালিশ করা 'কিওট নেইলস' গুলো আসলে নখদন্তের ইতিহাসবহ তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। মটকা শাড়ি ছেড়ে আটপৌরে শাশুড়িটি বেরিয়ে আসে অচিরেই, হাতে থাকে না বরণডালা-প্রদীপ ধান-দূর্বা, মুখে চোখে ফুটে ওঠে নিরাবরণ নিষেধের আর বিরক্তির আনাগোনা। কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ? প্রবৃত্তির অস্বীকারেই নাকি আমাদের সভ্যতার সৃষ্টি। প্রবৃত্তির? না, সত্যের, সত্যমুখের? প্রকৃত মনোভাবকে গোপন করার মধ্যেই, সত্য মনটিকে অন্তরাল রেখে আপাত-মনকে সামনে তুলে ধরার মধ্যেই কি সভ্যতা নয়? যতো মুখোশ, যতো বেশি বেশি মুখোশের ব্যবহার ততো বেশি সভ্য, বেশি বেশি সফল-সার্থক? সভ্যতার পরিশীলিত বহিরাবরণ আমিটির মধ্যে গুহাবাসী কুণ্ডলী পাকানো একটা আমি সদাসর্বদাই ঘাপটি মেরে বসে থাকে। একটু অহং-এ খোঁচা লাগলেই সে ফোঁস করে স-ফণা মাথা তুলে জানান দেয়। মুখোশ খান খান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়। তখনই ভিতরের আমিটি নখে দন্তে, কণ্ঠে-পৃষ্ঠিতে আর কপালের ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে। এটাই কি সত্য নয়?

সংসারের বিভিন্ন সম্পর্ককে লাভজনক-প্রভাবজনক করে দেখুন, স্বার্থের ছুরি দিয়ে আবরণকে

অপারেশন করে দেখুন অথবা সন্ধা–টুইজার দিয়ে একটু গভীরে খুঁটে দেখুন। দেখবেন মুখোশের আন্তরণটি কতোই পাতলা ঠেকবে, ভিতরের আমিটি কতো পুষ্ট, সেই আমির মধ্যে অনেক আমি একে একে উঁকি দেবে, প্রকাশ হয়ে পড়বে। মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, জামাতা-শ্যালক, মামা-ভাগ্নে, দেবর-ভাসুর, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ইত্যাদি। সবটুই সম্পর্কের সত্তা মস্তাটের অভ্যন্তরে স্বার্থের মৌচাক। সেই মৌচাকে শত-সহস্র কামনা-বাসনা আশা-প্রত্যাশা অপেক্ষা-প্রতীক্ষারা গুন গুন করে গভীর মনের মনের মধ্যে মনের ঘরে মধু আহরণে সদাই তৎপর। একটু খোঁচা লাগলেই মুখোশের উজ্জ্বলা ঝরে গিয়ে ছলের আক্রমণ মাটবে, গুন গুন গানের ধ্বনি-মন্ত্রতা থেকে কেমন অবলীলায় জন্ম নেবে শব্দ-বাক্য-কণ্ঠ বাদন। অপরকে তো চেনার প্রশ্নই ওঠে না, তখন দেখবেন নিজেকেই চিনতে পারছেন না। নো লাইসেন্সেস–নিজেকে জান–বললেই কি আর নিজেকে জানা যায়? মনে হবে এই আহ্বানটা অতলের আহ্বান, অসম্ভবের অন্বেষণে অসীম মায়া।

(গ) সমাজের আঙিনায়:

সংসার ছেড়ে সমাজে মনচারণা করুন। সকাল বিকেল যে প্রতিবেশীর সঙ্গে দৃষ্টি-বাক্য বিনিময় হয় সেই প্রতিবেশী আপনার বিষয়ে কি কি ভাবছে, কোন কোন বিষয়ে পরিকল্পনা আঁটছে তার বিন্দুবিসর্গও আপনার অজ্ঞাত। জমির সীমানা আছে, ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে, স্থানীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে চেয়ার দখলের ব্যাপার ট্যাপার আছে, বিদ্যা-অর্থ-চাকরির স্থানমাহাত্ম্য আছে–কি নেই বলুন! দু-দশ মিনিট অবরে সবরে আলাপাচারি করবেন দেখবেন সভ্যতার সমসাময়িক ভুবা উপাদানে সময় কেমন মসৃণ কেটে যাবে। আপনার নিজের গুহামুখ খুলবে না একবারও। আপনার প্রতিবেশীরও না। একটু সময় বেশি দিন দেখবেন সেই গুহামুখ কেমন ধীরে ধীরে খুলে গিয়ে পরনিন্দা পরচর্চার ছিদ্রমুখ হয়ে ঢুঁইয়ে ঢুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। সময় একটু বেশি পেলে সেই ছিদ্রমুখই গোমুখ হয়ে দেখা দেবে! আপনারা কেউই পরনিন্দা পরচর্চা পছন্দ করেন না কিন্তু তথ্য ও সত্য বিষয়ে দেখবেন আপনাদের উভয়েরই কতো অবিষ্ট আগ্রহ ফুটে বেরুবে। এই সব সংগৃহিত তথ্য ও সত্য অবলীলায় অন্য প্রতিবেশীর কর্ণপথে মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রবাহিত স্থাপিত করে দেবেন প্রতিবেশীর প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করেই। অবশ্য গোপনীয়তার বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই এটা করবেন। আপনিও করবেন, তিনিও করবেন। পরিশীলিত মুখোশ-মনের সঙ্গে গুহাবাসী মনের এখানেই তফাত।

ছেলের বিয়ে দেবেন, অথবা মেয়ের। ভাবী বেয়াই বাড়িতে টান টান পারিপাট্য আপনাকে স্বাগত জানাবে। ছোট ছোট কথায় হার্দ্য আবাহন, স্মিত হাসিতে আন্তরিকতার শিশির বিন্দু, ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতায় প্রীতিব্যঞ্জন যেন ধূপের গন্ধের মতো আপনার চারদিকে ম' ম' করবে। শিষ্টাচার, কৃষ্টির ছোঁয়া, শিক্ষার বিচ্ছুরণ, রুচির উজ্জ্বল উপস্থিতি–সব মিলিয়ে আপনার মনে হবে 'আহা! এই তো পরিবার, এই তো এতোদিন খুঁজেছি।' মুখের সন্ধান পাবেন না, মুখোশেই মজে যাবেন। একবারও ভাববেন না যে বছরের বিশেষ একটা দিন বছরের সব দিন নয়। এক টুকরো মন সব মনটার সহস্রাংশেও নয়। মোহিত হয়ে বিমোহিত হবেন। মুখোশে মুখোশে ধূল পরিমাণ হয়ে যাবে? ছেলের বা মেয়ের মা-বাবা কাকা-জ্যাঠা আপনাকে ভি আই পি বানিয়ে একের পর এক প্রশংসার জড়িত মধুর বাণী শোনাবেন। আপনার মানসিক প্রতিরোধ নিম্নতম মাত্রায় ঝির ঝির বইতে থাকবে, বৌদ্ধিক সচেতনতা এনেসথেসাইজড হয়ে যাবে। ওঁরা আপনাকে ধোঁকা দেবে।

আপনি ধূল হয়ে নেশাগ্রস্তের মতো সেই প্রশস্তির প্রবাহে ভেসে যাবেন। শিল্পী যেমন তুলির টানে টানে ছবির গড়ন-গঠনকে রঙের পর রঙ চাপিয়ে মনোহর করে তোলে, তেমনি ওঁরা উপাখ্যানের পর উপাখ্যান উদ্ভূত করে, এ্যানেকডোটের পর এ্যানেকডোট স্মরণ করে সেই ছেলের বা মেয়ের এমন একখানা রূপে কার্তিক গুণে সর্বাসাধী অথবা স্বভাবে লক্ষ্মী প্রকৃতিতে সরস্বতী দাঁড় করিয়ে ফেলবেন যে আপনি ভক্তের দেবদর্শনের মতো সত্যস্বরূপ দর্শনে অনন্যোপায় বোধ করবেন। আপনি নিজের মুখোশটি পরিপাটি উজ্জ্বল রাখতে ব্যস্ত থাকবেন। মনের মধ্যে যদিও দু'চারটি প্রশ্ন তখনও বেঁচে থাকে তা হলেও সভ্যতা-ভব্যতার নির্দেশে সে সবের গলা টিপে ধরবেন। ওঁদেরও সেই একই অবস্থা হবে। মুখোশের অমলিন থাকাটা সভ্যতার দাবি।

ঘরে ফিরে এসে পরিবারে বর্ণনা দিতে গিয়ে টের পাবেন কেমন করে ধোঁকা দিয়ে আপনাকে বোকা বানানো হয়েছে। আপনার যা জানার ছিল তা জানা হয় নি, যা যা জানানোর ছিল তা সব বাদ হয়ে গেছে। ওঁদের যা বলার ছিল তা সব সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছে। গল্প উপাখ্যানের ঘাত প্রতিঘাতে যে পরিমাণ অহং চারদিকে অবিরত ছিটকে ছিটকে বিন্দু বিন্দু উজ্জ্বলা ছড়িয়েছে সে পরিমাণ তথ্য ছেলে বা মেয়ে সম্পর্কে উদ্ঘাটিত হতে সুযোগ পায় নি! ছেলে কেমন দেখলে বা মেয়ে? চোখ মুখ কেমন? কি পরে ছিল? কথা বলে কেমন? বুদ্ধি-বিবেচনা? চাকরির বর্তমান ভবিষ্যৎ? —সদা-স্মরণকে আতিপাতি খুঁজেও দেখলেন তাই বিষয়ের তালিকা প্রায় শূন্য! অপ্রয়োজনীয় অভাবনা বিষয়ের বোঝা বয়ে বাড়ি ফিরেছেন? কেন? কারণ সেই এক—মুখোশটি টান টান ধরে রাখতে মুখটি কেউই দেখাতে দেখতে সময় পান নি।

এবারে শিল্পীর তাড়া খেয়ে অথবা বাবার কাছে বাস্তব বুদ্ধি ধার করে মুখোশ ছেড়ে মুখ নিয়ে আসরে নামতে বাধ্য। এসপ্লানেড, গোপনে তথ্য সংগ্রহ। অফিসের বারান্দায়, পাড়ার চায়ের দোকানে, পরিচিত-স্বল্প-পরিচিত বন্ধু বান্ধব এবং তাদের বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে এবং ইত্যাদি করে করে একটি পূর্ণ চিত্র বানাতে লেগে যাবেন। এও বাহ্য সত্য, যা অন্তরের সত্য তা সেই মন-মুখ-মুখোশের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাত, টানাপোড়েন। মনের মধ্যে মন, তার মধ্যে মন। বিন্দু বিন্দু শিকর দানাতে, মনের বিন্দু বিন্দু চেতনায়, কামনা বাসনার প্রতিক্রমণ এক এক রকম। স্থির বলে কিছু নেই। ক্ষণভঙ্গবাদ, ক্ষণিক-অস্থির, চঞ্চল পরিবর্তন। এ সবের মধ্যেও যদি ছেলের মা-বাবা, তাহলে অবচেতনের কোনও এক দালানে অথবা কুঠরির মধ্যে অথবা কোনও খোপে কোনে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে বয়পন-বয়সমা এবং ইতি-স্থিতি-কারের আকাঙ্ক্ষা। মনের মধ্যের সেই আকাঙ্ক্ষার আবর্ত অনেকেই ইদানিং মুখে আনেন না, কঠিন মুখোশের আড়ালে মানস সমাধি দিয়ে ফেলেন। মুখ মুখ সঞ্চিত ইচ্ছার ঘূর্ণি আবেগে তোলপাড় ঘটায়, কখনও মাকে কখনও বাবাকে কখনও বা পাত্র-মিত্র-স্বজনদের। বোধ বুদ্ধি বড় বালাই। মনের মধ্যের মনের জন্যে বালাই। সভ্যতার মুখোশের জন্যে অনিবার্য। তাই দেখবেন সেই সমাধিস্থ মন শক্তির রূপান্তরের নীতিতে ঘাট-পালঙ্কে সামঞ্জস্যিকা, টিভিতে কামার আর মনের জন্যে মারুতি-বাজাজে একরাবা হয়ে স্থির হয়ে আছে। কিছুই চাই না যে কতো বড়ো মুখোশ তা বিয়ের দিন এবং তার পরে টের পাবেন! অগ্নিসাক্ষ্যে লিখা সেই ইতিহাস মনকে ছেড়ে সমাজে, মুখোশকে ছিঁড়ে আইন শৃঙ্খলার এলাকায় আছড়িয়ে পড়বে।

যদি মেয়ের মা-বাবা অথবা কাকা জ্যাঠা, তাহলে সাজসজ্জা, গয়নাগাটি লেনদেনের আবরণে

আসবে সর্বাধিক উজ্জ্বল—মুখোশ। অন্যদিকে গ্যানার স্ক্রিচারের অভাবে মিস্টির মুখ ঢাকা পড়ে যাবে। যা বাঁচানো যায়! সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে উপাখ্যানের জাদু-মুখোশ। আবার মুখোশের গায়ে সস্তাদরে প্রাচুর্যটি বাঁচাতে অন্যপক্ষ নিজেদের হুজুর শক্তির অনুশীলন করে চলবে।

বন্ধু ছেড়ে বাড়িতে আসুন। বেনারসীর মোড়কে যিনি পাচার হলেন তাকে কি কেউই চেনে? তিনি নিজে কি নিজেকে চেনেন? আর যিনি চাদরে বেঁধে ঘরে তুললেন তিনি? মাঁরা আবাহনে শাঁখ বাজালেন, বরণ করতে ডালা সাজালেন আর ক্ষণে ক্ষণে সদা আগতা সুশীলার গুণগানে মুখর হলেন তারা? দু'মাস-এক বছর পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন? যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে কাগজে দেখবেন—দু'নম্বর পাত্রায়—ডিভোর্স, নামমাত্র বিবাহ, তিনদিন অথবা মাসাধিক ইত্যাদি! সেই সব বিয়েতে পাত্রপক্ষ-কন্যাপক্ষ ছিলেন না? গোড়ের মালা কেনা হয় নি? কলাগাছ? হুলুল-বাটী? সানাইয়ের রেকর্ড? উলুধ্বনি? এবং ফুলসাজে সজ্জিত মারুতি এ্যামবাসেডর? তাহলে?

এই তাহলের উত্তরেই ভেসে উঠবে মন-মুখ-মুখোশের ভাঙাচোরা। তরুণ যুবক বেলার কথা আগেই বলেছি। উত্তপ্ত দেহে বাষ্পাকুল মনে জীবন রসায়নের অনুপুঙ্খ কারিকুরিতে রঙ-রসে-বর্ণসম্ভারে মুখোশের ব্যবহার শিখে ফেলেছি, রপ্ত করে ব্যবহারে পারঙ্গম হয়েও উঠেছি। লেখাপড়া শিখতে শিখতে আর না শিখতে শিখতে বয়স বাড়িয়েছি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ভোগ করতে নব নব পন্থার অনুসরণ করেছি। এই স্বাধীনতা পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক হয়েছে এবং সামাজিক পর্যায় পার হয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-তর্কের ক্ষুরধার প্রয়োগে আবার ব্যক্তি কেন্দ্রিক করে খুঁজে পেয়েছি। স্কুল কলেজের শতছিদ্র শাসনের অরক্ষিত বেড়াজালের ফাঁকে ফোঁকরে মন-মাথা-দেহ গলিয়ে গলিয়ে গাছের এবং তলার কুড়োনোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। দিনকালের সহায়-সহায়তায় মুখোশ হতে পেরেছি। সোসাইটি এখন পারমিসিভ, শব্দ-দশা-পাঠা মাধ্যমগুলো নিরন্তর নিরন্তর তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। দেখে-শুনে-পড়ে-টড়ে সুলুক সন্ধান ভালো হয়ে গেছে। সবই হয়ে গেছে, ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক মায়াপথে সহস্র পা এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাল রেখে পারিবারিক প্রথা-প্রকরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেখানে ছিল সেখানেই প্রায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে। সমাজের বেলাতেও তাই। টাটা বি কেক এণ্ড অলসো হাউসিং ব্যাপারটা—গাছের আকর্ষণ এবং তলার সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ—সমান সতেজ থেকে গেল, থেকে যাচ্ছে। কারণ পুরোনো পথে অহেতু পাওয়ার সুযোগ থাকছে। বস্তুগত এবং মানসিক। নোতুন জীবন শুরু করার সময়ে পুষ্ট ব্যাঙ্ক একাউন্ট, সামাজিক সংগ্রহ এবং পারিবারিক সুরক্ষা। অন্যদিকে সেই পুরোনো ব্যবস্থার নেতৃত্ব হিসেবে যে সব দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে চাপে তা শিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তি জীবনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায়?

সুতরাং? ক'দিন বৈ তো নয়, একটু চোখে চোখে কটা দিন ডুব মেরে কোনক্রমে পার করে দাও। সেই মনটা দেখাও আর মুখটা প্রকাশ কর যা সকলে দেখতে চায়। অর্থাৎ একখানা পরিশীলিত পরিমার্জিত মুখোশ টান টান ধরে রাখ। তার পরেই সময় মতো তোরা কাটা, চিতা চিহ্ন মুখখানা প্রকাশ করতে পারবে। কোথাওও বা ঘুন পোকার মতো ধীরে ধীরে শতছিদ্র জর্জর করে তোল, কখনও বা অধীর অস্থিরতায় শতছিদ্র করে বেরিয়ে আস। ছেলে মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে আপনি হকচকিয়ে যাবেন। একবারও কিন্তু ভাববেন না গোলমালটার কোথায় শুরু আর কোথায়ই বা শেষ। স্নেহের বশে পক্ষ নেবেন। নন-অবজার্ভেশন আর ম্যাল-অবজার্ভেশনের অনিবার্য প্রভাবে

সত্য দৃষ্টি হেরে কনয়দৃষ্টি/পুত্রদৃষ্টি হবেন। আসবে ধুন্ধুমার, পড়বে ভঙ্গ অনেকদূর। নিজের মুখের আর মুখোশের সংঘাতে জর্জরিত হয়ে কপালে করাঘাতই হবে একমাত্র প্রাপ্য।

একদিন অবসর তো নেবেন। তখন দেখবেন সন্তান সন্ততিদের, আত্মীয় স্বজনদের বহুবার দেখা মুখোশগুলোর কোনটাই শেষ-সম্ভব মুখোশ ছিল না। বার বারই যে মুখটাকে মুখ বলে মনে হয়েছে, অনুমান করেছেন, সেটা আসলে সঠিক মুখ ছিল না। প্রত্যেকেরই একাধিক মুখ স্মরণে আসবে, একাধিক মুখোশ। কারো বা ডজন ডজন, কারো শতাধিক। কিন্তু এই অবসরান্ত জীবনে তাদের মুখোশে আর কোনো কারিকুরি-কারচুপি থাকবে না। খড় বেরিয়ে পড়বে, আলপনাহীন চাটাই-ডিতটা দেখবেন কেমন ভাবে ভাব করে তাকিয়ে আছে। কারণ আপনি তখন ক্রমশই শক্তিহীন অক্ষমতার ঢালু পথে পিছলে পিছলে যাবেন। ওরা সকলেই তা বেশ জেনে গেছে।

আবার, আপনার দিক থেকে আপনি যেমন ওদের দেখছেন এক একজন পরিবার-সমাজ স্টেজে স্ত্রী নাতোর কুশীলব, ওরাও কিন্তু আপনাকে দেখবে সেই স্টেজেরই অপসৃয়মান অভিনেতা হিসেবে। নিজের মুখও যেমন নিজে দেখা যায় না, নিজের মুখোশটাও তো তেমনি সারা জীবন অদৃশ্যই থেকে যায়। ছেলেরা যখন অবাক হয়ে ভাবে আপনার পেটে পেটে এতোও ছিল, অথবা মেয়েরা—তখন তারা আপনার কোন্ মুখটা নিয়ে ভাবতে বসে? স্ত্রী যখন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে অনুশোচনা করেন—সারা জীবন ধরে ঘর করে লোকটাকে এক বিন্দুও চিনতে পারলাম না! - তখন তিনি কিসের ঘোষণা করেন? মেয়ে কাঁদে: বাবা আমাকে পথে ভাসিয়ে দিলেন—তখন? স্বজন-পরিজন পাড়া-প্রতিবেশীরা যখন বলে 'আচ্ছাড়ের বুড়ো' অথবা 'ভীমরতি ধরেছে' তখন আপনার কোন নিজেটা—আমিটা—আত্মার হয়? সেই কামনা বাসনা, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ-অপূরণ নয়? মনের মধ্যে মন, সেই সব মনের কোণে-কোঠায় জমে থাকা চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েন আপনি ওদের মনে ছবি আঁকবেন। আপনার মুখ-মুখোশের সন্ধান পাবেন না ওদের বলা মুখ-মুখোশে। ঠিক তেমনি ওদের মুখ-মুখোশ বলে আপনি যা সারাজীবন ভেবে এলেন সেখানেও কি অনাথার স্থান আছে? সব থেকে যারা কাছের, সারাজীবন যাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলাম, যাদের সবটুকু না হলেও অনেকখানি জানি বলে বিশ্বাস করে এলাম, সেই তাদের কতটুকু আমরা চিনি? জানি? বুঝি? হঠাৎ হঠাৎ অবাক হয়ে যাই আচরণে-ব্যবহারে, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, হতচকিত হয়ে অতীত হাতড়াই! কেন এমন হয়? এমন হয় কারণ আমরা কেউই কারো মুখ দেখিনা, দেখতে সুযোগ পাই না। একের পর এক মুখোশকে দেখি আর তাকেই মুখ বলে মনে করি। পেঁয়াজের খোসাকেই পেঁয়াজ বলে মনে করি। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি মুখোশের প্রসেশন, খোসার পরস্পর সংযোজন। সেখানেই পেঁয়াজ, সেই মুখোশের প্রসেশনেই আমাদের আমিত্বের সংযোজিত। টুকরা-ফাকরা খেলা। জনিকবাদ, ক্ষণিকবাদ, বহু নেই-নেই এর মধ্যে এক একটি চলমান আত্মার স্থিতি?

(৩) সমাজ-সংসার-সভ্যতার অবদান :

জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেকেই হাজির হই নিজ নিজ শরীরে-পোশাকে। পর্বে-পর্বে অঙ্কে-অঙ্কে সেই বহিরাবরণ বার বার পালটাই, সংসারের-সমাজের-সভ্যতার নির্দেশ-নির্মাণে কতোবারই তো কতো রকমের ছিকন-মোটা উজ্জ্বল-বিষণ্ণ সবিশেষ-সাদামাঠা পোশাকে—চেহারায় সেই মঞ্চে মোরামেরা করি। তার পর একদিন জীর্ণ বস্ত্রের মতো সব ফেলে রেখে চলে যাই। কিন্তু কে আসে? কেই বা চলে যায়? সে থেকে যায় ঠিকানাহীন, আর যার ঠিকানায় ঠিকে সারাটা জীবন

নোঙর করে কাটাই তাকেই বলি জীর্ণ বস্ত্র। আসল রইল অজানা অচেনা, ঘর করলাম মিথ্যেকে নিয়ে? তাহলে মুখোশের বাইরে, মধ্যে, যে ছিল মুখ সে তো কেবলই মিছে! অথবা এতোই সত্য যে জীবনের দৃষ্টিতে তা কোনদিনই ধরা পড়ে না। দার্শনিক 'লাইবেনিজ', ফিজিক্যাল প্রিসাপোজিশন। এতোই সূক্ষ্ম যে আছে কি নেই তাই বোঝা ভার।

দর্শনের উচ্চমার্গ থেকে দৈনন্দিন বাস্তবের ধুলোমাটিতে নেমে আসা যাক। বাস্তবের কঠিন ছোঁয়ায়। এখানে বস্ত্র জীর্ণ হয়ে দোকানে দৌড়াতে হয়। সংসারের অমোঘ নিয়ম। এখানে যে আসে সে অনেক উৎকণ্ঠা অনেক অপেক্ষাকে একাগ্র করেই আসে। তাকে না চিনে উপায় থাকে না, প্রতিনিয়ত সে তার থাকাটাকে কঠিন কঠোর প্রক্রিয়া পদ্ধতিতেই ভাগ্যত বাস্তব করে রাখে। আবার যে যায় সেও যাবার সময় অনেক উৎকণ্ঠা, অনেক চোখের জল অনেক কষ্ট-যন্ত্রণার ইতি টেনে চলে যায়। সে তার চলে যাওয়াটাকেও অনেক কঠিন কঠোর প্রক্রিয়া পদ্ধতিতেই ভাগ্যত বাস্তব করেই চলে যায়। কিন্তু, আগেই দেখেছি, এই আসার শৈশব দিনে আর যাবার দ্বিতীয় শৈশব শেষে মুখোশ থাকে না। মুখোশের উদ্বোধন, অনুবর্তন, চর্চা ও প্রয়োগ ঘটতে থাকে মধ্য পর্বে। মুখোশ তাই সংসারের, সমাজের, সভ্যতার অবদান। সেই সংসার সমাজ সভ্যতার আরও কথা বলার আগে কিছু অন্য কথা বলে নিতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির কথা, নর-নারীর প্রকৃতির কথা। আগেই দেখেছি প্রকৃতিতে মন নেই বলে মুখ নেই, মুখ নেই বলে মুখোশের হাতিরা নেই। মন নেই, মানে আমরা যাকে মন বলি সেই মন নেই। আছে প্রকৃতিজ মন, প্রকৃতিজাত মন। তাই সেই প্রকৃতির আপন সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পুরুষকে বেছে নিয়ে সুন্দরের প্রকাশে লীলাময়ী করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিদেবী সেখানে সময়কে এবং সময়মতোই বর্ণে-গন্ধে নৃত্যে-গানে পুরুষকে, নয়নলোভন এবং প্রীতিমধুর করে প্রাণিজীবনের প্রবাহকে অনিবার্য রেখেছে। সুন্দর সেখানে সময় নির্ভর, ড্রেসিং টেবিল নির্ভর নয়। মনোহরের প্রকাশ ঘটে প্রকৃতির ঋতু-বৈচিত্র্যে, বিউটিশিয়ানের প্রসাধন-বৈচিত্র্যে নয়। ওদের মুখের-দেহের কেশরের-পেখমের আর কণ্ঠের-ধ্বনির যে পরিবর্তন তা ধীরে ধীরে একেবারে নিজ নিজ প্রকৃতির অভ্যন্তর চেতনা থেকেই বাইরের শ্রাব্য-দৃশ্যমান প্রকাশে ঘটে থাকে। ওরা ধোঁকা দেয় না বলেই ওদের মুখোশ নেই, ডাক দিয়ে যায় বলে ডাকতমক আছে।

মানুষের বেলায় ব্যাপারটা কেমন অনায়াসেই উলটে যায়। মদির আঁখি আর পেলব কপোলের আড়ালে যে মুখ প্রকৃতিদত্ত তাতে আর তেমন করে মন ভরে না। তাই মদিরতর আঁখি আর বর্ণচ্ছটাময় কপোল দৃষ্টিকে চাহনিতে এবং দশকে মদনোচ্ছ্বাসে মুখোশ করে তুলতে সচেষ্ট হয়। রূপ দিয়েই ভোলাতে চায়, গুণ দিয়ে নয়। সময় আর ঋতুনির্ভর নয়, ক্যালেন্ডারের খোপে দিন দিন দৈনন্দিন হয়ে ওঠে। প্রকৃতির আপন প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা দেহবল্লরি সামনে পিছনে উচ্চাবচ সুন্দরের পেলব জ্যামিতিক টান টান শিল্প সুষমা ওদের, নারীদের, সর্বাধিক তুষ্ট করতে পারে না। তাই তারা যত্নচেষ্ট হয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত রূপসম্ভারকে সুদে বাড়াতে নানাপ্রকারের ছিসেব নিকেশের পড়াশোনায় মশগুল হয়ে পড়ে। গ্রাম আছে প্রকৃতির কাছাকাছি, নীড়ে-সবুজে মাখামাখি, তাই সেখানে মুখের মুখ এবং শরীরের মুখ প্রকৃতিদত্ত মুখের আদল হারায় নি। শহর এসে গেছে বিদেশের কাছাকাছি, ভোগে দুর্ভোগে মাখামাখি, তাই এখানে মুখে এসেছে আধুনিক মুখোশ, দেহে জড়িয়ে গেছে ডিসকোর ঝংকার, গণ-এর মুখোশ।

পুরুষের বেলায় ব্যাপারটা কেমন হয়েছে? প্রকৃতি তাকে গড়ে তুলতে জ্যামিতিক তুলির

ব্যবহার করেনি কিন্তু ত্রুটিপূরণ করার জন্যে অধিকতর দেশী শক্তি, নাস্তিকাবিহীন প্রবৃত্তির মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত-অবারিত রাসায়নিক রসের যোগান ব্যবস্থা এবং সেই সূত্রেই দীর্ঘতর ভোগজীবনের এবং বহু-ভোগস্পৃহার উৎসমুখটি অবাধিত রেখেছে। নারীকে দিয়েছে স্নেহ মমতামতার শান্ত প্রবাহ, ধারণ-প্রসব লালন-পালনের অন্তঃপুর, আর কেড়ে নিয়েছে যথেচ্ছার স্বাধীনতা। নারীদের মধ্যে যারা এই বঞ্চনাকে শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারে নি, পারে না, তারা বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে স্ব প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুখোশ এই যুদ্ধের পর্বে-পর্বে অঙ্গে অঙ্গে বদল ব্যবহৃত। কিন্তু প্রকৃতির আপন নিয়মের বেড়াজালে সেখানে প্রাপ্তির হিসেবে ভোগ যেমন আছে দুর্ভোগও কম নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম পুরুষকে ভোগের অংশে সমৃদ্ধ করেছে, দুর্ভোগের বেড়াজাল তার জন্যে পাতা নেই। দেহের বহিরাবরণে পেলব সুন্দরের ছড়াছড়ি বরদান নেই কিন্তু অন্তরের মুক্তির ঝির ঝিরে ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবেই দান করা আছে।

যুগ যুগ ধরে পুরুষ তাই ভোগের অঢেল প্রবাহে ভেসে যেতে পেরেছে। প্রকৃতির দেওয়া ভিতে সে সন্তুষ্ট না থেকে নিজের বুদ্ধি-শক্তি-কৌশলে সেই ভোগের গভীরতাকেও বাড়িয়ে চলেছে, প্রসারকেও অসীম করে তুলতে চেয়েছে। উদ্ধত-ভোগবাদের মূল কথাই অপরের বঞ্চনা, সেই উদ্ধত থেকে বঞ্চনা। কিন্তু বঞ্চনাকে যদি বঞ্চিতের কাছে প্রাপ্তি বলে দেখান যায়? এই কারিকুরিতে প্রশংসা এক বিরাট ভূমিকা নিতে পারে। মুখে মুখে প্রশংসার চাইতে গল্পে উপন্যাসে, কাব্যে-গানে যদি তাকে, সেই প্রশংসাকে, শাশ্বত রাখা যায় তাহলে মন্ত্রের মতো কাজ হবে, যাদুর মতো প্রভাব পড়বে, আর প্রতিপক্ষের মনে অবশ-বিবশ আত্মঘাত বাতাবরণ তৈরি হবে। নারীকে তাই দেবী বানিয়েছে পুরুষ, সতীত্বের আদর্শে মহিমময় করে তুলেছে পুরুষ, সুন্দরের বেদীমূলে প্রতিমা করে সহস্রমুখে স্তবস্তুতির ব্যবস্থা করেছে পুরুষ। প্রাণোন্মেষসাইত নারীকে নিয়ে, এই অবশ-বিবশ অসাড়-বিবেক নারীকে নিয়ে পুরুষ মহানন্দে তন্ত্র সাধনায় মন দিয়েছে। নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়াল করে, মুগ্ধ-প্রকৃতির অফুরন্ত পূজার ভোগ-উপভোগে গা ভাসিয়ে দিতে পুরুষ তাই মুখোশের অনন্তভাণ্ডার করায়ত্ত করে তুলেছে। সভ্যতার ইতিহাস পুরুষের ভোগের ইতিহাস। অথবা বলা যায়, নারীর বঞ্চনার ইতিহাস।

তাই দেখতে পাই গৃহের গণ্ডিবদ্ধ সীমার মধ্যে নারীকে সতীত্বের দীপশিখাটি করে ব্রত-পার্বণে গর্ভে-প্রসবে লালনে পালনে একজবা রেখে পুরুষ নিজের জন্যে অসীম মুক্তির ব্যবস্থাপত্রটি মুষ্টিবদ্ধ রাখছে। গৃহে নারী দেবী, গৃহলক্ষ্মী। গৃহে, কিন্তু পুরুষের কাছে নয়। পুরুষের কাছে সেই দেবীই সেবিকা। পুরুষ, পতিরূপে, পরমেশ্বর, গুরু, সেবিত, পূজিত। নিত্যকর্ম পদ্ধতি। উদয়াস্ত পরিচারিকা, রাত্রি সিংহাসন নড়নের দাসী, দিনান্ত শবরী এবং অবশ দেহ নিশান্ত নর্মসহচরী। নারীর বিশ্ব চরাচর গৃহ-সংসারের চৌহদ্দিতে আষ্টে পৃষ্ঠে ঘেরা। পুরুষ কিন্তু চরে বেড়ায় যত্র তত্র। প্রয়োজনের আর ভোগের দর্শনিক তার খোলা। ঘরের দেবীকে সেবিকারূপে গৃহবন্দি রেখে হাসে-লাসে ভরা কোঠাবাসী-ভাড়াবাসী 'দেবী'-সান্নিধ্যে ভক্তিগদগদ চিত্তে পূজাপাঠ সমাপনে মন দেয় পুরুষ। পুরুষের কাছে দেবীরা 'ওমনিপ্রেজেন্ট'। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে! সেই গুণ অবশ্যই সতীত্ব। পুরুষ সংসারের কেউ নয়? নারীর যে গুণ সংসারকে সুখের মহাসমুদ্র করে তুলতে পারে সেই গুণের ছিটে ফোঁটাও পুরুষের জন্যে ধার্য নয়? স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—দেবতারাই জানে না তো মানুষ কোন ছার! তাহলে কি বলা যাবে? স্ত্রীলোকের ভাগ্য আর

পুরুষের চরিত্র খোলা বইএর পাতা, সকলেই জানে, সকলেই পড়ে ফেলতে পারে? আমরা মনে-মুখে এক? মুখোশের মরুভূমিতে জলবিন্দুর অন্বেষণ হয়ে দাঁড়াবে না?

কদিন আগেই একটা পরিসংখ্যান দেখছিলাম। একা একা থাকার বাসনা আধুনিক শহর-শিক্ষিত মনে বেশই উর্ধ্বগতি। নারীরা একা একা থাকতে চায় এবং থাকতে পারেও। প্রকৃতি, প্রগতি এবং বাসাবাড়ি লাইফ স্টাইল তাদের সাহায্য করে। পুরুষরা একা থাকতে চায় এবং থাকতে পারে না। অনুরূপেই লাইফ স্টাইল তাদের তাড়িত করে, সাহায্য তো করেই না বরং নারী-নির্ভরশীলতা অনেক আনচান ঘটায়। আড্ডা-ইয়েদার থেকে মৌথ-ইয়েদার পর্যন্ত, মিক্সিং ইয়েদার থেকে লিভিং ইয়েদার অবধি গড়িয়ে যেতে চায়। বেঁচে থাকার প্রাথমিক দায় সন্তানের প্রথম থেকেই নারীর ঘাড়ে চাপান আছে বলে পুরুষ সেই প্রথম থেকেই খাদ্য-বস্ত্র ভোগ-উপভোগে পরনির্ভর,পরমুখাপেক্ষী।

আবার আর্থিক গতির হেরফেরে নারীর ও পুরুষের মন-মুখ পালটায়। দিনের শতকাজে ও সহস্র ঝামেলায় নারী গৃহমুক্তাতে, নারীই গৃহের কর্ত্রী। কিন্তু সূর্য যবে গেল পাটে, গভীর হইল রাতি—অমনি নারী-পুরুষের জীবনদর্শনে আকাশ-পাতাল ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরুষ দৃষ্টি কান একাগ্র করে নারীর কণ্ঠ-নিসৃত ললিত-ঝংকৃত বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে গেল। সকল সাংসারিক সত্তা এবং সমস্ত পারিবারিক তথ্য অকাতরে সংগ্রহের ঝুলি ভরে তুলল—অবারিত, অবিরত। সমুদ্র জীবন-মন্থনের ওই তৃষ্ণার্ত প্রাপ্তির আড়ালে আহুতি-ক্ষরণের অপেক্ষায় পুরুষ তখন পলিপড়া নদীবক্ষের মত নরম, পেলব, মসৃণ। অথচ গৃহ গণ্ডির বাইরে, দিবালোকে, পুরুষের সিংহবিক্রম। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির বহু-সম্পর্ক বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্রে নারীর স্থান অন্দরমহলে, পুরুষের ক্ষেত্র বিরাট-ব্যাপক-বহুধা বিস্তৃত। এই যে জীবন দর্শনের হেরফের, মূল্যবোধের তফাত এর মূলে কি আছে? কোনটা নারীর মুখ আর কোনটা তার মুখোশ? কোনটা পুরুষের মুখ আর কোনটা মুখোশ? নারী পুরুষকে নিয়ে খেলে এবং খেলায় রাতে। পুরুষ নারীকে বঞ্চিত করে, শোষণ করে দিনে। দুজন দুজনকে প্রভাবিত করে। মনে নয়, মুখে নয়, মুখোশের প্রভাবে।

(৪) রাষ্ট্রের এলাকায়: (ক) পার্টি ও নেতা

সংসার-পরিবার ছেড়ে এবারে সমাজে-রাষ্ট্রে নজর দেওয়া যাক। ঘনিষ্ঠ গণ্ডিতে মাতা-পিতার দ্বৈত সম্পর্কে অথবা সন্তান সন্ততি নিয়ে যে বহুধা আপন আপন বৃত্ত সেখানে মাঝে মাঝেই মুখোশের আড়ালে স্নেহ-মায়া-মমতায় ঘেরা মুখগুলো উঁকি দেয়, দেখা যায়। কিন্তু সমাজে-রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা নেতা-নেত্রীদের পরিমণ্ডলই আলাদা, শতসহস্র হয়ে তারা আমাদের নেতৃত্ব দেয়, পথ দেখায়, তারণ করে, লক্ষ্যে মোক্ষে পৌঁছে দেবার জন্যে সদা সর্বদাই আত্ম বিসর্জন দিয়ে কোমরে গামছা হয়ে জেগে থাকে। আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই তারা অবনী পরে, সমাজ চত্বরে, রাজ-রাজনীতির ঘূর্ণিজলে ধর্ম বিশ্বাসের পাদ পীঠতলে। তারা সকলেই ব্রতী, উদ্ধারের ব্রত তাদের অস্তিত্বের ধমনি পথে দিবস রজনী প্রবাহিত। এই প্রবাহ কখনও অশান্ত কণ্ঠে ধ্বনিত, কখনও বা নিমগ্ন-শান্ত ছায়াবীথিতলে মন্ত্র মুগ্ধ উচ্চারণে মজ্জিত। এদের মন বলে কিছু আছে কি না তা জানার উপায় নেই—নিজেদের উপায় আছে কি না তা তারাই জানে, অপরের যে জানার উপায় নেই তা সকলেই জানে। মন নিয়ে এরা কারবারই করে না। পাড়ার নেতা পাড়া নিয়ে ব্যস্ত, গ্রামের নেতা গ্রাম নিয়ে, সমাজের প্রধান সমাজের সার্বিক স্বার্থ দেখতে স্থির-দৃষ্টি বলে ব্যক্তি-স্বার্থ আউট-অব-ফোকাসে সরে

যায়। পার্টির নেতারা পার্টিকেই বেশী বানিয়ে কোনও না কোনও মন্ত্রের যান্ত্রিক সাধনায় তান্ত্রিক মতের মারণ-উচাটন প্রক্রিয়ায় রক্ত-ধাঁধি, গদা-জাগ্রত। মানুষের মধ্যে পরার্থপরতা যতো বাড়ছে, স্বার্থচেতনা ততো কমছে, পার্টির সংখ্যা ততোই বেড়ে চলেছে। দেশময় তন্ত্র সাধনার মহাযজ্ঞের দিন প্রায় সমাগত। এরা সকলেই মাতৃঃ মন্ত্রে সঞ্জীবিত, ভূমির সূক্ষ্ম লক্ষ্যে উর্ধ্বশ্বাস, আর নিজেদের মধ্যে নিরন্তর ভূতাত্মাম নীতিতে দুধে-আমে মাটপাট। এদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার সাধ্য কার? তবুও পঙ্গু যেমন গিরি লঙ্ঘনের চেষ্টা করতে পারে তেমনি চেষ্টা করতে যদি না সিদ্ধি কোথায় দোষং?

সংসারে যেমন উদয়াস্ত দিনচক্র আছে, পূজা পার্বণে যেমন নিত্যকর্মবিধি আছে তেমন নেতাগিরিতে আছে ক্ষেত্র-কর্ম-বিধি। এই ক্ষেত্র-কর্ম-বিধি এমনই অমোঘ যে এর অন্যথা হলে নেতা সিঁড়ির যে ধাপেই থাক না কেন হঠাৎ দেখবে পায়ের নিচে আর কোন ধাপ নেই—ধপাস আছে। কিন্তু আশা এদের বেলায় ধেনুমার কুহকিনীই নয় এবং এরাও কোন অভাগিনী নয়। তাই পরস্বার্থ মন্ত্রে অচিরেই উজ্জীবিত হয়ে—না ভিক্ষার সন্ধানে নয়, নতুন পার্টি গড়ার সমাজ-রাষ্ট্র নিবেদিত কাজে মন দেবে। এরা মাকড়সার মতো জাল বিস্তারে কুশল এবং মাকড়সার মতই জাল-কেন্দ্র-ক্ষেত্র থেকে বিক্ষিপ্ত হলেও নিজের নিজের উর্ণনাভ-সূত্রে ঝুলে থাকতে পারে, আবার উঠে আসতে পারে, আবার জাল বুনতে পারে। নেতাদের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি অবশ্যই স্নেহ-উৎসারিত রাসায়নিক সুতো নয়, মস্তিষ্ক সঞ্জাত কলাকৌশল আর পরার্থপরতার স্থির-লক্ষ্য আলোক-বর্তিকা।

ভূমিকা হিসেবে মাকড়সার উপমাটি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই নেতারা সকলেই ঈশ্বর তুল্যও বটে। কারণ এরা ঈশ্বরের মতই সর্বত্র-দৃষ্টি, সর্বজ্ঞানী, সর্বক্ষম এবং সর্ব-সহিষ্ণু স্বভাব। ঈশ্বর সাধনার ব্রত উদ্যাপনে যেমন ক্ষুদ্র আত্মসর্বস্বতা বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ আত্মোপলব্ধির পথ করার ডাক আছে, তেমনি নেতৃত্বের সাধন মন্ত্রেও অপরের কারণে নিজের নিজের স্বার্থবলির ডাক আছে, সকলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অনেকের কষ্ট স্বীকারের ঘোষণা আছে এবং দেশের কারণে বহুজনের করুণ অবস্থা মেনে নেবার চাপ আছে। ঈশ্বর তুষ্ট হন কিনা জানি না, তবে নেতার তুষ্টিতে যে সকলের পুষ্টি তা নেতারা অবশ্যই কষে-কষে বুঝিয়ে দেয়। অথবা, প্রসেশনে-ঘেরাও-এ, মিটিং-মিছিলে, ভোট-রোধ-পথ-রোধ আন্দোলনে।

এসবই আমরা সকলেই জানি। মানি বা না-মানি জানার তাতে হেরফের হবে না। সকালে বাজার করতে গিয়ে দেখবেন বাজার বন্ধ, অফিস যেতে পথে ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ, রাস্তা বন্ধ। কল্পনাকে একটু ঝাঁকুনি দিন দেখবেন আমার কল্পনার ধরনা-ক্ষমতার চাইতে আপনার মাথাটি অনেক বেশি দুধ-ধরাবে। নেতা ছাড়া এসবের কোনওটিই কি সম্ভব?

নেতৃত্বের গঠন অনেকটাই পেঁয়াজের গঠনের মতো। পরতে পরতে পরিকল্পনা আর ধান্ধার আঁটো সাঁটো বাঁধনে নেতৃত্বের অন্তর-বাহির সজ্জিত। এই সাজটাই আসল, দৃশ্যমান, বিদিত। অন্তর বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সে সেই কৌটোর মধ্যে কৌটো, তার মধ্যে কৌটো.....শেষ কৌটোর মধ্যে প্রাণ তোমরার মতো যখন প্রকাশ পায় তখন আখের গোছানো হয়ে গেছে। কেউ বিধবার পুকুর, নাবালকের সম্পত্তি অথবা সরল বিশ্বাসী প্রতিবেশীর সীমানা থেকে ছাঁট চিতে পুষ্ট একফালি জমি আত্মসাৎ করে নিজের বসত বাড়িটির দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রস্থের সমতা এনে ফেলেছে (পাড়া, গ্রাম, এলাকার নেতা), কেউ সকাল-দুপুর এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে করে মিটিং-মিছিলের আগে আগে চলে চলে, রাত-বিরেতে রাজনীতির ঘোর পাঁচ বুঝিয়ে বুঝিয়ে নিবেদিত প্রাণ জীবন যাপন করতে করতে

সকলের অজান্তে কিন্তু চোখের সামনেই নিজের পুরোনো নজর টানির আচ্ছাদনের জায়গায় দোতলা-তেতলা ছাদ আঁটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, অথবা লবন-হ্রদের মধ্যে বা কাছে নিরাপদ জীবনের মোদা একটি বাগান ঘেরা 'মাথা গোঁজার' ঠাঁই করে নিয়েছে (সরকারে আছে এমন দলের নেতা)। এই নেতারাই উচ্চস্তরের বা জাতীয় স্তরের হলে কখনও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্যে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের সিন্দুক উন্মুক্ত করে অর্থের প্রবাহ বইয়ে দেবে, [প্রবাহের কতোটা কোথায়, কোন মরুপথে দিশা হারায় তার হদিস মরণশীল জনগণের বিবেচ্য নয়!] কখনও দেশী-বিদেশী লেনদেনের মাঝ মধ্যিখানে কারেনসীর ভাগবাটোয়ারার অনার্জিত অংশ কর্পূর করে সাধনোচিত দিশা দেবে [তৎ তৎ কালের জাগ্রত নেতা-দেবতা হওয়া চাই!] কখনও কোন গোষ্ঠীকে তাতিয়ে-মাতিয়ে তাদের উত্তাল-নির্বোধ ছেউরূপ স্কন্ধে চেপে দরদাম (বাগেইন) করার মতো উচ্চতা থেকে জনগণের অধিকার আদায় করার নামে নিজ নিজ পুষ্টি বাড়াবে, ধাপে ধাপে বারে বারে জনতার আহুতি দিতে দিতে নিজেদের চিকন-মসৃন চেহারা দেবে (গোষ্ঠী নেতা—জাত, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি!)। আর যারা শ্রেষ্ঠ নেতা, এক নম্বর চেয়ার যাদের মাপে তৈরি বলে মনে মনে বিশ্বাস, তারা চেয়ার দখলের দাবা-খেলায় মাতোয়ারা থেকে মুখে মুখে, বচনে ভাষণে, রেডিও-টিভিতে প্রেস-কনফারে জনগণের জন্যে মাছ কাটলে মুড়া দেবো, গাই বিয়োলে দুধ দেবো, বর্ষা হলে ফসল দেবো.....উদাত্ত কণ্ঠে সামগান গাইতে থাকবে।

নেতা হওয়া কিন্তু মুখের কথা নয়। প্রসব করলেই যেমন মাতা হওয়া যায় না, তেমনি জনগণের দুঃখ বেদনা বঞ্চনা-মন্ত্রণার কথাটি যথাস্থানে পৌঁছে দিলেই নেতা হওয়া যায় না। মুখোশের আড়ালে অন্য একটি মুখ আড়াল করে না রাখতে পারলে নেতা হওয়া হবে না। সেই আড়ালে আবডালে লুকিয়ে রাখা মুখটাও যেন কোনো নিজস্বতা দৃষ্টতা না দেখায় সেটাও দেখতে হবে। ক্ষমতাবান বা শক্তিমান যে ভাবে সেই মুখটিকে দেখাতে বলবে সে ভাবেই দেখাতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ক্যামেলিয়ন হতে হবে। সামনে লড়াই। লড়াই-লড়াই-লড়াই চাই। ঠিক আছে। পিছনে অবশ্যই লাইন অব কম্যুনিকেশন ঠিক রাখতে হবে। বলতে পারেন ডবল-এজেন্ড সোর্ড, স্টিং ওয়াকিং। যাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি আছে তাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু মরণশীলদের জন্যে অত্যন্ত দুরূহ জানবেন।

চোরের আমি গৃহস্থের আমি, বরের ঘরের মাসি এবং কনের ঘরের পিসি—বলতে নেতৃত্বের এ-এক বিষম দায়। নেতার কাছে যারা আনীত, যারা আহূত অথবা রবাহূত, যারা সব দেখেশুনে জেনেবুঝে 'নেতা ছাড়া গতি নেই'- বলে মনে মনে স্থির জেনে গেছে তারা যেন সদা সর্বদা সেই অনুভবের উচ্ছমূলে প্রয়োজনীয় সেচন পায়।এই সেচন বাক্যে এবং ব্যবহারে, কৃপাবর্ষণে এবং অকৃপণ আপন বোধের পরিবেশনে হতে পারে। অথবা যোগাযোগে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রোটেকশন হতে পারে। এই সব পথ প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি, নেতা হতে গেলে, দাবাড়ুর মাথায় যেমন চালের পর চাল এবং প্রতিচাল খেলানো থাকে তেমনি নেতার মাথায়ও সাজান থাকা চাই। মরণশীলের পক্ষে চাল ভাল তেল নুন পান হয়ে এই চালের যোগান থাকা কি সম্ভব? এক ধাপ নিচের জনগণকে যেমন সেচনে ভিজে-ভিজে নরম-নরম রাখতে হয় তেমনি এক ধাপ উপরের নেতাকেও ভেটে-নৈবেদ্যে-পূজা-উপচারে সম্পৃক্ত রাখতে হয়। নেতা মানেই মধ্যবর্তী নেতা। নিচে বহু আর উপরে কতিপয়। নিচের বহুকে নিয়ে ভয়, সদা সর্বদা সামলানোর ভয়। উপরের কতিপয় নিয়েও সংশয়। পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায়

ক্ষুরধার পথের কি-হয় কি-হয় সংশয়। মরণশীলরা রক্তচক্ষে আক্রান্ত হবে, অমর নেতাগণ রক্তের চাপকে সকলের ধমনিতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রয়োজন মতো ট্রাফেটিকে আক্রমণ করবে।

দেবকুলে যেমন তেত্রিশ কোটি দেবতা, নেতাকুলেও তেমনি অসংখ্য অগণিত নেতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। পলিটিকস্-ইকনমিকস্-সোশিয়োলজি সমান ভাবেই ভারতীয় দর্শনে-ধর্মে-জীবনে সত্য। মতের ভবিষ্য কোন দেবতার প্রাপ্য, কোন দেবতাকে দেয় তা নির্ভর করে বহু বিষয়ের উপর। যে জানে সে সবচেয়ে জানে, যে পারে সে আপনিই পারে—পারে সে মন ভোলাতে—দেবতার এবং অপ-দেবতাদের (জনগণ)।

ভারতীয় দর্শনের, সবিশেষ বেদান্ত দর্শনের, সার্থক এবং প্রকৃষ্ট প্রয়োগ দেখবেন ভারতীয় জনমনে। অজ্ঞতার প্রায়ান্ধকার বাতাবরণে ব্যক্তি-দৃষ্টি সর্বজ্ঞেয়ই নেতা-দৃষ্টি, নেতা-নির্ভর—পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে-গঞ্জে, স্কুলে-কলেজে, হাট-বাজারে এবং অবশ্যই ভোট-নির্বাচনে। এই ব্যক্তিগত অজ্ঞতার সঙ্গে সার্বিক মায়া-বাদ সোনায় সোহাগা হয়ে ভারতীয় জনগণকে নিমিত্ত-মাত্র অস্তিত্বের অন্ধে জন্মে ভিক্ষুক-জীবন দান করেছে। মৎস্য-জীবন। মৎস্য মাছই খাদ্য। কেউ বলে শোষিত, কেউ বলে ক্ষেতমজুর। কিন্তু সেই ভক্তিরসের অফুরন্ত প্রবাহে জনচিত্ত যখন সম্পৃক্ত থাকে তখন শোষককে আর শোষক বলে মনে হয় না, ক্ষেতমজুর থেকে সেবকের নম্র-নত নিবেদিত-চিত্তটি প্রকাশ পেতে পারে। এর সঙ্গে পূর্বজন্ম-পরজন্ম সংস্কার-কর্মফল ইত্যাদি সনাতন সত্য যোগ করে দিতে পারলে সেই সোহাগা-বিগলিত সোনাই দৈনন্দিন ব্যবহারের অলঙ্কার হয়ে দেখা দেয়।

বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করে মানুষ, ক্ষমতাবান মানুষ, তাকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে, লাগায়। নিউক্লিয়ার পাওয়ার। ধর্মের শিব, মূল্যবোধের সুন্দর আর দর্শনের সত্যকেও মানুষ কাজে লাগায়। অন্ধ। অজ্ঞতার অন্ধকারে আর মায়াবাদের আচ্ছাদনে মানুষের মনোজগতে যে সহস্র সহস্র হিরোসীমা-নাগাসাকি ঘটে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান সহস্র-আউট মগজমধ্য বিন্যস্ত হয় নি। হয় নি, হবেও না। হবে না কারণ মায়াবাদ যদি ব্রহ্মের মুখোশ (সেখানেও মুখোশ?), যে মুখোশে সত্যকে, শাশ্বতকে, রূপকল্প ঈশ্বর বলে মনে হতে পারে, হয়ে থাকে, তাহলে নেতাদের দোষ কোথায়?

(খ) শিক্ষক : শিক্ষাক্ষেত্র :

শিক্ষার ক্ষেত্রে [illegible] বলতে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা পরিকল্পনার পুরোহিতরা। এই নেতাদের আটপৌরে অবস্থান [illegible] সংসারে, পাড়ায় ক্লাবে, বাসে-ট্রামে, বাজারে-ক্রিয়া দেখুন। দেখুন আর এদের চিন্তা ভাবনা আবেগ-অনুভব আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিগুলো দেখে রাখুন। এবারে যাবেন ওদের নেতৃত্ব ক্ষেত্রে। চিনতে পারবেন না। দীর্ঘ লালিত আচরণ বিধির চাপে এরা বইয়ের ভাষায় কথা বলবে, কেতাবী কায়দায় নড়াচড়া করবে আর উচিত-অনুচিত বিষয়ে অনর্গল উপদেশ নির্দেশ দেবে ছাত্র ছাত্রীদের। আপনি আচারি ধর্ম পরেরে শেখাই—একেবারেই পুরোনো, বস্তাপচা, অবসোলিট। আমি যা করি তা দেখবে না, আমি যা বলি তাই করবে—একেবারে আধুনিক, চালু এবং এরবসলিউট।

কে যেন বলেছিলেন প্রত্যেক শিক্ষকই, অধ্যাপকই পণ্ডিত ব্যক্তি। যে যে বিষয় পড়ানোর কথা সেই সেই বিষয় ছাড়া অন্য অনেক বিষয়েই, এমন অন্য সকল বিষয়েই তাদের পাণ্ডিত্য অপ্রতিরোধ্য বহমান। একমাত্র যে বিষয়টি শ্রেণীকক্ষের ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজন সেই বিষয়টির পাণ্ডিত্য,

শ্রেণীকক্ষে নয়, গৃহ-কক্ষের মেরাটোপে নোট-রূপ কবরকুণ্ডলে পরিবেশিত। এতে দাতা ও গ্রাহক উভয়েরই মঙ্গল সূচীত হয়। জ্ঞানের অকারণ মেদ ও অপ্রয়োজনীয় বপু বর্জিত হয়ে পুরিয়া-পুরিয়া আকারে গ্রাহক পরীক্ষার সময় সহজ বোধ করে আর শিক্ষক-অধ্যাপক বিন্দু বিন্দু [এখন আর বিন্দুতে কুলোয় না!] অর্থের ধারাপাতে হাট-বাজার-সংসারকে অনেক সচ্ছল করে উপভোগ করতে পারে। শিক্ষকরা বড়-বড় ক্লাসে রোল কল করে; ছোট-ছোট ক্লাসকে হোম-কল করার কল পাতে। সব পুজোয় যেমন সমান লোক সমাগম, আড়ম্বর এবং আমদানি হয় না, একই মন্ত্র, একই আচার-অনুষ্ঠান চলে না তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিষয় বা সাবজেকটভিত্তিক আড়ম্বরাদি ঘটে, স্তর বা শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র সমাগমাদি ঘটে, সময় বা তাৎক্ষণিকতা ভিত্তিক আমদানির ব্যবস্থা থাকে। আর যদি পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোদাল শাবল একেবারেই ব্যবহার না ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট চাই তহলে শুধু শিক্ষক নয় মন্ত্র-তন্ত্রের সাধক আচারে-বিচারে পটু কতিপয় করিতকর্মা অদ্ভুতকর্মা সাধক-শিক্ষক-নেতার কাছে যাবেন।

সব শিক্ষক নেতা কিন্তু শিক্ষার বৃহৎ-ক্ষুদ্র জগতে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু কিছু শিক্ষক নেতাদের নাই বেয়ে পুরোহিতের ভূমিকায় পৌঁছে গিয়ে নিজে দেখার সুযোগ পায়। এরা সব জানে বোঝে, সব পরিষ্কার দেখতে পায়। তাই ইচ্ছে করলে এরা শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় জঞ্জাল দূষণ দূর করার পথ বাতলাতে পারে, সকল প্রকারের মাকড়সার জাল আর উইএর ঢিবি ভেঙ্গে দেবার পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব বিভেদের বীজ, বিষবৃক্ষের বীজ আর জাতি-ইত্যাদি-অজ্ঞতার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া আছে তা সমূলে উৎপাটনের পথ দেখাতে পারে। পারে কিন্তু করবে না। কেন করবে না? করবে না কারণ এরা কেউই কালিদাস হতে রাজি নয়। যে ব্যবস্থায় তাদের নিজ নিজ নেতৃত্ব, নিজ নিজ চেয়ারের দখল সম্ভব হয়েছে সেই ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হবে না? তা ছাড়া যদি কোন প্রহ্লাদ দেখা দেয়ই তাহলেও কুলদেবতাদের যৌথ আক্রমণে সে পুনর্মূষিক হতে বাধ্য। নেতারও নেতা আছে যে!

তাই জনগণের জন্যে ঝড়ে কম্পমান জলে ভিজে সাঁতসেঁতে চালাহীন বেড়াহীন পাঠশালার ব্যবস্থার পাশাপাশি মনঃপুত-মনোনীত জনদের জন্যে এলাহী ঝিলমিল-ঝিলমিল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থাকছে। শ্রেণী সংঘর্ষ দূর করতে সুপরিকল্পিত সুবিন্যস্ত শ্রেণী নির্ভর শিক্ষার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থাটি পাকা করে তোলা হয়েছে, হচ্ছে। কাজলী ভোজের পানের ব্যবস্থায় শুরু হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে উন্নত হতে হতে রাষ্ট্রীয় ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মেরিট নয় মানি, স্টেট পলিসি নয় স্ট্যাটাস সচেতনতাই মোটিভেটিং ফ্যাকটর। ডেস্টেড ইন্টারেস্ট, প্রাপ্তকে প্রাপ্য করে রাখার মনোবাসনা। কিন্তু কমিটি-কমিশনে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রেখে এমন একখানা দৃশ্যমান মলাট টান টান তুলে ধরা হবে যেন সকল নেতারাই সকলের জন্যে, জনগণের জন্যে, মনপ্রাণ ঢেলে শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনাটি পেশ করল। ইতিহাস-ভূগোল, অর্থনীতি-সমাজনীতি, দর্শন-নীতিবোধ রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির এমন ঘোর ঘোঁটা উপস্থাপনা থাকবে যে সাধারণ লোকেরা সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্থনের অভিঘাতে ভোম কানা হয়ে যাবে। শ্রেণীভেদ জাতিভেদের বিরুদ্ধে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে এরা, এই নেতারা, চুপিসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ভেদ-কে সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠ করে তুলবে। তলে তলে নিজেদের সন্তান সন্ততিদের জন্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমকে প্রায় জন্মাবধি চালু রেখে শিক্ষার বৃহত্তর সামাজিক জীবনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সীমিত করে রাখবে। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অরাজক

তার পড়াশিকার দেশের স্রোতের বাইরে তৈরি হয়ে চলেছে এক ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী যাদের পদধ্বনি দেশের মাটিতে কিন্তু মন-মাথা বিদেশের আকাশে অক্সিজেন গ্রহণ করে জড়ায়। ক্ষমতা, অধিকার, শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাপ্তি তাই ব্রাহ্মণ, কুলীন, বংশ-ভ ডাইনেস্টিক হয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এই নেতারা যা বলে, ভাবে, প্রকাশ করে, ঘরের বাইরে জনগণের কাছে সেই কথা বলে না, সেই বিষয় ভাবে না এবং সেই মনোভাব প্রকাশ করে না। ক্ষেত্র-কর্ম-বিধির অমোঘ নিয়মে সুনির্বাচিত মুখোশটি চড়িয়ে রাখে। এই সত্তা!

শিক্ষার বিষয়কে বইয়ের পাতায় আটকে রেখে, পড়ুয়াকে চার দেয়ালের ঘেরাটোপে আবদ্ধ রেখে এবং শিক্ষকদের দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুরাজভোগী সৎ-নাগী–সন্ন্যাসী জীবন যাপন করতে বাধ্য করে শিক্ষা জগতের সুষ্ঠু মার্গ নেতারা একদিকে নেতৃত্ব কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছে অন্য দিকে, সেই ব্যবস্থার অনিবার্য ফলস্বরূপ, বহুবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক রোগ ও দেখা দিয়েছে। বেকারিত্ব কোনও রোগ নয়, রোগের জন্মভূমি, লীলাক্ষেত্র। দেশময় বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিলে কোটি কোটি টাকার নয় ছয় করার সুযোগ যতোটা ঘটে ততোটা শিক্ষার বিস্তার ঘটে না। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব সাধনার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় বটে কিন্তু শিক্ষার মর্ম মনের গভীরে প্রবেশ করে না। নেতারা এ সবই জানে। জানে যে শিক্ষা যদি জীবন কেন্দ্রিক না হয়, যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষা ছাড়া আর সব কিছুই হয়ে ওঠে তাহলে দল ভারি হয় ঠিকই কিন্তু দ্বারা সোজা হয়ে ওঠে না, বাড়ি হয়ে স্বতন্ত্র হতে পারে না। জেলের ছেলেকে মাছ আর জল থেকে উৎপাটিত করে বইয়ের পাতায় ছুড়ে দিলে উভয় সংকট অনিবার্য হয়। জল আর মাছের ভাষায় তার শিক্ষা হলে বইয়ের মধ্যেই সে চারপাশের জীবনকে খুঁজে পায়। সংকট ধারে কাছে আসে না।

কিন্তু সংকট না থাকলে নেতার যে নেতা তার চলে কি করে? সমস্যা না থাকলে সমাধানের জন্যে লোকে জন্যে হয়ে নেতা খুঁজবে কেন? বৃহৎ এবং বৃহত্তর নেতাদের কাজই তো সংকট আর সমস্যা তৈরি করে দেওয়া। তবেই জনগণ আলোড়িত হবে, বিভিন্নতা-বিচ্ছিন্নতা দ্বারা শতধা হবে আর দৌড়ে যাবে নেতার কাছে–'পথ দেখাও পথ দেখাও'। অহংকারের মুখের সামনে দ্বিতীয় নেতৃত্বের মুখোশটাকে তখন অনেক বেশি পালিশ দেওয়া যাবে, অনেক বেশি ঝেলানো যাবে এবং জনগণের নির্ভরশীলতাকে অনেক বেশি নির্ভর করে সামনের ধাক্কা স্থির করা যাবে। এমন ভাবেই সমাধান করতে হবে যেন অনেক বেশি ভবিষ্যতের সংকটের বীজ বুনে রাখা যায়। ওরা জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরে যাবে ক্ষুলে-কারেজে, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, জলে-জঙ্গলে। নেতা অপেক্ষা করবে অধিকতর সংকট আক্রান্ত বিভেদ জর্জর পুনরাগমনের। এই বীজ বোনার ক্ষমতা এবং দূর দৃষ্টির উপর নেতৃত্বের অগ্রগতি নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, সেই বীজ যাতে যথা সময়ে অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সংকট-সমস্যা তৈরি করতে পারে তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, সময় মতো জলসেচন দেওয়া ইত্যাদির জন্যে সচেতন থাকাও নেতার দায়। তাই লোকবল লাগে, ক্যাডার লাগে, বৈঠকখানায় সদা সর্বদা বহুজনের ধুনি জ্বেলে রাখতে হয়।

তাই উর্ধ্বমার্গের নেতারা, সে শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক আর অন্য যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক, কখনই আর বিষয়ে আটকা থাকতে পারে না। শিক্ষক শিক্ষা ছাড়া আর সব কিছুই দান করে, ডাক্তাররা রোগীর সেবা ছাড়া, ধর্মীয় নেতারা ধর্মের মর্মটি ছাড়া এবং দেশের নেতা দেশের ও দলের মঙ্গলটুকু ছাড়া আর সবেই মনোনিবেশ করতে সময় পায়। সময় পায়? না, সময় করে করতে

হয়। স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এবং অগ্রগমন স্থির রাখতে। নিজের সাংসারিক সুখ, সামাজিক সুখ আর নেতার সুখের আদর্শ এক হলে চলে কি?

কিন্তু যারা সাধারণ শিক্ষক, নেতা-শিক্ষক নয় তাদের বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এই অন্যরকম হওয়ার প্রধান কারণ এই যে নেতাদের ক্লাস নিতে হয় না কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হয়। প্রথম গোষ্ঠী ছাত্রদের কোনও ক্ষতি করে না, দ্বিতীয় গোষ্ঠী—সাধারণ শিক্ষক গোষ্ঠী নিজেদের এবং ছাত্রদের — উভয়েরই ক্ষতি করে। ওরা পড়ায় না বলে ক্ষতি করতে পারে না। এরা পড়াতে হয় বলে অনিবার্য সুযোগ পায়। সাধারণ শিক্ষকরা তোতা কাহিনীর এক একটি তোতা। বইয়ের পাতা। হাতে-পকেটের চিরকুট অথবা মাথা-মগজের কোষে কোষে নোটেড-কোটেড! নিজ নিজ ছাত্র জীবনে বইয়ের পাতার বাইরে পদচারণা-পরিক্রমায় যেমন ইচ্ছা বা অবকাশ নেই। জীবনে জীবন যোগ করা হয় নি, বাধ্য তাই বিদ্যার পসরা। সেই বাধ্য পসরার বোঝা বয়ে বয়ে যখন ঘাড় বেশ শক্ত-পোক্ত হয়ে ওঠে তখনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সিলমোহর এঁকে দিয়ে যোগ্যতার মানপত্রটি হাতে ধরিয়ে দেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের নেতা-শিক্ষকরা ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষককে না খুঁজে সিলমোহরের ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত হয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে দেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের খাঁচায় খাঁচায় এই সব উন্নত মানের তোতারা কচি কাঁচা তোতাদের তালিম দিতে থাকে। শব্দ যত বাড়ে, শিক্ষার মানও তত বাড়ছে বলে নেতার নেতারা অন্যায় মন দেয়। চলছে, চলছেই।

পুরোহিতের যেমন নামাবলি, শিক্ষকের তেমন চাদর। কাঁধে চাদর, নিপাট চাদরখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপাট মানপত্রটির মতই একটি যোজনা। আজকাল অবশ্য সামার ঘুর্নি হাওয়ায় আর চুস্তবাস্ত আধুনিক জীবনের তাড়ায় শিক্ষকদের মলাট বা মুখোশ বলে কোন আবরণ-আভরণ নেই, তবে ভিতরের সীমাহীন নিঃস্বরিক্ততা আর বাইরের নিঃসীম বুকিশ বাকচাতুর্য, দেশী-বিদেশী জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের নাম উচ্চারের সাবলীলতা, উপস্থাপনার কায়দা—সব মিলে চকচকিয়ে দেবার মতো ব্যাপার। দৈনন্দিন সমস্যা-সংকটে সমাধান বাতলানোর মতো বাস্তব সম্মত সংগ্রহ নেই, আছে মাত্র আদর্শ আর নীতির ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ উপুড় করে দেওয়া এবং কাড়ি কাড়ি কোটেশনের আয়ত্তর উচ্চার। বুকিশ শিক্ষা ব্যবস্থা বুকনিপ্রধান হতে বাধ্য। প্রথমিক স্তর থেকেই 'শিক্ষিত' করে তোলার এই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র অমানুষ-অপটু করে তোলার পথই প্রশস্ত হয়েছে। শিক্ষকরা কাঁধে-চাদর পর্যায় পার হয়ে হাতে ফোলিও ব্যাগ, এটাচি, গলায় নেকটাই, অথবা কাঁধে শান্তিনিকেতন মার্কা ঝোলা ব্যাগে রূপান্তরিত। ছাত্ররা ইস্ত্রি করা ঋজু কলারে, গুরুপাঞ্জাবীতে জীবনের কর্মযজ্ঞ থেকে উৎপাটিত হয়ে অফিসের অনায়াস অহংতুষ্ট চেয়ারের অন্বেষণে সার্টিফিকেট বগলে ব্যাগ-ফাইল-কভারে দৌড়ঝাপ করছে। অন্তঃসারশূন্য মুখোশের উজ্জ্বল সমারোহ দেখে সকলেই বিমোহিত বোধ করছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কিছু না কিছু হতে হয়, করতে হয়। যে কামার হয় সে লোহা আর হাতুড়ি, চাপর আর আগুনের কাজ করে করেই কামার হয়। জেলেকে জেলে, কৃষককে কৃষক, চাকীকে চাকী হতে হয় এবং সেই সেই কাজ করে করে শিক্ষিত হয়। তেমনি পুত্রকে পুত্র, কন্যাকে কন্যা, মাকে মা, বাবাকে বাবা হতে হয়। পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে এমন শত শত হওয়ার ব্যাপার আছে। নিম্নতর প্রাণিজগতে এই সব হওয়ার বদলার সমান ভাবেই আছে। সেখানে প্রকৃতি শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। তাই সেখানে ভারুহীন তত্ত্ব সত্য। সত্য কিন্তু যোগ্যতমের উর্ধতন নিয়মকে মানুষ অমান্য করে

বয়সংখ্যকের মৃত্যু বা অপমরণকে নিশ্চয় করে দিয়ে সকলের জীবন সম্ভব করে তুলতে চাইছে। মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, শস্যের অধিক ফলন ইত্যাদি। প্রাকৃতিক হওয়াটাকে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির মাধ্যমে একটা অন্যরকম মাত্রার হওয়াতে উন্নীত করা হচ্ছে।

প্রকৃতিকে নিজের বশে আনার জন্যে যে শিক্ষা তা মানুষ নিজের জন্যে, নিজেদের মধ্যে কতিপয়ের জন্যে ঘটিয়ে চলেছে। কিন্তু নিজেকে নিজের বশে আনার জন্যে, নিজেকে জানার জন্যে, নিজ নিজ হওয়াগুলোর জন্যে তার শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষ নির্ভর না হয়ে প্রকৃতি প্রবাহ নির্ভরই থেকে যাচ্ছে। বইয়ের শিক্ষা নিছি পড়ে পড়ে, জীবনের শিক্ষা যা কিছু তা ঠেকে ঠেকে। তাই আধুনিক জীবনের পরেস্থারা পড়ছে শিক্ষার মুখে কিন্তু ভিতরের কাঠামোতে মধ্যযুগের সংস্কার-কুসংস্কার, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নখে-দন্তে অস্বস্তি-অস্থিরতা তৈরি করেই চলেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জমিতে পা রেখে আমরা বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর আকাশে শ্বাস নিয়ে চলেছি। ভিতরের আমি আর বাইরের আমিতে মুখান্তরের ব্যবধান ঘটেছে। বাইরের আমিটা, মুখোশটা সকলের দৃষ্টিতে পড়ছে, ভিতরের মুখটা চেনা যায় না সব সময়ে। হওয়াটা যথাযথ হয়ে ওঠে না, কিন্তু প্রয়াসটা স্পষ্ট-ভাবে দেখা দিচ্ছে।

এই প্রয়াসটাই আসল বলে দেহে-মুখে, চলনে-বলনে ঝুলিয়ে রাখি। রাখি যে তা কতো সহজেই ধরা পড়ে যায়। পলকা এই শিক্ষার বহিরাবরণটুকু জীবনের টেনশনে ছিঁড়ে যায়, ভিতরের নগ্নরূপের আভাস দেখা দেয়। শত শত উদাহরণ নিত্যদিন ট্রামে-বাসে, হাটে-বাজারে, অফিসে-কাছারিতে যেমন ঘটছে তেমনি ঘটছে গৃহে গৃহে, সংসারে-সংসারে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সম্পর্কে-সম্পর্কে। একটু থেকে একটু ঢেলেই, পান থেকে চুন খসলেই, ছোট-বড় স্পার্ক দেখা দেয়। সারমেয় দন্তপঙ্ক্তি উন্মুক্ত করে যেমন ভিতরের অ-শিক্ষিত আমিগুলো উঁকি দেয়, গজরায়, আক্রমণ করে, তেমনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ধুন্ধুমার পর্যন্ত গড়াতে পারে। এই পারেটার মূলে আছে সেই হওয়া ব্যাপারটার না হয়ে ওঠাটা। শৈশব থেকে হয়ে-ওঠার শিক্ষাটা না পেয়ে পেয়ে কিন্তু বইয়ের পাতা সংগ্রহের দীর্ঘ প্রথায় একটা প্রয়াস, মুখোশ, আমাদের প্রত্যেকের আমিটার উপর ধাপে ধাপে পড়তে থাকে। একটা সময়, তাই আমরা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে বসি যে, দরজার বাইরে ঝোলানো মতো যে নেম-প্লেটখানা চকচক করে অপরের কাছে আমাদের পরিচয় হিসেবে, সেই নেম প্লেটটাই আমরা। তখন আর মনে হবার সুযোগ ঘটে না যে জামা কাপড়ের অন্তরালে, সার্টিফিকেট-মানপত্রের বাইরে আমাদের প্রত্যেকের এক একটা ঘরোয়া মুখ আছে, আমি আছে। এই আমিটার সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে আমরা শৈশব-যাত্রা করি, শেষ পরিণতি নিয়ে কবরে-শ্মশানে যাত্রা করি। মাঝখানে মুখোশের জয়যাত্রা, অথবা বলা যায় পরাজয়-যাত্রা। নিঃশেষে মুছে যাবার যাত্রা।

(খ) ধর্মের ভেজাল :

শিক্ষার মতো ধর্মও একটা সামান্য-সার্বিক ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষাকে যতো সহজে বোঝা যায় এবং সে বিষয়ে বলা যায় ধর্মকে তাতো সহজে বোঝাও যায় না সে বিষয়ে বলাও যায় না। জটিলতর, উত্তেজক, বিস্ফোরক। 'হ্যাভস উইথ কেয়ার' ব্যাপারটা ধর্মের নাড়াচাড়ায় সর্বদা মনে রাখতে হয়। তাছাড়া 'দিস মাইন্ড আপ-বলে একটা চিহ্ন-ঘোষণা ধর্মের গায়ে লেপ্টে দেওয়া আছে—ঈশ্বর। সব সময়ই উপরের দিকে রাখতে হবে। অন্যথা চলবে না—অন্তত ধর্মপ্রাণদের জন্যে তো নয়ই।

জলের ধর্ম আছে এবং তা বুঝি। বাতাসের ধর্ম আছে তাও বুঝি। তেমনি মেঘের ধর্ম, আগুনের ধর্ম ইত্যাদি আছে। এই সব ধর্ম সংস্কারের নয়, উত্তেজক নয়, বিস্ফোরক নয়। যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব সম্মত নাড়াচাড়া এই সব ধর্মের বেলায় তাই সহজেই চলে, চলে আসছে। মানুষের বেলায় তার মনের ধর্ম, শরীরের ধর্ম ইত্যাদিও গোলমালের কারণ ঘটায় না। মানুষের ধর্ম? এখান থেকেই পা মেপে মেপে পা ফেলার শুরু। কেন? কারণ সেই ধর্ম যখন সার্বিকতায়, সামগ্রিক মানুষের বিশিষ্টতা নিয়ে নয় হবে তখন চলন-বলন সহজ-স্বাভাবিক থাকবে। মানুষের ধর্মকে মনুষ্যত্ব বলে ঘোষণা করলে বঙ্কিমের কায়দায় বলা যাবে যা থাকলে মানুষ মানুষ না থাকলে মানুষ মানুষ নয় তাই মনুষ্যত্ব, অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো রিলিজিয়ন অব মান বলে শিল্প সঙ্গীতে জীবনের পূর্ণতার অভিব্যক্তি খুঁজে নেওয়া যাবে। কিন্তু ধর্ম যখন বিশ্বাসের মায়া পাবে, ঈশ্বরের কোন-না-কোন রূপে-বর্ণে-ছটায় সম্পৃক্ত হয়ে হাজির হবে তখনই দুনিয়ার হবার সময় আসবে। এবারে আর বুদ্ধি-বিবেচনা যুক্তি-বিজ্ঞান বস্তুবোধ-চেতনাবোধ কোনও কাজে লাগবে না। কাজে লাগবে না তার প্রধান কারণ এই যে ইন্দ্রিয়পথ সকল রুদ্ধ করে ধ্যানমগ্ন হতে হবে। নিজ নিজ মনের গভীরে ডুব দিতে হবে। সুষুপ্তি স্তরের অনুরূপ স্তরে পৌঁছোতে পারলে নিজেকে জানা সম্ভব হবে, নিজের সর্ব-বর্জিত নিজটুকুকে জানা সম্ভব হবে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেছেন। তবে জানলে কি হবে, তাকে প্রকাশ করা যাবে না, মনের গোচরে সেই জানাকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এই এলাকার কথা বলার যোগ্যতা নেই কারণ এটা যোগীদের এলাকা, যোগসাধনের এলাকা। অমৃত উপলব্ধির এলাকা। মরনশীল আমরা যারা নুড় তাদের থাকা উচিত শতহস্ত দূরে।

কিন্তু দূরে থেকেও লড় শট্ট যা পাই তা কেমন? নিজেকে জান-র নিজেটা তাহলে অবাঙ্ মানসগোচর? পিওর বিইং? একটা অবিমিশ্র সাবজেকটিভিটি? এখানে পৌঁছে বিইং আর নাথিং একাকার। এটাই ব্রহ্ম স্বরূপ। যুক্তি-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার নাড়াচাড়ায়, বিশ্লেষণে-অনুসন্ধানে মনের মধ্যে মন, তার মধ্যে মনকে খুঁজতে গিয়ে এরকম একটা সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয় ঠেকবে না। কিন্তু বিপদ ঘটবে অন্যত্র।

আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করলে নিজেদের বাইরেটা ছেড়ে ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা খুঁজি করতে পারি। নিজের বলে যা কিছু জমা করেছি সময় করে তার প্রত্যেকটিকে নেড়েচেড়ে উল্টে-পাল্টে দেখে দেখে, বাতিল করে করে আপন আপন মনের গভীরে একেবারে স্বকীয় নিজেটার অন্বেষণ করতে পারি। কমবেশি এ-কাজ আমরা করেও থাকি। মেপে থাকি না বলে শেষ আমিটার হদিস করতে পারি না। তা, এই করতে করতে যদি শেষ পর্যন্ত যেতে পারি আর তখন যদি সবই বাতিল হয়ে হয়ে হাতে কেবল শূন্যই পড়ে থাকে, নাথিং-ই একমাত্র পাওনা হয় তাহলে সেই ফাঁকা-মুঠির মধ্যেও একটা কি-যেন-কি থেকে যায়। শূন্য-প্রাপ্তি, কিন্তু নিখাদ-প্রাপ্তি নয়। প্রকাশ করা যায় না, একটা কিছু যা আপন অস্তিত্বের অনুভবের মাত্রায় নিজের বলেই মনে হয়। একে যদি দার্শনিকেরা সৎ-চিৎ-আনন্দ অবস্থা বলেন, একজিসটান্স-কনসাসনেস-প্লিস বলেন অথবা বলেন 'অমৃত-স্বরূপ-ব্রহ্ম' তাহলে তা অস্বীকার করি কেমন করে? একটা বিজ্ঞানসম্মত কনস্ট্রাকট্—একটা 'ব্রহ্ম'। ইউক্লিডের 'বিন্দু'।

কিন্তু এই অন্বেষণ যখন নিজের ভিতরে না চালিয়ে বাইরের দিকে চালান হয়? তখনই বিপদ। ঐ একটাই ঈশ্বর হয়ে হাজির নয়। মনের নিভৃতে অতিপ্রাপ্তি তোলপাড় করে কিন্তু না

পেয়েও যে অনুভব পাই তা বাস্তব অনুভব, বিশ্বের মহাশূন্যে হাত পা ছুঁড়ে কিছু না পেয়ে যদি অনুভবেই বলে উঠি সেই কিছু না পাওয়াটাই ঈশ্বর তাহলেই বিপদ। এক ক্ষেত্রে রইল অনুভবের অনুভব, অন্যক্ষেত্রে অনুভবহীনতার অনুভব। প্রথম ক্ষেত্রে একে একে সব কিছুকে বাদ দিতে দিতে যে শূন্যতা—নাথিংনেস—সে কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পরিব্যাপ্ত শূন্যতা হাতড়িয়ে পাওয়া শূন্যতার মতো?

তবুও মন মানে না। এটাই বিপদ। কিন্তু এই বিপদ যতক্ষণ দার্শনিকদের এলাকায় আলোড়ন ঘটায় ততক্ষণ তা মারাত্মক নয়। এ বিষয়ের আলোচনা অন্যকোনও সময়ে করার বাসনা রইল। এখনকার কথা এখন বলে নিতে চাই। সেই কথাটা এই: দর্শনের ঈশ্বর যখন ঘাটে মাঠে বাটে ধর্মের দেবতা হয়ে হাজিরা দেয় তখন ব্যাপারটা কোন দিকে মোড় নেয়?

বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক বলা হল না। প্রশ্নটা অন্য একটা দিক থেকেও দেখা দেয়। ঐতিহাসিক দিক। কারণ, মানুষ অসহায়, ভীত, সন্ত্রস্ত ছিল সেই অতীত দিনে। তার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কম ছিল, জানা-চেনার এলাকা সীমিত ছিল। অথচ তার পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল ভয়ানক বিপদসঙ্কুল। সেই সুদীর্ঘ জীবনের ধাপে ধাপে সুতীব্র সংগ্রামের ক্লান্তি আর বঞ্চনার মধ্যে মধ্যে, তার অনেক হারিয়ে কিছু কিছুকে পাওয়ার অভিজ্ঞতার পরতে পরতে একটা বিরাটের অনুভব, একটা কখনও-ভীষণ-কখনও-সুন্দরের অনুভব, একটা মহাশক্তির উৎসের অনুভব ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভয়ে-বিশ্বাসে, হারানো-প্রাপ্তিতে, আশা-নিরাশায় ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর পাশাপাশি এক দেবতার জন্ম সে রোধ করতে পারে নি। তাই, ইতিহাসের পথ বেয়ে, ভয় আর অসহায়তার ভিতে, ভীষণের পাশাপাশি এক মঙ্গলময়ের ক্রমিক উন্মেষ ঘটেছে। একেই মানুষ তার দেবতা, ভগবান বা ঈশ্বর বলে দুর্যোগে-দুর্দিনে বাঁচাটাকে সহজতর করে তুলতে চেয়েছে। আবার দর্শনের পথ ধরে ব্রহ্ম এসেছে, ঐবসত্তাই এসেছে। সভ্যতার প্রথম পর্বেই এই বাঁচার দেবতার সঙ্গে মিলন ঘটেছে দর্শনের ঈশ্বরের। একটা আবেগীয় নির্ভরশীলতার আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ক্রমশই মিশে গেছে বৌদ্ধিক চেতনার সিদ্ধান্ত-মীমাংসা। জ্ঞানগ্রাহ্য দেবতা আর জ্ঞানগ্রাহ্য ঈশ্বর সেই যে একই বিশ্বাসের স্রোতে মিশে গেল, তা আর থেমে গেল না। থেমে গেল না বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই প্লাবনের সম্ভাবনাকে, হঠাৎ হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠে দিক আর পরিবেশের কারণে ধ্বংসের সম্ভাবনাকে সমূহ করে তুলতে পারল।

খাদ্য যেমন মানুষের ক্ষুধাকে, জল যেমন তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করতে পারে ঠিক তেমনি অসহায় মানুষের ভয়ভীত অস্তিত্বের অপরিমেয় দুঃখ যন্ত্রণার তুষ্টি সাধন করতে দেবতা, দেবতাগণের, প্রয়োজন ছিল। বিশ্বাসের জোরে সে জীবনকে সেই সময়ের মতো করে বেঁচে নিতে পারছিল। পারছিল, কিন্তু বেশিদিন তার এই পারাটা প্রকৃতিসিদ্ধ থাকতে পারল না। পারল না, কারণ মিডল-ম্যানরা এসে গেল, দূতের দল, পুরোহিত-পোপ-ব্রাহ্মণ—সকলেই। এরাই প্রথম প্রোফেশনাল এক্সপার্ট, স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি। মানুষের এবং দেবতার বা ঈশ্বরের। প্রোফেশনাল এবং ভাইনেস্টিক। জীবন পাল্টে গেল যাযাবর থেকে কৃষিতে। অবকাশ, অফুরন্ত অবকাশ। অজস্র ধারায় উন্নতি। অন্বেষণ, অনুসন্ধান, সৃষ্টি। সভ্যতা।

ধর্মক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা, দূতেরা, ধর্মকে পেশা করে নিল। শ্রেণী-বর্ণ-জাতপাত সেই পেশার দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠলো। ধর্ম আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার রইল না, জনসমূহে প্রাপ্ত বিষয় হয়ে দাঁড়াল। হাজারো আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান, প্রথা-প্রকরণ, প্রক্রিয়া

পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়ে হয়ে ব্যক্তিকেও যেমন গোষ্ঠীকেও তেমনি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। যে বিশ্বাস বা অনুভবের জন্য হল মনের নিজস্ব নিয়মে সেই বিশ্বাস-কেই, সেই অনুভবকেই আসল করে, কার্ডিনাল করে, হিসেবী মনের ধূর্ত মানুষেরা অরোপাস, পাইথনের মতো ব্যবহার করতে লাগল। মনের দেবতাকে কাছে পেতে, তুষ্ট করতে অথবা ভয়-আর-অসহায়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে সেই যে আর এক দল পার্থিব দেবতার পদতলে নত হল সেই শুরু হল মানুষের, আপামর জনগণের আধ্যাত্মিক পরনির্ভরশীলতা। এপারে পারানির কড়ি গোনার সেই শুরু। ওপারে যাবার যাবতীয় পথ আগলে রইল সবিশেষ জন, বুদ্ধিমান জন। ক্রমশ এরা ঐহিক এপারের দেবতা হয়ে উঠলো এবং পারত্রিক ওপারের সেতুপথে টোল সংগ্রাহকের, পাসপোর্ট বিতরণের আধিকারিক হয়ে গেল।

অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবিচার আর পার্থিব শোষণ অবশ্যই সভ্যতার অবদান। কিন্তু মনের এই ধর্মবোধের শোষণ অনেক বিকৃতির কারণ। সময় এবং সুযোগ পেলে অন্যান্য শোষণ থেকে অবিচার থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তার কারণ সে সকল বিষয় বিচার-বিবেচনার, তর্কের-জ্ঞানের, বিশ্লেষণ-অন্বেষণের বিষয়। তথ্য ও তত্ত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু ধর্ম? ধর্ম তো প্রধানত এবং সম্পূর্ণত বিশ্বাসের, অনুভবের আর ভক্তির ব্যাপার। আগুন যতোদিন আগুনের ধর্ম হারাবে না ততোদিনই সে দহন করবে। তেমনি মানুষ যতোদিন মানুষের প্রকৃতি হারাবে না ততোদিনই সে বিপদে ভীত হবে, অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে সহায় সম্বল খুঁজবে। এই খুঁজতে গিয়েই সে মানুষের মধ্যে নয়, দেবতা-কল্পনার মধ্যেই বরাভয় চাইবে।

মানুষের এই দুর্বলতম ক্ষেত্রে, তার অসহায়তম অস্তিত্বের অনুভবের ঘাটে দেবতা-ঈশ্বরের কারবারীরা দলে দলে, যুগে যুগে ঘর বেঁধে বসবে। আধুনিক জীবনের কারবারীরা মানুষের ভোগস্পৃহার দুর্বলতাকে বিজ্ঞাপনের কৌশলে সদা জাগ্রত রেখে ব্যবসায় রমরমা আনছে, তাকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পণ্যের বাজারে হাতছানি দিচ্ছে। অস্থির করে তুলছে। এবং মানুষকেও পণ্য করে তুলছে। ভোগস্পৃহা মানুষের দুর্বলতম ক্ষেত্র নয়। নানাবিধির মুখোশের আড়ালে যে কারবারী, যারা এপার-ওপারের মাঝি, তারাই মানুষের মনের অসহায়তম, দুর্বলতম স্থানে নিজেদের আসনটিকে অধ্যাত্ম মহিমার সিংহাসনে সম্পৃক্ত করে নিঃসাড়ে শোষণ করে চলেছে।

ম্যান ইজ র‍্যাশনাল, মানুষ বুদ্ধিমান। সে কেন বোঝে না? মানুষ বোঝেও বটে বোঝেনাও বটে। সব কিছু যখন ঠিক ঠাক চলে, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া যখন স্বাভাবিক গতিতে পথ খুঁজে পায় তখন সে অবশ্যই র‍্যাশনাল, বুদ্ধিমান। কিন্তু বিপদে-আপদে, দুর্দিনে-দুর্যোগে, জরা-মৃত্যুর সামনে সে অনিবার্য ইমোশনাল, আবেগ সর্বস্ব। তখন সে দু'হাতে পথ হাতড়ায়, সহায় খোঁজে। মানুষে তার কুলোয় না, অতি-মানুষ খোঁজে, নির্ভরশীলকে মনের মধ্যে স্থির পাবার জন্যে দেবতা-গড়ি হয়ে ওঠে। সেই দেবতা খুঁজতে সে মন্দিরে যায়। দেবতা মন্দিরে আছেন কিনা সে প্রশ্ন তখন অবান্তরই নয় ধৃষ্ট বলে মনে হয়। যে নশ্বরকান্তি সৌন্দর্যমূর্তিটি তার চোখের সামনে দেখা দেয় সেও তখন, সেই তখন, তার একমাত্র ত্রাতা পরিত্রাতা বলে মনে হয়। এটাই অসহায় মানুষের প্রকৃতি, আবেগীয় স্বভাব। যে দেবতার থাকার কথা তার মনের মধ্যে, তার নিজের অনুভবে-বিশ্বাসে-ভক্তিতে, তাকেই সে হাতড়িয়ে বেড়ায় মন্দিরে-মন্দিরে। এটাই মানুষের মনুষ্যজিপি।

মানুষ জানে যে জগৎ ঘুরে সরে যাওয়া রেখার পাশে দৃষ্টির সামনে কাঁচ সর্বদাই সমান থাকে, কিন্তু সে দেখে অন্যরকম। দেখে যে সেই কাঁচটা ক্রমশই ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা মানুষের চোখের চক্র-শিল্পি। অসাধ্য ছবির পথ নেই। মানুষ জানে যে পৃথিবী ঘুরে ঘুরে চলেছে, দিনরাত হচ্ছে, ঋতু দিয়ে বছর তৈরি করছে। এটা মানুষের প্রত্যক্ষের আপেক্ষিকতার প্রত্যক্ষশিল্পি। মানুষ জানে যে ভূত-প্রেত বলে কিছু বাস্তবিক নেই, কিন্তু পরিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে এবং মানসিক প্রকৃতি-প্রবণতার কারণে—জ্ঞান-কাজ-মন মাহাত্ম্যে—তার যা হয় হয় করে, ওহার ভীত-সন্ত্রস্ত মনের ওহায় ভূত-প্রেত জন্ম নেয়, প্রকাশ পায়, আত্মধারণ করে নিয়ে অ-জ্ঞান করে দেয়। যে ভূতকে তাই 'প্রত্যক্ষ'ও করে। দেখে বা প্রত্যক্ষ করে কারণ এটা তার মনের স্তর-স্তর ওহাশিল্পি। একই ভাবে দেবতা-ঈশ্বর মানুষের অসহায়-অসহায় মনের অনুভব শিল্পি। বিশ্বাস শিল্পি, উক্তির আবেগে আবৃত প্রত্যক্ষ-শিল্পি। ভাগ্য নয়, স্ব-ভাব শিল্পি।

মানুষ মাত্রেই এক, কিন্তু কিছু বিষয়ে এক। তাই মনোবিদ্যা, নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্ভব। আবার মানুষ মাত্রেই আলাদা, বহু বিষয়ে আলাদা। তাই তার হাতের রেখা, মাথার ছাঁচ, আকৃতি-প্রকৃতি, মন-মানসিকতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস তাকে ব্যষ্টি রূপে চিহ্নিত করতে পারে। এই সমষ্টিগত সামান্য বা একা আর ব্যষ্টিগত ভিন্নতা বা অনেকা নিয়ে প্রত্যেক মানুষ। এই ব্যষ্টিগত ভিন্নতার মধ্যে সে তার ব্যষ্টিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, হওয়া-না-হওয়া, করা-না-করা ওলোকে একে একে নিজের মতো করে খুঁজে নেয়, তৈরি করে নেয়। জাগতিক সব বিষয়েই তার বেছে নেবার, গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ থাকে। একমাত্র বিষয় তার ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মবোধ, যেখানে তার কোনও সুযোগ থাকে না—অধিকার থাকতে পারে কিন্তু সুযোগ থাকে না। জন্মমুহূর্তেই, পর্বতগায়ে শিলালিপির মতো, শিশু অস্তিত্বে ধর্মের লিপিটি খোদাই হয়ে যায়। তার পরে সারাজীবন ধরেই পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে সেই ধর্ম-লেখাটিকে আচার-অনুষ্ঠানে নিয়মে-নীতিতে স্পষ্ট-পাকাপোক্ত এমন ঢাল এবং গভীর করে তোলার ব্যবস্থা হয় যাতে যৌক্তিক অনুশীলন, বাস্তব প্রত্যক্ষের পরিশীলন অথবা মানবতাবোধের দাবি সবই নস্যাৎ হয়ে যায়। মানুষের জানা-দেখার জগতে যা-সমস্ত পরিবর্তন ঘটে যায় কিন্তু সেই শিলালেখকে তার প্রভাব পড়ে না, সেই ধর্মলেখ যখন আমূল নড়া দেয়, আবেগীয় আঘাতের জন্য দেয় ঠিক তেমনিই তা থেকে যায়। সব মুখই যার যার লেখা দেয়, সব মুখোশই যার যার পাল্টায়, একমাত্র ধর্মের যা-জন্য বিশ্বাসের মুখটি, আরোপিত হয়ে মুখোশটি বসাই তার, তার কখনও পাল্টায় না।

আর মানুষ মাত্রই বলেছি? মৃত বা বিদ্যমান? তারা জানে-অজানে এই মুখ মুখোশ বাধিয়ে পর্যায়ক্রমিক নেতৃত্ব দিতে থাকে। যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অথবা প্রেম-ভক্তির বিষয় থাকার কথা তাই সর্বজনীন হয়ে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিপদে আপদে, দুর্দিনে-দুশ্চিন্তায়, ভয়ে-অসহায়তায় যেখানে নিজ নিজ অন্তরের বিশ্বাসের ঘরের দোরে ছাপ পড়ে ভূমা নিবেদনের কথা, সেখানে সমাজের বিশ্বাসের প্রাঙ্গণ থেকে এসে ভূত মতোটাই প্রাণ হয় মাত্র। মানুষের ইতিহাসে বার বার এই প্রাঙ্গণ দেখা দেছে। মানুষ বার বারই ভেবেছে যে দেবতা থাকেন আকাশে, মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তরালে, ভক্তির মন্দিরকোণে, প্রেমের অন্তরালে। কিন্তু বার বারই সেই অন্তরের দেবতাকে সর্বজনের সামনে করে তুলতে সচেষ্টাপ্রয়াস তুলেছে। কেন? কার প্রয়োজনে? নিশ্চয়ই ব্যক্তির প্রয়োজনে নয়, ধর্মের প্রয়োজনে নয়, দেবতার প্রয়োজনেও নয়।

তফাতে? উপসর্গ যেমন শব্দের অর্থ অন্যত্র নিয়ে যায়, তেমনি এ ক্ষেত্রেও কি কোন উপসর্গ যুক্ত হয়ে গেছে? সেই উপসর্গই ধর্মের অর্থ-তাৎপর্য-স্বরূপকে উৎ-ব্যক্তিক করে কোনো শক্তি-ক্ষমতা-স্বার্থ কেন্দ্রিক করে তুলেছে?

হতে পারে। ব্যক্তির মনের ভয় আর অসহায়তার ছিদ্রে পূর্বজন পরজন্ম, আত্মা-ভগবান, কর্মফল, ইহকাল পরকালের তীব্র তুলিতে আঁকা মুখোশ-এনটেনা এঁটে দিয়ে আর নিজেদের মুখে নামাবলির মুখোশ জড়িয়ে ধর্মব্যবসায়ী নেতারা মাইক্রোওয়েভে ছবি ফেলছে। ঠিক ঠিক চ্যানেলে কাঙ্ক্ষিত-প্রক্ষিপ্ত ছবি পড়ছে। রক্তচাপের বাড়াকমা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দেবতাকে অন্তর্জালে দিয়ে নেতা-অন্তরের শক্তি-ক্ষমতা-স্বার্থ সিদ্ধির সাটেলাইট ব্যানেকশন সম্পন্ন করা হয়েছে। মুখ দেখা যায় না, মুখোশের রমরমা চলছে।

প্রগতিজগতে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সর্বনিম্নবাধার নীতি—মাইন অব লিস্ট রেজিস্টান্স—সর্বজনস্বীকৃত। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম বলতে বস্তুগত জগতের বাধা বিপত্তির কথাই প্রধান। সেদিনের বাস্তব জগতেও এই নীতি সংসার-সমাজ-সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে সমান সত্য। পাছে লোকে কিছু বলে, কি বলতে কি হয় কে জানে, ডোবেছিলাম বলব কিছু বলি নি—এসবই এই সর্ব নিম্ন বাধার নীতির বাস্তব উলাহরণ। বিপরীত-কে তো আমরা সকলেই এড়িয়ে চলি, এমন কি ছিদ্রে বিপরীতের সম্ভাবনাকেও পাশ কাটিয়ে যাই। যতক্ষণ আমার গায়ে আঁচড়টি লাগছে না ততক্ষণ আমরা সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে মৌন-ক্রিয়াহীন-বাক্যহীন থাকাই পছন্দ করি। সেই মাইন অব লিস্ট রেজিস্টান্স।

এবারে দেখুন এই সর্বজনগ্রাহ্য নীতিটি আমাদের ধর্মীয় জীবনে কী অসীম প্রভাব বিস্তার করে। আর তখনই দেখতে পাবেন কেমন অনায়াসেই আমরা নিজেদের ধোঁকা দিয়ে থাকি, ধোঁকা দিতে পারি। পাছে কেউ অন্যরকম কিছু ভাবে, যুক্তিহীন সংস্কারাচ্ছন্ন বলে মত দেয় তাই যুক্তিতর্কের ছদ্মির ভাজে আরেকটা মুখোশ শক্ত করে মুখে এঁটে রাখি। ধর্মের ক্ষেত্রে দেব দেবী, ঈশ্বর ভগবান প্রভৃতি থাকবেই। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে—যেমন সংসারে দাদা-দিদি, বাবা-কাকা, মা-মাসি দাদা-দাদু আত্ম এবং তাদের যথাযথ সমীহ করে চলতে হয়, বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকলে নানান উপায়ে তাদের তুষ্ট রেখে নিজ নিজ কাজ হাসিল করতে হয়—যেমন অফিসে-কাছারিতে তেমনি ছোট থেকে মাঝারি হয়ে বড় বড় কর্তারা আছে এবং তাদেরও সমীহ করে চলতে হয়, বিপদ আপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ভেবে হিসেব করে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়—তেমনি ধর্মের এলাকাতেও আমরা কম হিসেবী নই। ভক্তির পরে হয় মন্ত্রী করি। বলিও জানি জন্মরক্ষার যাবতীয় নিয়ম পালন করা, প্রতিষেধক টিকা ইত্যাদি নেওয়া আর পুষ্টিকর এবং প্রয়োজনীয় আহার আবশ্যিক কাজ, তবুও অকারণে মহীমাতাদেবীকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি নিতে চাই না। যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা হয়ে যায় শিশুর তাহলে? মানুষ কি সর্বজ্ঞ? কর্মফলাফলের সব জটি-জটিলতা কি মানুষ জানে বলে দাবি করতে পারে? তাহলে? সবরকমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেও কি বিপদ হয় না? হয়ে থাকে না? একটু পুজো দিলে কোন বিজ্ঞানের পাঁচালি অশুদ্ধ হয়ে যাবে?.....

হতে পারি, অজ্ঞানতা, উপলব্ধি এবং ইত্যাদি। সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান আলাদা আলাদা। কিন্তু দীর্ঘ দিন পাশাপাশি চলে চলে একের সঙ্গে অপরের মিলমিশ ঘটে গিয়ে সামাজিক

ধর্মীয় আবার ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান একাকার হয়ে যেতে পারে, যায়ও। হতে পারে সময়ে শিক্ষক যাবে সামাজিক, কিন্তু যদি পুরোহিতকে ডেকে আনা হয় তাহলে বুঝতে হবে সামাজিক-ধর্মীয়। অন্নপ্রাশন-উপনয়নের বেলাতেও তাই। তবে ভিত্তিতে তফাত। উপনয়নে বৈদিক বা মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থা থাকায় শুধুমাত্র আচার্য-সমীপে উপনীত হওয়ার বা করানোর ব্যাপারটা ছাড়িয়ে পুরোহিতের হিত সাধনের ব্যাপারটা ঢুকে পড়েছে, ধর্ম পথ খুঁজে নিয়েছে। ধর্মের দিক থেকে অকারণ, অপ্রয়োজনীয় জেনেও আমরা, 'মোশারা', সেই ধর্ম প্রবেশের পথটিকে প্রশস্ত করে দিয়ে থাকি। কেন? সেই একই উত্তর। কেন শুধু শুধু .....যদি কিছু হয়? বলা তো যায় না। সব কিছুই কি আমরা জানি? বিজ্ঞান.....ইত্যাদি।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে দেবতাকে দেখতে পাই না, গাছ-পালা পশু পক্ষীদের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজি না [যখন খোঁজা হয়েছে এবং যারা খুঁজেছে তখন মানুষ ছিল অন্যরকম, সময় ছিল অন্যরকম], খুঁজি না পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, আর্তজনের করুণ প্রার্থনায়। দেবতাকে খুঁজি পীঠস্থানে, তীর্থস্থানে, মন্দিরে মন্দিরে। সময়ের অভাব পড়ে যাওয়ায় এখনকার ব্যস্তসমস্ত মানুষ তাকে খোঁজে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বটতলায়-পাদতলায়, সিঁদুর লেপা নুড়ি পাথরে, ধুনি জ্বেলে বসে থাকা ভস্মদেহ জটাধারীর পদতলে, চিমটের দৌড়ে। এদের সকলকেই আমরা নত করি, সমীহ করে চলি, করজোড়ে মস্তকের নতশির প্রণামটি জানিয়ে যাই। কেন? ভাল কিছু হোক-না-হোক এরা তো ইচ্ছে করলেই মন্দটা ঘটাতে পারে। একটুখানি বিনয় ভেট দিলে যদি মিটে যায় তাহলে কেনই বা তা করব না? সেই একই কারণে-সর্ব নিম্ন বাধার নীতির কারণে-তামার ধামায় বা চাদরের বুকে বা পার্বণীর বাক্সে টাকাটা-সিকেটা ফেলে দিয়ে থাকি।

এটা শুধু নিজেকে ধোঁকা দেওয়া নয়, দেবতাকেও ফাঁকি দেওয়া। বিশ্বাসের বাড়ি নির্ভর দেবতাকে সমাজের সামনে, সকলের সমক্ষে বাণিজ্যিক চেহারা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মদত দেওয়া। নামাবলীর ছড়াছড়ি, মন্ত্রতন্ত্র দেবস্থানের পতন, হুঁৎ-ভাঁৎ খুচরো পয়সার ধ্বনি তরঙ্গের সিমফনি। জননেতা রাষ্ট্রনেতা এবং ধর্ম-নেতারা একাসনে বসে, পাশাপাশি বসে দেবতাকে নিয়ে যে যার প্রয়োজন মতো কাম সিদ্ধির প্রথা প্রকরণ স্থির করতে লেগে যায়। কাম সিদ্ধির অন্তরালে উদ্দেশ্যটি থাকে সংগোপনে মনের গভীরে, কিন্তু প্রত্যেকেই এক একটি মুখোশ এঁটে জনগণের প্রয়োজনের পূরণ ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একই কারণে জনগণ দেবতাকে নিয়ে ভয়ে বিহ্বল, আবার নেতারাও সেই কারণেই দেবতাকে নিয়ে মশগুল। লাইন অব লিস্ট রেজিস্টেন্স-সর্বনিম্ন বাধার নীতির কারণে। সাধারণ মানুষ ভয়ে ভয়ে সব দেবতাকে তুষ্ট রাখতে চায়-'কি জানি কি হয়'-এর সদা সংশয় আর 'বিজ্ঞান কি সব জানে?'-র সদা সন্দেহ নিয়ে সে পথে পথে, মোড়ে মোড়ে মন্দিরে-দেউলে ভেট চড়াতে চায়। বিশেষ যারা, নেতা যারা, তারা মানুষের এই সহজতম, আবেগতাড়িত, অন্ধভক্তিমথিত বিশ্বাস আর ভয় কে, অসহায়তা আর মানবতাকে, পরিপুষ্ট করে লাগাতে চায়, লাগায়। ইতিহাস। অতীতের, বর্তমানের।

তাই নো দাইসেলফ্-নিজেকে জান-এর পাশাপাশি নো ইউর গড-নিজের দেবতাকে জান-টাও যোগ হওয়া উচিত। মুখোশের আড়ালে নিজেরাও হারিয়ে যাচ্ছি, দেবতাকেও হারিয়ে ফেলছি। মানুষ নিজেকে হারাচ্ছে বাইরের আমিটাকে তাড়া করে আর দেবতাকে হারাচ্ছে ভিতর থেকে বাইরে

বার করে দিয়ে। যা আছে তার নিজের ভিতরে সেই পরশ পাথর খুঁজতে খাপার মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ নিজের যে ধর্ম সেই মনুষ্যত্বকেই ভুলিয়ে বসেছে। দেবতার ধর্ম তাকে বিধেবিধি বাইরে টেনে নিচ্ছে। সেই টানে মানুষের ধর্ম থেকে সে চ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এটাকেই বলেছি তার ভয়ের দিগি, তার অসহায়তার দিগি, নিজেকে উদ্ধার করতে নিজেকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ধর্মফল।

প্রত্যেক মানুষের যেমন একাধিক পোশাক থাকে তেমনি থাকে একাধিক মুখোশ। সে দ্বিচারী, ত্রিচারী বহুচারী। দ্বিতভাবের ধলচরিত্র—ডুপ্লিসিটি—তার স্বভাবের অঙ্গ। এই ধলতা এই চালাকি সে তার নিজের সঙ্গে তো করেই, এমন কি তার দেবতাও বাদ যায় না। ধর্মকে সে তাই ফিনাইল, ডেটল, মারকিউরিওক্রোম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অথবা গঙ্গাজলের ছিটে। অন্যায় কাজ করতে তার বাধে না, অনুচিত কাজ সে জেনে শুনেই করে থাকে, পাপ কাজে অনায়াসেই লিপ্ত হয়। তার পরে সময় করে দেবতার কাছে গিয়ে পুজো দেয়, মানত শেষ করে, স্নান করে শুদ্ধ-বস্ত্র ধারণ করে মুক্ত হয়। চোর, জুয়াচোর, খুন-জখম, নারী নির্যাতন-ধর্মনকারী ঠগ-গুণ্ডা-বদমাইশের সংখ্যা যতো বাড়ছে দেবস্থানে ভেট চড়ানোর ভিড় ততোই বেড়ে চলেছে। কোর্ট-ছিঁড়ে গেলে যেমন আমরা ডেটল-আইওডিন লাগাই তেমনি মনে অন্যায়-অশুদ্ধি-পাপের ছোঁয়া লাগলে দেবতার আশীর্বাদী লাগাই।

পাছে বিশ্বাসীরা, ভক্তরা ছেড়ে আসে তাই সময় থাকতে একটা বিরামের চাল সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের প্রত্যেকের মনেই যে ভয় আছে, অসহায়তার বোধ আছে, সংশয়-সঙ্কটের যন্ত্রণা আছে তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। এদের মধ্যে ভয়টা প্রধান, কোথাও কারণ হিসেবে কোথাও বা ফল হিসেবে। বহুপ্রকারের ভয়েই আমরা ভীত। সেই সব ভয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। জৈবিক ভয় আর মূল্যবোধের ভয়। বেঁচে থাকার জৈব সংগ্রামে, তৈল-তণ্ডুল-চাকরি-ব্যবসায়ের বিচিত্র বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে সদাসর্বদার কি হয় কি হয় ভয়। এই ভয় আবেগের মূলে ঘা দেয়, তীব্র হলে নালিকা-বিহীন গ্রন্থির রস ক্ষরণে রক্তচাপে-প্রবাহে হেরফের ঘটায়। শরীর-মনের সেই ভয়-ভীত অবস্থা থেকে সমূহ মুক্তির জন্যে—অন্ধ-ধন্ধ হলে মায়ের নাম স্মরণ করি বাবার সাহায্য চাই—কিন্তু বেশি মাত্রায় ভয় হলেই ভগবান, ঈশ্বর। যার যেমন বিশ্বাস-ভক্তি সে তেমন তেমন দেবতাকে বিপদ উদ্ধারিনী বলে ভয়ের বৈতরনী পার হতে চায়। দেবতা-ঈশ্বরে এরা চব্বিশ ঘণ্টা তিনশ পঁয়ষট্টি দিন নিরত-নিরত থাকে না। বিশেষ বিশেষ দিনে এবং কারণে এরা পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে ভেট-নৈবেদ্য হাতে উপস্থিত হয়। নির্ভয় হবার জন্যেও বটে, ভবিষ্যৎ কোনও অপকর্মের কাঙ্ক্ষিত সাধনে আগাম ভেটও বটে। এই ভাবে মানুষের মনের জৈবভয় দেবতাকে লোভী, প্রিয়-পোষক এবং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন বলে প্রতিভাত করে তুলেছে। দেবতাকে তার নিজের আসন থেকে নামিয়ে এনে বড়বাবুর আসনে, অফিসের নির্দয় প্রধানের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহরের ভেদাভেদ নেই। মানুষ নিজেকে প্রকাশ করছে দেবতাকে ভাবুক বলে, কিন্তু মনের গভীরে যে তার নিজ-টুকু আছে সে জানতে পারছে কতো নিপুণ তার বাইরের মুখোশখানা।

দ্বিতীয় ভয় হল মূল্যবোধের ভয়, আদর্শের ভয়। এই ভয়ে মানুষ যখন ভীত হয় তখন তার কোন জৈব উপাদানে চাপ পড়ে না, ভাল বাড়ে না। তখন সে সামঞ্জস্যকে খুঁজতে চেষ্টা করে, বুদ্ধি-বিবেচনার জোর দিয়ে সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে জেনে চিনে নিতে চায়। এই জন্যে তার

কোনও দেবতাই অনিবার্য নয়। নিজের অন্তরের মধ্যে যে উচিতকে, সামঞ্জস্যকে, সংহতিকে অন্বেষণ করতে থাকে। যদি সেই মুক্তাবোধ ঈশ্বর হয়—পত্র ক্রিয়ারিং ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে—হতেও কোন ক্ষেত্র-কর্ম-বিধির নিয়ম লাগে না। ভেট-নৈবেদ্য তো নয়ই। এদের কোন ভেকও ধারণ করতে হয় না। একচারী এ ধরনের মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। বাকি সবাই ভয়া-ভয় মরণ-ভয়, কি-হয় কি-হয় ভয়ে ভীত বলেই ঈশ্বর বিশ্বাসী, দেবতার স্থান-অন্বেষী, ভেকধারী ভেট-নৈবেদ্য-হস্ত হাতে বাধ্য। মুখোশের বাহার তাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়!

ভয় পেয়ে পলায়ন অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। জৈব ভয়ে সবিশেষ। প্রাণিজগতে ভয়-পলায়নের ভূরি ভূরি উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হবার কথা নয়, হয়ও না। শিশুরা যে কোনও ভয় পেলেই যে আমরা মায়ের আঁচল বা বাবার কোল খুঁজি তা আমাদের জৈব প্রাকৃতিক কারণেই বটে। অভ্যস্ততা বা প্রবৃত্তির উত্তরাধিকার। একই ভাবে বাল্যকালে মা-বাবার ভয়ে দাদু-দিদিমার কোল খুঁজি, দাদা-দিদির ভয়ে পড়ের কোনো কোন খুঁজি অথবা মা-বাবার আশ্রয়। আবার পড়ের ভয়ে বাইরে চলে যাই, বাইরের ভয়ে পড়ে ফিরে আসি। ভয় আমাদের তাড়িত করে, কোনও কোন অন্বেষণে বাধ্য করে, আশ্রয়ের সন্ধানে উদগ্র করে তোলে। এই মানসিক-জৈব উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা যখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধ-বিপরীত সংসার-সমাজ-প্রকৃতির ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে পড়ি তখন সেই প্রবৃত্তির অভ্যস্ততার সঙ্গে আর একটা অভ্যস্ততা, অন্য একটা উত্তরাধিকার যোগ হয়ে যায়। এটাই ধর্মের আঁচল, দেব দেবীর আশ্রয়।

নিত্য নৈমিত্তিক সংশয়-সংকটে আমরা অপেক্ষাকৃত বড়দের কাছে যাই। যাই সান্ত্বনার আশায়, আশ্রয়ের বাসনায়, আশ্বস্ত হবার কামনায়। ছোট ছোট ভয়ের বেলায় তুলনামূলক বড়কে খুঁজি—দাদা-দিদি, মা-বাবা, শিক্ষক-অধ্যাপক, সম্পাদক-সভাপতি, স্থানীয়-জিলা নেতা। অথবা মা মনসা, মা শীতলা, ইতু-মনসা। একই সঙ্গে ওষুধবিদ্যা ডাক্তার-হেকিম জলপড়া-পান-পড়া-তেল-পড়া চলতে পারে। ভয়-বিপদের কারণ জানা থাকে না বলেই মন মাতৃর আশায়—কার্যের আশায়—সব সম্ভাবনাই খোলা রাখতে চাই, 'অপশান' কোনটাকেই ছেড়ে রাখতে মনে বল পাই না। কিন্তু যখন সংকট তীব্র হয়, ভয়-বিপদ অস্তিত্বের ভিত ধরে নাড়া দেয় তখন আর এ-সবে কুলোয় না। বড় ভয় অধিকতর বড় আশ্রয় চায়। শিব-কালী-দুর্গা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পর্যন্ত ছুটোছুটি পড়ে যায়। [অফিসে-কাছারিতে যেমন ছোটবাবু-বড়বাবু ছাড়িয়ে সেক্রেটারি-মন্ত্রী পর্যন্ত গড়ায় অনেকটা তেমনি।] লৌকিক বৃহৎ 'দেবতা'-দের কাছে পৌঁছাতে যেমন কাণ্ডারী লাগে, পথ প্রদর্শক দরকার হয়, তেমনি অ-লৌকিক দেবতাদের আশ্রয় পেতেও কাণ্ডারী লাগে, পথ-প্রদর্শকের দরকার হয়। লামাদের বলা ঠিক হবে না, এক্সোর্সিস্ট বললে খুব ভুল হবে না। কিন্তু অলৌকিকের সন্ধান দেয় বলে, অলৌকিক শক্তির বরাভয় আদায় করে দেয় বলে এদের অন্য নামে পরিচিত হতে হয়। এরা সকলের হিত করে বলে, পরবাসীদের মঙ্গল সাধনই এদের একমাত্র লক্ষ্য বলে এরা পুরোহিত। ভিন্ন ভাষায় এবং ক্ষেত্রে এদের ভিন্ন নাম থাকতেই পারে, যেমন ব্রহ্মপুত্র—হাতে এদের চরিত্রের এবং স্বভাবের কোনও হেরফের হয় না, যেমন ব্রহ্মপুত্র নদের হয় না।

ভয়ে মুহ্যমান পলাতক মানুষদের নিয়ে যারা কারবার করে তাদের ভাষা ব্যবহার রীতি নীতি মুহ্যমানদের থেকে দস্তুরমতো স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। অমর এবং মরণশীলদের মধ্যখানে-সেতুটা দেখার

পদটিকে সুদৃশ্য-গ্রাহ্য রাখতে হয়, জোড়টুকুকে অদৃশ্য-ওহ্য নির্বাসনে লুকিয়ে রাখতেই হয়। উকিলদের মুখোশ তাদের শ্যামলা-সাবলা, [সত্যের বর্ণহীন নিরপেক্ষ বাবহরণ ও নির্মম সাবলার লজ্জা কিন্তু অসত্যের অথবা ক্লায়েন্ট-সাপেক্ষ সত্যের স্বার্থমুখী আড়াল করেই ফেলেছে শ্যামলাটি কৃষ্ণবর্ণ—ডার্ক ভিউস আর বেটার ডান অফার (ইন) ডার্কনেস!] পুলিশের মুখোশ তার ইউনিফরম [জনগণের সেবকদের সহজে চেনার জন্যে যে ইউনিফরম তাই শোষকের শকলকে জিভকে আড়াল করে রাখে!] লাল কৌপীন, গেরুয়া উত্তরীয়, দীর্ঘ চিমটা, রামনাম লামাবলি অথবা ভস্মমাখা দেহ—সবই ইউনিফরম।

পলায়ন একটা ডিফেন্স মেকানিজম। আত্মরক্ষার জন্যে পলায়ন, লুকিয়ে পড়া, আশ্রয় নেওয়া। আক্রমণও একটা ডিফেন্স মেকানিজম। আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যাঘাত, উত্তেজিত নখদন্ত প্রদর্শন, ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি। ভয় বর্তমানকে নষ্ট করে, উচ্ছেদও করে। প্রথম প্রতিক্রিয়ার ধর্মের মুখোশধারীদের লাভ, দ্বিতীয়ে সমাজরাষ্ট্রের নেতাদের। এখন সেই কথাতেই আসা যাক।

(৫) মুখোশের অন্তরালে সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা :

একটু ভূমিকার দরকার। কাজ আদায় করার জন্যে তিনটি পথ সবাই জানে। এক, ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ আদায় করা, দুই, বুঝিয়ে-বাঝিয়ে এবং তিন, ধমকিয়ে-ধামকিয়ে। সবাই জানে, কারন সকলকেই শৈশব-বাল্যকাল পার হতে হয়, তরুণ-যৌবন সময় অতিক্রম করতে হয় এবং এক সময়ে অভিভাবক-বয়স্ক-বৃদ্ধের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই এই সামান্য-সার্বিক ত্রিবিধ পদ্ধতি সকলেরই জানা—অনুভবে, প্রত্যক্ষে এবং প্রয়োগে জানা। সংসারের মধ্যে, সংসারের প্রয়োজনে এবং সামাজিকীকরণের ধাপে ধাপে এই জানাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক-স্বীকৃত ঠেকে। এর প্রধান কারন বোধহয় এই যে প্রতি ক্ষেত্রেই, প্রত্যেক ধাপেই উদ্দেশ্য হিসেবে যা উপস্থিত থাকে তা ব্যক্তিস্বার্থের গন্ধে বিকৃত থাকে না, অন্যের উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ বোধের দ্বারা চিহ্নিত থাকে। অর্থাৎ একদিকে থাকে এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়া অন্য প্রান্তে থাকে স্বীকৃত-স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের নিক নির্দেশ। যে বা যারা থাকে মাঝখানে, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রয়োগকারী হিসেবে, তারা তাই সন্দেহজনক বলে অনাদৃত হয় না। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পথগুলো, প্রক্রিয়াগুলো জানা বলেই প্রয়োগকারীকে বড়ো বলে, প্রধান বলে, নেতা-কর্তা বলে মানা করার রেওয়াজ আছে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, দাদা-ভাই, শ্বশুর-জামাই, বয়স্ক-তরুণ, সভাপতি-সদস্য, গ্রামপ্রধান-পঞ্চজন — ইত্যাদির বেলায় ব্যাপারটা সহজেই চোখে পড়ে — সংসারে, সমাজে, অনুষ্ঠানে।

এবারে দেখুন এই ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়াই কেমন অন্যরকম হয়ে যাবে যখনই উদ্দেশ্য সার্বিক-সামান্য না থেকে স্বার্থক্লিষ্ট-ব্যক্তিস্বার্থ চিহ্নিত হয়ে যাবে। তখনই সুরকমের পরিবর্তন ঘটে যাবে। প্রথম পরিবর্তনে শব্দগুলোই পাল্টে যাবে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে না বলে বলা হবে ধোঁকা-বাজি করে, বুঝিয়ে-বাঝিয়ে ব্যাপারটা হবে ব্রেন-ওয়াশ বা মস্তিষ্কশোধন, আর ধমকিয়ে-ধামকিয়ে না বলে বলা হবে শ্লাকমেল করে অথবা স্বার্থের-ভয়ের নাকে দড়ি দিয়ে অনুগত রাখা। শব্দ ব্যবহারে এই যে পরিবর্তন ঘটবে তা দ্বারা তাৎপর্যের পরিবর্তন বোঝানো হবে। দ্বিতীয় পরিবর্তনে প্রক্রিয়া প্রয়োগকারী ব্যক্তিটি অনিবার্য নেতা হয়ে যাবে, থেকে থাকবে। যে যেমন নিপুন, কুশল এবং অভিজ্ঞ সে তেমন পর্যায়ের নেতা হয়ে উঠবে।

নেতা হবার প্রথম পাঠে এই সর্বজনস্বীকৃত মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহার আয়ত্তের সঙ্গে যোগ হবে সর্বজনকে, জনগণকে, উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারার কুশলতা। এই ব্যবহার কথা ব্যাপারটা কেমন? এখানেও সেই স্বাভাবিক এবং বিকৃত প্রয়োগ আছে। কাউকে দিয়ে কাজ করানো আর কাউকে কাজে লাগানো — ব্যক্তির যোগ্যতার বিচারে কাজ নাও করা আর ব্যক্তিকে যন্ত্রের মতো, অস্ত্রের মতো ব্যবহার করার মধ্যে যে তফাত সেই তফাত। প্রথমটা স্বাভাবিক-স্বীকৃত, দ্বিতীয়টা অ-স্বাভাবিক বিকৃত। এখানেও সেই সংসার-সমাজের প্রেক্ষিতে দেখুন। — বাবা, এক বালতি জল এনে দেবে? দোকান থেকে দশটাকার মিষ্টি এনে দেবে? এই অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দেবে? চিঠিটা পোষ্ট করে দিও, প্লীজ! — এমতো হাজারো কাজ হাজারো জনকে দিয়ে করানো যায়, করানো হয়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক-স্বীকৃত। যে বলছে বা কাজে লাগাচ্ছে আর যাকে বলছে বা যাকে কাজে লাগান হচ্ছে তাদের দুজনের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। সেই অবকাশ ঘটলেই দেখা যাবে মানসিক বৈপরীত্য-বিস্ফোরণ ঘটছে — আমি কি তোমার চাকর? তোমার বাটি-মানি? পিওন! — ইত্যাদিতে উষ্মার ঘটবে। মেন্টাল ওয়েভ লেংথ না মিললেই ফাউল এবং 'সরি'-দুঃখিত-লজ্জিত ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে যাবে। তখনই বোঝা যাবে যে এখানে যন্ত্র বা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের মানসিকতা ছিল না। এসবই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, তাই বলেছি স্বাভাবিক।

এবারে দেখা যাক এর বিকৃত রূপটি কেমন। মনের গভীরে গুহা অভিপ্রায়টি লুকিয়ে রেখে, গোপন রেখে, যখন কোন সর্বজন বা বহুজন সমর্থিত উদ্দেশ্যকে সামনে তুলে ধরা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে কাজে লাগান হয় তখনই তা বিকৃত ব্যবহার। দাঙ্গাগিরিতে অভিনিবিষ্ট হতে, প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক দাদাই এই পথটি বেছে নিয়ে থাকে। — দোকানে দোকানে চাল ডাল নুন তেল সংগ্রহ করে কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থার প্রতিটি পর্বে পর্বে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেয়া এবং অবেলায় ভোজনান্ত জয়ধ্বনি পর্যন্ত সব ব্যাপারটাই একবার ভেবে দেখুন। মনে গোপন অভিপ্রায়টি অনেক পরে ধরা পড়ে, উদ্দেশ্যটি নেতাকে তৈরি করে দিতে থাকে। কারণ বালক-ভোজনের উদ্দেশ্যের মধ্যে তো কোনও অসমর্থনযোগ্য হেতু নেই। তেমনি শত শত কচিকাঁচার হাতে পতাকা ধরিয়ে দিয়ে, ঘাড়ে ফেস্টুন চাপিয়ে দিয়ে যে সব পদযাত্রা ইদানিং পথেঘাটে দেখা যাচ্ছে তার উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের 'উ'-বিষয়েও যাদের বিন্দুমাত্র বোধ নেই তাদের নিয়ে কেন? ছবির জন্যে, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স? খবরের কাগজে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চোখে হাজির হবার জন্যে? অথবা টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠতে? নিরক্ষরতা সামাজিক অপরাধ। নিরক্ষরতা জাতীয় বিচ্যুতি, কলঙ্ক। ঠিক। কিন্তু স্কুলে একতলা ছাত্রছাত্রীকে সারিবদ্ধ চালনে, সাক্ষর-অধ্যুষিত এলাকার সম্মান-সমারোহে, ক্লাসে-ফেস্টুনে-রোদনে উত্ত্যক্ত উচ্চকণ্ঠ করে পথ পরিক্রমায় নিরক্ষরদের কোন উপকার করা হয়? একইভাবে গ্রামের জ্বালান তাড়াতে, পেট্রোলের অপচয় রোধ করতে আর প্রকৃতির সবুজকে ফিরিয়ে আনতে মানব পরিবারের সবুজদের নিয়ে যে অবরে-সবরে টানাটানি চলে, চলছে, তাতে কার উপকার বেশি হচ্ছে?

বলা যেতে পারে 'কাচ দেম ইয়ং' — শিশুমনের নরম জমিতে ভবিষ্যতের ছাপ ফেলে ফেলে সচেতনতার বীজ বপন করা হচ্ছে। অবচিতি অবশ্যই সচেতন করে। শৈশবের ছাপ হারিয়ে যায় না, মুছে যায় না। সেই অবচিতি চেতনার কেন্দ্র বা আশপাশ থেকে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে,

কোনদিকে চলবে, তা কি সেই অবস্থিতির উপর নির্ভর করে? অবস্থিতিকে নঞর্থক হতে পারে সদর্থক হতে পারে। সেই হওয়াটা নির্ভর করে — কচি মনের বাতাবরণ নয়, নির্ভর করে কঠিন-কঠোর নির্দয়-নিষ্ঠুর অনড়-অচল সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর। ধরে রাখার মতো ধারক, ধারণ করার মতো ধর্ম, স্থির-লক্ষ্য হবার মতো কোন আদর্শ যদি না থাকে তাহলে এই অবস্থিতিই ভবিষ্যৎ জীবনে পদস্খলনকে সহজেই পিছল করে দিতে পারে। অবস্থিতি থাকলেও পারে, না থাকলেও পারে। যৌন-শিক্ষার বেলায় আমরা কৃপণ, পর্ণোগ্রাফির বেলায় লৌহ-কঠিন সিন্দুক-মন। অবস্থিতির সেই এলাকায় পদযাত্রা নেই কেন? অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুশ্লাবী এলাকায় কচিকাঁচাদের ব্যবহার করতে সাহস নেই বলে নয় কি? টিকা-ভ্যাকসিন বিষয়ে কি এক-নয় মাসের শিশুকে সচেতন করে তুলতে হবে? মা-কি মা-বাবাকে, যারা কাজটি করবে, তাদের? টার্গেট-সম্প্রদায়কেই তো সচেতন করে তোলার কথা? কনডোম ইত্যাদি পরিবার-পরিকল্পনার প্রচারে এইসব কচিকাঁচাদের কেন ফ্লাশ-সেন্টুন-স্লোগান চলনের ব্যবস্থা করছি না? বড় হলে এসব বিষয়ের সচেতনতাও তো ওদের কাজে লাগবে!

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে সামনে যে উদ্দেশ্য টানাটান মেলে ধরা আছে তার পিছনে কোন-না-কোন গভীর অভিপ্রায় গোপনে-গোপনে সচল আছে। ব্যবহার করা হচ্ছে, যন্ত্র বা অস্ত্র হিসেবে। মানুষকে একটা 'এও' বলে মান্য করার কথা ধর্মে-দর্শনে-নীতিশাস্ত্রে বলা আছে। নেতৃত্বের শাস্ত্রে অবশ্যই সে 'এও' নয় 'মিনস' মাত্র; অভিপ্রায় সিদ্ধির হাতিয়ার। নৈর্ব্যক্তিক খাঁচায় পরিবেশিত অথবা সুপ্ত অভিপ্রায়ের হাড়িকাঠে বলিপ্রদেয় সংখ্যা মাত্র। নির্দয়, কিন্তু সত্য।

এটাই নেতৃত্বের পক্ষে দ্বিতীয় পাঠ। এই অভিপ্রায় গোপন রেখে উদ্দেশ্যকে টান টান সামনে ধরে রাখার অনুশীলন, প্রয়োগ এবং কুশলতা। ভিতরের মুখখানা যেন কোন অবস্থাতেই দুশ্যমান না হয়। সেই মনের-মুখের ভাব-কুঞ্চন শঙ্কা-সংশয় উদ্বেগ-উৎসুকা যেন ঘুণাক্ষরেও মুখ-মুখোশের স্নিগ্ধ-শান্ত চেহারায় আভাসিত না হয়, দুশ্যমান না হয়। প্রাণিকুলে বকেরা আদর্শ নেতার মূর্তি। আপাদমস্তক শুভ্রতায় মোড়া শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থান। অভিপ্রায়টি সঙ্গোপনে মনের গভীরে ঢাকা প্রাপ্ত। কিন্তু নরকুলে নেতারা দ্রুত চলমান ধাবমান। অকুস্থলের কাছাকাছি থাকাটা নেতা কর্তব্যের নিত্যকর্মবিধির মধ্যে পড়ে। সশরীরে না হলেও অন্য-শরীরে অন্তত তেমন তেমন স্থানে অথবা আশেপাশেই থাকতে হবে। এটা যে কোনও মাধ্যমেই হতে পারে — পুলিশ হোক, কাগজের হোক, ক্ষমতার অন্নব্যঞ্জনের ছিটেফোঁটা দিয়েই হোক। মোট কথা নেতাকে মানুষের মতো মানুষকেই দেখতে হবে এমন কথা নেই। প্রবচনের মতো রাজাসুলভ কর্মেন হলেই মহোত্তম, সর্বোত্তম। ঝক্কি ঝামেলা কমে যায়, গায়ে আঁচ লাগে না। ক্রাচাই সাতো একই সঙ্গে পোষাকেরও সত্যেম বিধান হয়, তারা গুরুত্ব বোধে স্বীকৃত হতে পারে। আবার সমাধানও ভেবেচিন্তে অভিপ্রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া চলে।

নেতৃত্বের এই দ্বিতীয় পাঠে বেশাত বাঘাত মায়াবাদের ফলিত প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যক্তির বেলায় যা অসত্য, সমষ্টির বেলায় তাই মায়া। এই মায়া দুই ভাবে কাজ করে — ঢেকে দিয়ে আর প্রকট করে দিয়ে। সত্যকে ঢেকে দেয়, 'কভার আপ' করে রেখে সত্যকে অদৃশ্য করে তোলে। আর দ্বিতীয় ভাবে, দুই নম্বরী প্রক্রিয়ায়, অসত্যকে কিছুকে সত্য বলে প্রতিভাত করায়, প্রকট করে দেখায়। অবশ্য যে কোন ইলিউশনের ক্ষেত্রেই — স্বপ্ন প্রত্যক্ষের বেলাতেই — একথা সত্য। এমন কি

পরেষ্টিয়াদের মত-মতামতই যাদের এই এক মাত্র ও দুই মাত্র কারণের কারণ। 'আমার আমার' — যারা তারাই উত্তীয়দের দিকে আঙুল তোলে, তাদের করে। মহাকে আঙুল করা আর নিজেকে মহা বলে পরিচয় করা, সুতরাং এদের মতামতই প্রধান কাজ। এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে তারাই। তারা আবার পরেষ্টিয়াদের নেতা, সেই কখন-কখন, সেই যা অর্থবাদী। কিন্তু নেতা যদি পরিচিত থেকে ছাড়া অন্য-অন্যের মুখে পৌঁছাতে হবে, অর্থাৎ প্রয়োজনে কুশল হতে হবে।

আমা প্রয়োজন মুখোশ। জনগণী নেতার মুখোশ। জনগণের কাজের, নির্দিষ্ট জনের জন্যে কাজকারের প্রয়োজন, পরিচিত-পুরুষজনের জন্য জ্ঞানকাজের ব্যবস্থা এবং অর্থের প্রভাবের সংরক্ষণ — নেতাদের-নেতাদের, দলে-দলে, কাজে-কাজে, পার্লামেন্টে-মিলিটারিতে এবং রেডিও-টিভিতে অনুরূপ অনুরূপিত হওয়া চাই। তাদের যেমন সমাজ প্রভাবে নিজের নিজের দেখাবে, তেমন জনগণীর প্রভাবে নেতাদেরও জন-গণ-জীন দেখাবে, নির্বাচিতরূপে পরিচালনাদ্বারা মনে হবে। দলে দলে, সমাজে-সমাজে উত্তেজ-বিহ্বল পাতাকুলনায় আর উত্তাপিত উত্তাপিত বাণি উত্তাপে নীড়-রা ভরা হবে সেই জনগণের জ্ঞানবিশ্বাসের কাছে, নেতার কাছে, নেতার কাছে — মাঠে-ময়দানে, মনুষ্যেশীর পাশাপাশিতেও।

এই আমাদের যে মতো নিপুণ সে তাতো বড় নেতা। এই পাত্রের পাওয়া এবং তাদের কুড়োনো — অভিজাতের সিঁড়ি এবং উপাদানের সমকালে দুই কূলে সমান সংরক্ষ — এ তাদের রেজিস্টেন্ট কাজ। যে পারে যে আপনি পারে, পারে যে নেতা হতে। এই পারাটাই নেতার তৃতীয় পাঠ।

একটু প্রশিক্ষণ করা যাক। পাত্রের পাশ বসাতে, নেতাদের বেরাতে, উপাত্তরে ধরে বিশ্বের সাজানো কর দোলায়। নেতার জনগণীর সুবিধ বিস্তারিত শীর্ষে যে দুই পরাপাশ সুপত্র কর এবং পীত পরাপাশ যে পত্র কারণ সমাজের তা অবশ্যই উত্তরতম নেতার স্পর্শযোগ্য। কিন্তু সব নেতাদের সাধিনাদারাই যদি খেয়ে বেয়ে সেই আনুকূল্যের অভিজাতে একজন। এখানেও সেই ডারউইন তত্ত্ব — সমাজবিজ্ঞান অব দি ফিটেস্ট — সমানভাবে কাজ করে। কাজ করে কারণ প্রাকৃতিক বিষয়ে যা পড়া তা এই নেতাদেরও সমান সত্য হতে বাধ্য। যে যে তুলনামূলি সমাজকে প্রাণিগণ থেকে আলাদা করে থাকে সেই সেই গুণ আবার নেতা হওয়ার সম্ভাবনা আর খেয়ে যাবে। আর এই যে পাঁচাদা কর নেতা-অভিজ্ঞ, এই সংরক্ষণে আর জনতুল্য যাই — কিন্তুর জনগণ যাই আর সংরক্ষ মতো নেতাদের সমাজবিজ্ঞান নিয়ে সমাজের কাজকারবারই যাই। জনগণীদের সমাজোত্তরণের দুই থেকে পীত পরাপাশ নেতাদের আসাদিনার চাপাও খোলায় চলে আর পর পর নেতা-উপনেতাদের উত্তরতম স্তরেই প্রয়োগ সংরক্ষে দর্শকের কাজে তাদা ছেড়ে যাবার বড়ো হয়। সেই সমাজতন্ত্রের কেন্দ্র সমাজেরই জন্য — অর্থ-জনতা, নিয়োগ-কারী, প্রাইমেন্স-পার্লামেন্ট এবং ইত্যাদি।

এই জনগণে সুতরাং ইঁদুর নি কেক সমাজ নিদান আপনির সমাজ দেখি না। তাদের কুড়োনো বাসনাটা কেমন? রোমেন্টিক — পদতলের সর্বজনগুলো তাদে — ছোট-সমাজই সেই কুড়োনোটা। জনগণের নিজের প্রাকৃতিক মতো ছোট-পত্র সংরক্ষ করা নিজের পাশাপাশি তাদা করতে পারবে — তাদের কুড়োতে পারবে — তাতেই তোমার কেক বাসনা অভিজ্ঞতা জন্মাবে। পদতলে, বিশেষ করে আমাদের দেশে, বাসনাটা ভাবাবেগাত্মকও যাই — যেকে তোমার মতো অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হবে, মতো পাত্রের মধ্য তোমার কুড়িতে তাদা করতে পারবে তাতেই তোমার তাদের কুড়োনোর কাজটা বাড়বে। ছোট তো প্রায় বাসনাদের মতো বাসনাবাদী বাসনাদের বিষয় হয়ে যেতে — বাসনাটাই, পদ্য।

শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্তই আধুনিক নেতৃত্বের জন্যে প্রধানত পথ হয়ে গেছে — বুদ্ধি-চেতনা-প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-অভিজ্ঞতা। আর তার মধ্যে নেতা হতে গেলে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার পাঁচ নিতে হয়, অসংখ্য পথ ঘাটের থেকে নিজে নিজেই চলে। বুদ্ধি নয় প্রাকৃতিক অনুশীলনের গুণ, নেতা নয়, প্রজাকের জন্য, প্রজাকে নিজেরে জন্য আইন-কেন্দ্রিক-নিয়ম সংগ্রহে থাকা চাই — এইরকম।

এই যে সর্ব-পথ-অবস্থান যা মুক্ত-নেতাকে প্রকাশিত-নেতায় রূপান্তরিত করে তোলে, এই মনোভাবই একদিকে আত্মজ্ঞান বিস্তৃতিকরণের — মহাজ্ঞানের পরিস্থিতির জন্ম দেয়। অন্যদিকে বাই-প্রোডাক্ট। আত্মজ্ঞান, নেতৃত্বের কর্মকাণ্ড-অকর্মকাণ্ডের উপ-বৃদ্ধি। অন্যান্য দেশে গবেষণা কেন্দ্র থাকাটাকে নেতৃত্বের প্রধান গুণ বলে মানা করা হয়। আমাদের দেশে, ইতিহাস সাক্ষি, খবর যাদের আর মানুষের আত্মা কুকুরকে কামড়ায় নেই, মানুষ যখন মানুষকে কামড়ায়, তখনই তা খবর। অপ্রাকৃতিক হয়ে বৃদ্ধিজীবী কল্যাণ-সেন্টিমিন্টিয়েন্সের উপাদান উপাদানগুলো ইতি হয়ে যায়। অ-মানবিক হয়েই কৃতী শেষ নিউজ — এবং সম্ভব হয়ে যাবেই ছবি এবং স্বয়ংক্রিয়-বিজ্ঞাপনী বাণপন সহ।

একটা সময় ছিল যখন শীর্ষ সাধনা আর শীর্ষতত্ত্ব অনুশীলনেই নেতা হওয়া যেতো, জনমনে স্বীকৃতি পাওয়া যেতো, ইতরপুরুষের স্বয়ংবে স্থান পাওয়া সম্ভব হত। খবরের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যাবার পরে পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। খবর এখন আত্মজ্ঞানের মতো ক্রুট ছড়িয়ে পড়তে পারে। একটা মারাত্মক প্রতিযোগিতা চলছে খবরের শীর্ষে থাকার অথবা খবরের শীর্ষে পৌঁছানোর। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিশ্বমঞ্চের অতলে নির্বাসিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। চেয়ে একটু ভুল হলেই সম্ভাব্য শীর্ষবিন্দুর চিরতরে ক্ষুব্ধ হয়ে যেতে পারে। সাধনা আর অনুশীলন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই সবকিছুই, সব ছাড়াই, সর্ট-কাট খুঁজতে বাধ্য। সহজে কিস্তিমাতের সর্বোত্তম উপায় কি?

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের মনে বহু রকমের আগ্রহ আছে, বহু বিষয়ের প্রতি টান আছে। আদর্শবোধ, মূল্যবোধ, মানবিকতাবোধের প্রতি টান আছে। অর্থ-সম্পদ-সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ আছে। আবার যা কিছু বিকৃত-বিভৎস তার প্রতিও আকর্ষণ আছে — অত্যাচারের প্রতি, পাশবতার প্রতি, পর্যেন্নাফির প্রতি। অন্য সব টান প্রকাশিত বহমান, অন্তরাল-প্রীতি কম্বু বেশমান। অন্য সব আগ্রহের উৎসে থাকে ভাবনা-চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ। বিকৃতির প্রতি যে টান তার উৎস আবেগ-প্রেরণা। তাই গভীর, উত্তেজক এবং শীর্ষগামী।

এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তে কেবলে স্থানীয় নেতা একদিনেই জাতীয় স্তরে নিজের অবস্থানকে বিলিত করে নিতে পারে। কাজের প্রথম পাতায় সমেত খবরের ছোট বেরে যেতে, প্রেতিও-টিভির মোমবাতি জ্বেলে জ্বেলে এবং পরদিন প্রতিবাদে ফোন-পেইজেন্সেই নিয়ে স্থানীয় চরিত্র এক মহাকাব্য হয়ে যেতে নিয়ে জাতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত-অনুপ্রাণিত হয়ে যেতে পারে। বিষয়-আশয় যা কিছুই হতে পারে — জাতি-ভাষা, ধর্মীয়, বিশ্বাসগত, সাম্প্রদায়িক, সাইবেরিয়-পারমাণবিক, শিল্পী-প্রাকৃতিক এবং ইত্যাদি।

কিন্তু এই সুবিধা-নিয়ন্ত্রণ নেতৃত্বের পথ বড় ভয়ঙ্কর, বড় দুরূহ। আত্মজ্ঞানের পথে নেতৃত্বের পাওয়া হয়ে সুখী ওঠা সম্ভব বলে নয়। অনাবিল পথিক বলে উঠবে চরিত্রের সাধনার চড়া দেখা কিন্তু দেখানো থেকে নিজের আত্মজ্ঞান পরিমাণ প্রমাণ করে দিতে হওয়া বেশ শক্ত কাজ। বেশিরভাগ

নেতাই কনস্টিটিউশনাল থেকে যায়। সেটাও অবশ্য কম আছের নয়। বর্তমান সময়ে নিয়মিত নেতৃত্ব কৌপীনধারী-আশ্রমবাসী বলে পরিচয়ের। নেতৃত্ব বলতে এখন শান্ত নেতৃত্ব বোঝায়, শক্তির উপাসক। ক্ষমতার কারাগারে ভেতরের সুরা পানই নেতৃত্বের জীবনরেখা।

এখানেই চতুর্থ পাঠের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষমতার মাধ্যমে, বিদ্যাধীনের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার — ক্ষমতাসের ব্যবহার, নিজের মই শক্ত করা এবং অপরের মই সরিয়ে নেওয়া। এসবই মঞ্চের বাইরে থেকে করতে হবে — সূক্ষ্ম সূতোর নিপুণ ব্যবহারে। যখন যখন মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে তখন তখন জনগণমনের স্বামী হয়ে অপদার্থবিদ্ধ কিন্তু জনগণের ভাবনায় উদ্বিগ্নমনা দেখাতে হবে। এই মঞ্চাভিনয় নেতৃত্বের চতুর্থ অনুশীলিতব্য পাঠ। এই পাঠে ছেলে প্রস্তুত করা আছে, ছেলের মস্তান-লাঠিয়াল-ঠেঙাড়ে তৈরি করা আছে, যে কোন প্রয়োজনে — লাগার, ভোট আদায়ে, অর্থসংগ্রহে, প্রতিপক্ষ নির্যাতনে — তাদের কাজে লাগান আছে। আছে, কিন্তু নিজের হাতে যেন দাগটি না লাগে তা দেখার আছে। এটা একটা হাই-রিস্ক কলাকৌশলতা।

প্রোগ্রেসিভিরাই অব দি ওয়ার্ল্ড ইউনাইট — বিশ্বের প্রগতীবী মানুষ এক হও। অবশ্যই উত্তম ঘোষণা। অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও। ঐক্য না থাকলে, এক হতে না পারলে পতনই অবশ্যম্ভাবী। চির সত্য — অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বলে কোন কথা নেই। এখন সর্বশেষ: কারণ সরদারের বাণিজ্যিক বর্তমান উক্তিতার নিরিখে অত্যন্ত কৃপণ। সমাজজীবনের এই সত্যকে নেতা-জীবনে অনাদরে প্রয়োগে ডাক দেওয়া হয়েছে — ক্রিমিনালস অব দি আন্ডার ওয়ার্ল্ড সার্ভ এন্ড গেট সার্ভড — অপরাধপ্রবণ গুহাবাসীজন সেবা কর এবং সেবা পাও। কাজে লাগ এবং কাজে লাগাও।

জনগণের শতকরা নব্বই ভাগ মানসিক দিক থেকে নিয়মকানুন অনুসারী শান্ত-সৎ জীবন যাপন করতে আগ্রহী। কিন্তু তারা ইউনাইটেড নয়, ঐক্যবদ্ধ নয়। বাকি শতকরা যে দশভাগ অপরাধপ্রবণ তাদের মধ্যেও সকলে অপরাধী হবার শক্তি-সাহস-সুযোগ পায় না। যারা পায় তারা সংখ্যায় অত্যন্ত হলেও কাজে অত্যন্ত দড়। বহু সংখ্যক সভা-পালিত জনগোষ্ঠীর জন্যে দুচারজন রাখালই যথেষ্ট। এই রাখালরা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। নেতৃত্বের কাজ এদের ভোটের পয়েন্টে মোতায়েন করা, নিযুক্ত রাখা। 'কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' — স্লোগানের প্রকৃত তাৎপর্য 'কালো হাত খুঁজে নাও, গুঁড়িয়ে দাও'। সব কালো হাতেই শক্তি বেশি। শক্তি বেশি তার কারণ সেই হাতে 'পাচনি' বা 'পাচনবাড়ি' থাকে। সেই পাচনির চেহারা-চরিত্রের, আকৃতি-প্রকৃতি, শক্তি-ক্ষমতা অশেষ — ইস্পাতের ফলা, গেঁটা, নল ইত্যাদি থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রলাকায় খুঁজতে হবে। একটা অদৃশ্য গিল্ড-এন্ড-স্টকের বাতাবরণে নেতা সুস্থিত থাকবে নেতৃত্বে, আর অপরাধী নিশ্চিন্ত থাকবে তাদের অ-সামাজিক কাজে-কারবারে। দিবে আর নিবে মিলবে মিশিবে যাবে না কিন্তু — নেতা কাঙ্ক্ষিত কাজ পাবে, আর আশ্রিত জন, অপরাধীজন পাবে প্রত্যাশিত সুরক্ষা। চলছে, চলবে।

কিন্তু কেন চলছে? কেনই বা চলবে? কারণ তো আর একটা নয়, অনেক। প্রথমেই ধরুন সেই অসংগঠিত শক্তিহীন আইনজীবী সমাজের কথা। তারা শাসনের তাড়নায়, সন্ত্রাসসন্তাসের ভাবায় এবং পরিবর্তিত নীতিজ্ঞান তোলা, আর্থসামাজিক সংস্কারের ভেলায় ভেসে-আসতা-নকলের পিছনেই জীবনের পুঁজি নিয়োগ করে দিতে বাধ্য। ভীত-সন্ত্রস্ত ভাগ-চকিত

বলে তাদের সময় নেই শতকরা ওই দুই ভাগের মুখোশের আড়ালে যে সদাব্যস্ত কারখানাগুলি চলছে তার হদিশ নেবার। মাঠ তাই ফাঁকা। ঐ বহুজনের অসহায় করজোড় অবস্থানে স্বল্পজনেদের হাতে লাঠি-ছোরা-বন্দুক অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারপরে ধরুন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিমানদের কথা। বুদ্ধির অনুশীলিত পুঁজিতে আর সংগৃহীত জ্ঞানের ভাণ্ডারে এরা স্বভাবতই মস্তক-জননীর মতো অহংকারী। বহুজন যে জনগণ তারা এদের কাছে এসে হাঁটুভাঁজ করে বুদ্ধি-পরামর্শ চায়, স্বল্পজন যে নেতাগণ তারা এদের নরম চেয়ারের গভীরে আসন দিয়ে পথ নির্দেশ ক্রয় করে। তাই এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তরা মনে মনে সার্থকতায়, প্রাপ্তির আর সম্মানের আসনে নিজেদের দেখে দেখে নেশাগ্রস্ত আফিংখোরের মতো বুঁদ হয়ে থাকে। কোচা দুলিয়ে ঘরে ফিরে আরামকেদারায় শয়ান করে। স্ত্রীপুত্রকন্যারা গর্বে স্ফীত হয়ে বুদ্ধিজীবীর শিরে পাখার বাতাস দেয়। অথবা, এটুকু দুলিয়ে টাই-এর নট ঢিলা করে কোমর-নিমজ্জ সোফাসেটে আসীন হয়ে দিনান্ত তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। স্ত্রীপুত্রকন্যারা অর্জিত আরামকে পার্টিতে-সোসাইটিতে, স্টিরিও-ভিডিওতে অথবা বারে-নাচে উপভোগ করে। এখানেও মাঠ ফাঁকা। বাণিজ্য-পরিকল্পনা চিল-শকুন-ঈগলের প্রকৃতি পেয়ে যায়।

এবারে ভাবুন ওদের নিজেদের কথা — ওই দুই শতাংশ নেতা-অপরাধীদের কথা। নেতৃত্ব এবং অপরাধপ্রবণতা দুটোই নেশা। নেশা ধরার সময় ধৃতের কিছুটা স্বাধীনতা থাকে — ধরব কি ধরব না। কিন্তু নেশা যখন ধৃতকে ধরে তখন পাকড়াও করে, গিলে খায়। অক্টোপাস। তাই নেতৃত্বের ঘোড়ায় অধিষ্ঠিতজন ইচ্ছে করে আর নামতে পারে না। পারে না কারণ সেই ইচ্ছেটাই আর তেমন মনের মধ্যে কেন মনের আনাচে কানাচেতেও স্থান পায় না। অপরাধীও তাই। একবার অন্ধকার ভয়াপথ বেয়ে নিম্নে সেই পথের শেষে আলোর আবেদন আর সম্ভব হয় না। তাই এই স্বীকৃত নেতারা আর ধিক্কৃত অপরাধীরা সদাসর্বদাই উজ্জ্বল নেতৃত্বকে সমাজ থেকে দূরে রেখে দেয়, হটিয়ে দেয়, মুছে দিতে তৎপর হয়। অনেকটাই দুষ্ট ভাইরাস যেমন শিশু রক্তকণিকাকে, যৌন সাহিত্য যেমন জীবন শিল্পকে অথবা টিভির মাইক্রো ছবি যেমন প্রকৃতির শ্যামল সুন্দরকে। এখানেও সেই মায়া-প্রপঞ্চের দ্বিমাত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড সমান ঘটমান — উজ্জ্বল নেতৃত্বকে আড়াল করে রাখা এবং স্বার্থ-নেতৃত্বকেই উজ্জ্বল বলে দেখানো। ঈশ্বরের মুখোশে সৎ-ব্রহ্মকে আড়াল করা এবং নিজেদেরই সর্বেসর্বা সর্বশক্তিমান কল্যাণের মূর্তি বলে জাহির করা। [এবং অবশ্যই মাঝে মাঝে জনগণকে উদ্বেলিত উত্তেজিত করে তোলা — বিরোধীদের নির্মূল করা, সংগ্রহকে স্তূপাকার করা এবং বশংবদদের সুযোগ দেওয়া। অর্থাৎ শক্তির পূজায় তান্ত্রিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কালী আর শনিকেই দেবতাকূলে একচ্ছত্র বলে মানাতা দেওয়া!]

এটিই নেতৃত্বের পঞ্চম পাঠ — এই সম্ভাব্য সৎ-নেতাকে শৈশবেই নুন খাওয়ানো, নিপ ইন দি বাড, অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। এই পাঠে ছোট ছোট নেতারা অনেক ভুল করে। তারা আইডিয়াকে আক্রমণ না করে ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বসে। বড় বড় নেতারা তাই আইডিয়াকেই নিধন করে। এই কাজে ব্রুটাস হওয়াটা আবশ্যিক, বাগ্মিতায়। চাণক্য হওয়া প্রয়োজন, কূটবুদ্ধিতে। উজ্জ্বল নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখলেই তাই বশংবদ দুই শতাংশকে লেলিয়ে দিয়ে মুড়িয়ে দাও অথবা একেবারে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে শক্তির নেশায়, ক্ষমতার লোভে এবং ভোগের প্রবাহে মস্তিষ্ক শোধন করে দাও। তবুও যদি কোন 'পাজী' থেকে যায় মাঝামাঝি তাহলে পেইন্ট হিম ব্ল্যাক, সংবাদ-মাধ্যমে ছিটিকবার ছড়াও এবং জনমনে তার কবরের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দাও। এসব কাজই নেতাকে

করতে হবে জনজীবনের ভাবমূর্তিটি সদা জাগরূক রেখে। এই মুখোশটি মুহূর্তের জন্যেও যেন মুখ থেকে বিচ্যুত না হয় তা অবশ্যই দেখতে হবে। এটুকু রক্ষা করতে না পারলে নেতা হওয়া আপনার কাজ নয় জানবেন।

যদি মনে করে থাকেন যে উত্তম নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই আপনার কাজ সিদ্ধ হবে তাহলে বৃথাই এতক্ষণ লিখে মরলাম। সৎ-উদ্দেশ্য-নেতৃত্ব সব সময়েই বোকা হয় কারণ আত্মসমর্পণ হয়। তাদের মধ্যে একটা আদর্শবোধ থাকে একটা সামঞ্জস্যের প্রতি আগ্রহ থাকে নিজের যথাসর্বস্ব অপরের জন্যে পণ করে বসার বাসনা থাকে। তাই এদের, আদর্শবান সুতরাং বোকাদের নিয়ে নেতাদের বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। সহজেই ঘায়েল করা যায়। বাপারটার কঠিনতম দিকই হল সংসারীদের মধ্যে চেয়ার দখলের লড়াই। সেখানেই 'কহিবে উত্তর যাইবে দক্ষিণ' নীতির সঙ্গে প্রয়োগ ঘটাতে হয়। মুখোশের ব্যবহারই শুধু নয়, মায়াবাদের ব্যবহারে শংকরাচার্যকেও ছাড়িয়ে যেতে হয়। নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধের খৈ ফুটবে মুখে, জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাবের গভীর-কষ্ট এবং অশ্রু-গণ্ড হতে হবে, দেশের-দশের মঙ্গল-বেদিতলে সন্ন্যাসী-সাধক বলে নিজেকে এখানে-সেখানে-সর্বত্র তুলে ধরতে হবে, কাবেদ-অনুগত-অনুচরগোষ্ঠীর গলাফাটানো প্রচেষ্টায় পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টিভিতে, মাঠে-ময়দানে, প্রাকারে-প্রাচীরে, সেমিনার-প্রেসিডেন্সিতে সেই বাণী ঘন ঘন ঘোষণা করতে হবে। আর তলে তলে ইঁদুরের মতো প্রতিপক্ষের — বর্তমান চেয়ারধারীদের পায়ের তলার মাটি খসিয়ে দিতে হবে, দলের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টি ঘটাতে হবে, কোথাও কোথাও দাঙ্গা-সৃষ্টি-আগুন লাগাতে হবে, অর্থ ও শক্তি সংগ্রহের জন্যে অন্ধকার জগতের সাহায্য নিতে হবে — এসব কি একটুখানি কাজ? যদিও সকলেই জানবে এমন জঘন্য কাজ নেতা কাউকে না ঘৃণা করে, শ্রদ্ধিমিশ্রিত করে জানাতে হবে নেতা জনগণের সঙ্গে, জনগণের মধ্যেই আছে, বিশিষ্ট বিভেদ সময়ে হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটোছুটি করে বোঝাতে হবে জনগণের জন্যে দরদ কাকে বলে। এ সবই করতে হবে ভোটের সংখ্যা মাথায় রেখে। নেতার এই আহ্নিকগতির চরিত্র বৈশিষ্ট্যই নেতাকে আলোর জগতে নেতা করে রাখে, অন্ধকারের জগতেও। দিন আর রাত সূর্যের আর পৃথিবীর নিয়মে ঘটে। নেতা-জীবনে দিনের জনগণ আর রাতের অপরাধী-জন অবশ্যই চেয়ারকে কেন্দ্র করেই চক্রবৎ আবর্তন করতে থাকে।

এটাকে বলতে পারি প্রোজেকশন — উপস্থাপন, ক্ষেপণ। নেতা নিজেকে প্রোজেক্ট করে। নিজেকেই? — না, নিজের মুখোশকে। তাই তো যে নেতা যত বড় তার মুখোশের সংখ্যা তত বেশি। পৈত্রিকের খোসা। দর্শকরা দেখে, অভিভূত হয়। জনগণ হাততালি দেয়, ঘরে গিয়ে চালের কাঁকর বাছতে বসে, অথবা কেরোসিনের দোকানে সরীসৃপ শৃঙ্খলের পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁটুতে-কোমরে হাত বুলোয়। পাকস্থলীও উদ্গিরিত হয়। মুখোশের আড়ালে মুখোশ দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত পায়। নিজেরাও পত্র মুখোশের আড়াল খোঁজে, সংগ্রহ করে। দিন ও রাতের জন্য তৈরি হয়। নেতাকে উপহারিত করে; তাদের রাতগুলো, সমাজকে দেয় দিনগুলো। আর নিজেদের জন্যে জমা করে চেয়ে দিনগুলোর জমীন-আসন মঞ্চসজ্জাতার। এরাও নেতাদের মতোই নির্বেদিত প্রাণ।

নেতা জীবনের দুঃখময়তার কথা না বললে বাক্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জনতার চূড়া থেকে পতন, অথবা ভোটযুদ্ধ কর্মিষ্ঠ-কর্মিজনের নৈরাশ্যের খাদ থেকে উৎপাটিত হওয়া এবং প্রোকসজ-

রাজসভা-বিধানসভার ধবধবে আলো আর পটাপট ক্যামেরা-দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাওয়া জীবন যে কী ভয়ানক তা একমাত্র নেতারাই জানে। জনসাগরের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভেসে চলা থেকে যখন সেই জনসমুদ্রের গভীর অন্তরালে ডুব সাঁতারে বেঁচে থাকতে হয় তখন নেতা জীবন বড়ই ভারি বলে মনে হতে পারে। তবে ভেসে ওঠার আশা নিয়েই তারা ডুবসাঁতার অভ্যাস করে। ডেমক্রেসির এই এক মহা সুবিধা। জনগণ বোকাও বটে, ভুলো-মনও বটে! দুইয়ে মিলে এখন সোনা-সোহাগা হয়েছে — নেতা যেমন মুখোশ-ধোঁয়াজের আড়ালে ধোঁয়াটটি হয়ে, সকল কাজে 'ভুলুদের ওঁড়ো' হয়ে, সকল মতেই হবিষ্য-প্রাপক দেবতাটি বনে গেছে, তেমনি গণতন্ত্রের মন্ত্রতন্ত্রও এক বিশাল বিপুল জনগণ-মুখোশ, ভান, হয়ে অনড় চেপে বসেছে।

পণ্ডিতজনেরা বলে গেছেন বোবাকে বোবা অন্ধকে অন্ধ আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না। কাদের প্রতি এই উপদেশ পরিষ্কার নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই — স্বজাতির ভাল সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। আমি পণ্ডিত নই তাই এই উপদেশ আমার জন্যে নীতিবাক্য নাও হতে পারে। আবার আমার লেখা কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি উল্টে পাল্টে দেখবেন তেমন ভরসাও যখন নেই তখন বিশ্বাস করে আপনাদের কাছে কোদালকে কোদাল বলার চেষ্টা করতে দোষ কি?

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কোনও এক মহিলা পণ্ডিত, পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, এই নীতিলঙ্ঘনকারী কাণ্ডটি করে বসেছিলেন: পিতৃ-তুল্য বাপু-ঘোষিত সেই সর্বজনমান্য নেতাকে দরিদ্র রাখতে এই দেশের দেশত্ব দরিদ্রদের কতো শত জনের দরিদ্রতর হতে হত। সেই নেতাকে দরিদ্র দেখাতে, দরিদ্রের যোগ্য হাঁটু-ধুতি আদুল-গা পোশাকে — মুখোশে? — উপস্থাপিত করতে দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হত। [এখনও পিতাদের নয় 'স্বামী'দের অনেককেই এক-কাপড়ে নিতবাদী শুদ্ধজীবন যাপনে স্থিত থাকতে হলেও অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা আছে, যদিও ব্যাপারটা রাজনীতির এলাকায় নয় ধর্মের এলাকায় পড়ে বা ঘাটে!] সেই পণ্ডিত নেই, সেই পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতর্হি কেবলম আর নেই। ইতিহাস। ইতিহাস থেকে বর্তমানে আসুন।

বর্তমান সময়ে উচ্চস্তরের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সম্বৎসর কয়েকটি ফিতে কাটার জন্যে আর দু'চার গাছা বিলে স্বাক্ষরের জন্যে যে পরিমান — লক্ষ লক্ষ পরিমাণ টাকার মোড়মোপচার বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন-অনুষ্ঠান স্থায়ী বাসা বেঁধে আছে তা সাধারণ জনের কল্পনার অতীত। রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালরা ফিতে কাটার যোগ্য থাকতে — বলা উচিত তাদের যোগ্য রাখতে — গণতন্ত্রের যে পরিমাণ অর্থব্যয় ঘটে তাকে শীর্ণদেহ রোগীর দেহ থেকে রক্তক্ষরণের তুল্য বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া আছে বড় ছোট মন্ত্রী, উচ্চনীচ সচিব এবং ইত্যাদি মহা-জন গুরু-জনেরা — শত শত সহস্র সহস্র। তারা অবশ্যই মহা-মহা কাজ করে, গুরু-গুরু ভার বহন করে, দেশের প্রয়োজনে করে। বরং বলা উচিত অপরের প্রতি, জনগণের প্রতি সেবা-ধর্ম থেকেই করে থাকে। সেই জনগণের কি কোন দায় নেই? অবশ্যই আছে। আর আছে বলেই তাদের, সেই সব নেতাদের জন্যে গড়ে ওঠে কসেসকু-যোগ্য বাসস্থান, রান্না-যোগ্য রান্নাঘর, বাবা-যোগ্য কটেজ। দেশের জন্যে চিন্তা করতে হলে যে কোনও অবস্থানেই কি তা সম্ভব? শীতাতপনিয়ন্ত্রিত না হলে মাথা হবে উষ্ণ, চিন্তা হবে ব্যাহত, জনগণের হিত-সিদ্ধান্তসমূহ হবে বিপথগামী। তখন?

শুধু বাসস্থান নয়, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-সম্মেলন, অফিস-দপ্তর-যানবাহন, আত্মরক্ষা-সুরক্ষা-প্রতিরক্ষা, চলন-বসন-ভোজন — সবই রাজসিক হওয়া দরকার। রাজা আমাদের দেশে নেই কিন্তু

বিদেশবাসনের সংস্কার তো রেখে গেছে, জমিদারী প্রথা উঠে গেছে কিন্তু রক্তের মধ্যে সেই তেজ সেই তোষামোদ সেই প্রজা-পুষ্টি তো উবে যায়নি, কৃষিপন্য কবেই ঘাড় থেকে নেমে গেছে কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া ইংরেজি-কায়দার, নিম-বার আলো করামন ভোগের জীবন তো আর মুছে দিয়ে যায়নি। আমাদের নেতারাতাড়াতাড়ি তাই অচিরেই সেই সব মুখোশগুলোকে মিউজিয়ামে না পাঠিয়ে নিজ-নিজ মুখে পরে নিল। অভাব-জনগণ রাজতন্ত্রের আর গণতন্ত্রের ফারাকটুকু অনুভব করার অবকাশই পেল না। বাবা চলে গেলেন কিন্তু কাকাবাবুর মুখখানা হারিয়ে গেল বিলেতী মুখোশের আড়ালে, জেঠামশাই তার চির পরিচিত মুখখানা ঢেকে দিলেন ভাইসরয়ের ফেলে যাওয়া ভাইসের অন্তরালে। অবশিষ্ট স্বজন-পরিজনেরা রোমানদের মতো হয়ে গেল। জনগণ জয়ধ্বনি দিল। দেশ স্বদেশ হয়ে গেল।

প্রথম রাতে বিড়ালটা মারা হয় না বলে বিড়ালদের পপুলেশন এক্সপ্লোশন ঘটে গেল। নেতারা আমিত্বের জোরে জোরিয়ে-জিয়ে হয়ে গেল। বড়কে দেখে বড়ো শিখলো। বাড়াকে দেখে মেজো, এবং মেজোর দেখাদেখি ছোটো দীর্ঘ অনুশীলনে আমিত্বের ভক্ত হয়ে একই শ্রেণীর বিশ্বাসে-সংস্কারে গা-ভাসিয়ে দিল। ফলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশের সকল নাগরিকরাই হয় 'নাগরিক' হয়ে উঠলেন অথবা মনে মনে গ্রাম-ট্যাম করে নাগরিক-মনা হয়ে গেলেন। সকলেই সমান, সকলেই নাগরিক। কিন্তু কিছু একটু বেশি বেশি — এই যা তফাত!

আর মাত্র একটি ধাপ বাকি রইল। সে কি তাই দূরে থাকতে পারে? বিশ্বনাগরিকত্ব? মানে, পশ্চিমের কাঠামোয় পূবের মুখ। আমাদের আর তাই সিভিল হওয়ার সময় হল না, নাগরিক হয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে কেবল টিভির সামনে বসে বিশ্বকে এক নীড় দেখতে বসে গেলাম বুঁদ হয়ে। নিজ নিজ মুখ হারিয়ে প্রত্যেকেই, অনেকেই, শুধুমাত্র মুখোশ হয়ে গেলাম। পেঁয়াজ, সবই খোসা।

জনচিত্তের এই দুর্বলতাকে যারা সহজেই বোঝে, দ্রুত কাজে লাগাতে পারে তারাই তো জননেতা। স্বাধীনতাবোধের বাতাস যখন আকাশে বইছে তখনই তাই নেতারা একটা করে ছোটপত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল, "এই নাও তোমাদের গণতন্ত্রের প্রাপ্তি। তোমরাই স্বাধীন শক্তির উৎস, নির্ণায়ক, নির্বাচক। সাংবিধানিক অধিকার। যাকে খুশি তাকেই নেতা করে দাও। তোমরা আসল, তোমরা প্রধান নিখিল ভারত তন্ত্রমন্দিরে।" উল্লসিত জনগণ ভাবলো — এই তো ঠিক। আর নেতারা ভাবলো — বেশ উত্তম ব্যবস্থা! স্বাধীনতার ছোট-পরিচয়ানা পাঁচ বছরে একবার বাক্সের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে তোমরা শূন্যতাতে আকুল চোখ, আমরা পূর্ণ কম্পিতে চর্বা-চূষা-লেহ্য-পেয়তে মশগুল হই। দ্বিতীয়বার ছোটর পরিণাম হতে হতে নেতাদের হাতে আসল সময়।

এখান থেকেই শুরু মঠ গঠের। ছোটপত্রখানা হাইজ্যাক করতে হলে ত্রিবিধ শক্তি থাকা চাই — অর্থ শক্তি যা সব কিছুকেই কিনে নিতে পারে, পেশী শক্তি যার জন্য সংঘাত দখলে থাকলে বহুসংখ্যক নতজানু পত্রালিকা ব্যবহার করতে বাধা আর জনবল যা সমাজ ও সভ্যতার দিনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে পেশী শক্তির কথা আপনাদের বলেছি। জনবল বা জনশক্তি নানা নামে প্রাপ্ত — কর্মী, কান্ডার, ক্রিয়ুট। এরা সহজ ও সাধারণ পথ ছেড়ে কিছু পেতে চায়, হতে চায়। তাই গণতন্ত্রে নেতা ছাড়া এদের গতি নেই। এরা জনগণ থেকেই আসে বলে এরা লোভ এবং ভুলে-মন ও নেতার কাছে ইজি-টার্গেট। অর্থশক্তির কথা কিছু বলা হয়নি। অর্থ শুধু

অনর্থের মূল নয়, অর্থ গণতন্ত্রেরও মূল। বিশেষ করে বৃহৎ গণতন্ত্রের। এই অর্থশক্তি সংগ্রহ করা এবং অর্থশক্তির কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থাকাটা নেতার পক্ষে আবশ্যিক জানবেন।

অর্থ 'উপার্জনের' একটিই পথ আছে — আপনার যে কোনও গুণ ক্ষমতা এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগানো, নিজেই খাটানো বা অন্য কাউকে বিক্রি করানো। মূল্য বা মজুরীই উপার্জনের পথেয়। কিন্তু সেই অর্থে পেট চলে, নেতৃত্ব সেচন পায় না, শক্তির উৎসে প্রাণের যোগান ঘটে না। সেজন্যে চাই অর্থ 'সংগ্রহ'। সংগ্রহের অনেক উপায় আছে। সে সব উপায়ের কোনটিই নেতার কাছে অস্পৃশ্য অযোগ্য অকাম্য নয়। তাতে আছে মানুষের, অর্থের জাত বিচার নেই। অর্থকে ঈশ্বর মনে করে সে যে সর্বত্রই বিরাজমান তা প্রথমেই বুঝে নিতে হবে নেতাকে। তা হলেই সংগ্রহের সহস্র পথ খুলে যাবে। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখিবে তাই।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সদস্যভুক্তি, চাঁদা আদায়, কৌটো-নাড়ানো, কুপন বিক্রি ইত্যাদি গণমাধ্যম সংগ্রহ আসলে ফ্রন্ট-ফেস, মুখোশ। এই সব নিরামিষ প্রক্রিয়া ধারেও কাটে ভারেও কাটে — একদিকে এ্যাকাউন্টেবিলিটি স্বতঃসিদ্ধ চেহারা পেয়ে যায় অন্যদিকে জনচিত্তে মানসিক সমীকরণটি সহজপ্রাপ্য হয়ে ওঠে। প্রথমটির আড়ালে রাঘব-বোয়াল সংগ্রহগুলো এবং সেই সংগ্রহসমূহের অনিবার্য কমপ্রোমাইজগুলো সাধারণো ধরা পড়ে না। অর্থের থোক আসে নেতার হাতে, পার্টির তহবিলে আর নীতি-নিয়মের মাথা মুড়িয়ে যায় ঠেকের কাছে — সেই ঠেক বা উৎস কোনো ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টই হোক অথবা শতকরা দুইভাগের কালুয়া-ধলুয়া, হাসেন-কাসেম টাইগার-ডাল-ই হোক। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতির সুতোর প্রান্তগুলি চলে যায় পর্দার আড়ালে সেই সব ঠেকেদের তর্জনী-ধর্জনীতে। ডুবে ডুবে জল পান করলে নাকি একাদশীর বাবাও টের পায় না — প্রবাদে বলে। নেতারা বিধবা নয়, একাদশী করার প্রশ্নই নেই। তাই বাবারা দূরের কথা পুত্রকন্যা অন্তরঙ্গ-প্রিয়জন সকলেই মুখে লেগে থাকা ভাতের-মধুর-চিনির ছাপছোপে জেনে যায় কে খেয়েছে এবং কতটা খেয়েছে। তাছাড়া শরীরস্বাস্থ্য কি লুকোবার জিনিস? চকমেলানো বাড়ি, চার চাকা গাড়ি, এয়ার-কুলার মিষ্ট করা অফিস, টাইলস বসানো বাথ, এ-সব আধুনিক চাকচিক্য দেখে জনগণ ধোঁকা খায় না। উচ্চতম নেতাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ধাপে ধাপে নিম্নতম ছাতা-নেতা-কর্মী পর্যন্ত এই সংগ্রহ প্রক্রিয়া সচল হয়ে ওঠে। নেতারা নৈতিক ক্ষমতা হারায়, অধস্তনরা প্রথা-সিদ্ধ বলে অবশিষ্ট বিবেককে বাক্স-প্যাঁটরায় বন্ধ করে ফেলে। ভাইরাস-জনিত রোগ যত দ্রুত ছড়াক, আক্রমণ যত গতিবানই হোক, এরা কেউই মনের সামাজিক দূষণের তুলনায় বড়ো নয়, দ্রুততর নয়। লুট করা কোনও সমাজের স্বাভাবিক ক্রিয়া নয়। কিন্তু কোথাও লুট-পাট চলছে এমন হলে প্রায় সকলেই লুটেরা হয়ে যায়। ব্যক্তি মানসিকতা সাময়িকভাবে গোষ্ঠী-গুপ্ত-মানসিকতার আড়ালে হারিয়ে যায়, বিবেকের — ব্যক্তি বিবেকের — দংশন বিঁধতে পারে না। 'লুঠ চলেছে, লুঠের বাহার, লুঠে নে রে তোরা'! এটাই তাৎক্ষণিক।

মাঝে মাঝেই দেখবেন নেতারা সঙ্গীসাথী সমভিব্যাহারে দৃপ্তপদে দোকানে বাজারে 'ঠক' বাছতে বেরিয়ে পড়েছে। চাল-তেল-নুনের ওজন এবং দাম তখন নেতাদের পীড়ন করছে। জনগণকে ঠকানো নৈতিক অপরাধ। আবার মাঝে মাঝেই শুনবেন কম্বু-কণ্ঠ ঘোষণা — বাজারে-হাটে, রাস্তা-ঘাটে, কাগজে-পত্রে — সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করতেই হবে, অপরাধীদের ক্ষমা নেই, মুনাফাবাজি বন্ধ করতে হবে, ঘুষ নেওয়া চলবে না। প্রথম প্রথম জনমন জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো, বিশ্বাস করে ফেলতো। বহুবার দেখে দেখে আর শুনে শুনে তাদের ভূয়োদর্শন ঘটেছে, সত্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে। জনগণ এখন আর তেমন কান দেয় না। মনে মনে জানে এসবই মুখোশ, এসবই নেতৃত্বের ফ্রন্ট-ফেস। এসবের আড়ালে অন্যতর কোনও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটি কি

তা নিয়ে মাথা ঘামায় না জনগণ। মাথা ঘামাবে লাভ নেই বলেই মাথা ঘামায় না। এমন হতে পারে যে জনগণের কোনো কারণে নতুন করে সততার ছাপ ফেলা দরকার হয়ে পড়েছে — সামনে ইলেকশন। হতে পারে বাজার দরের ঊর্ধ্বগতিতে বিব্রত হয়ে নেতারা তোলা-তোলনের আদায়কে বাড়িয়ে নিতে চায়। তাই চাপ সৃষ্টি করা, আড়ালকে বাঁকা করে কাজ হাসিলের মহড়া। অথবা অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুটি অবশ্যই নেতার বা দলের স্বার্থে, কিন্তু জনস্বার্থ ঘোষিত।

ফেলেদের কাজ সহজতর হয় যখন জল ঘোলা থাকে। মাছি-মিছে জানি না। তবে সঠিক জানিবেন যে ঘোলা-জলে মৎস্যশিকারী প্রবচনটি সমাজজীবনে প্রয়োগ করিলে নেতা প্রকৃতির জোট-শিকার পর্বটি সমধিক বোধগম্য হইবেক। উহার কারণ দুইটি : প্রথম কারণ ভোটারগণ মৎস্যসংগ্রহকারীদের মতোই নির্বোধ, ঝাঁকে-ঝাঁকে চলে অভ্যস্ত। এবং দ্বিতীয় কারণ 'চার' ফেলেরই খালাখালি বোধ হারিয়ে ফেলে। তাই কাজের সময় ভোটাররূপ কাতলাদের সামনে নানা প্রকারের খাদ্য ফেলা হয়, ছড়ান হয় — আদর্শের, পরিকল্পনার, মন্ত্র-তন্ত্রের, রাস্তানির্মাণ, ড্রেনসংস্কার, কুলকলেজ স্থাপন, পরিবার-বেকারী দূরীকরণ এবং ইত্যাদি। ভোটের কাজ শেষ হলে, ফুরোলে, সব ভোটাররাই প্রবাদের শেষ অংশের ভাগিদার হয়ে পড়ে। ভোটারদের এবং জনগণের এই পাত্রী-স্বভাব জানা থাকে বলেই নেতারা বছর বছর পাঁচবছর মধ্যবিত্ত জীবন ছেড়ে উচ্চবিত্ত জীবন যাপন করতে পারে। [এখন অবস্থা বাস্তবে অন্যরকম হয়ে গেছে, ফেলেদের সময় আগের মতো ভাল যাচ্ছে না! মাঝেমধ্যেই পাত্রীদের কাছে হাতজোড় করে কাতরা বলে হাজিরা দিতে হয়। মুখে টিকে স্বাদ ঘোলন করেই মিষ্টি কথা ছুঁড়ে দিতে হয়। খরচা উত্তম হবার আগেই আবার খরচান্ত হবার ডাক পড়ে। মধ্যবর্তী নির্বাচন এখন প্রায় নিয়মেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। খুবলে খুবলে এবং গোগ্রাসে খাবার খেতে গেলে নিজেদের মধ্যেই, নেতাদের মধ্যেই, খোয়াখোয়ী শুরু হয়ে যায়। তাই দোষ পাত্রীদের নয়, ফেলেদের।]

নেতারাই শিল্পী — জনমনের শিল্পী, দক্ষ কারিগর। ঐন্দ্রজালিক। কিন্তু শিল্পপতি ছাড়া তাদের এই জনপতি হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তের বিদূর উপাত্তনে ছোটখাটো নেতা হওয়া যায়, সামাজিক নেতা, জাতীয় নেতা, ধর্মীয় নেতা, রাষ্ট্রনীতির উচ্চস্তরের নেতা, রাষ্ট্রনেতা হওয়া সম্ভব নয়। ভারতে তো আর গ্রীক সিটি স্টেটের মতো ভোটার সংখ্যা নয়, জনসংখ্যাও নয়। তাই টাকা ছাড়া জল ঘোলা করতে, টাকা ছাড়া ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে, খই-এর মতো টাকা ছড়াতে ছড়াতে [illegible] উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাহাড়ের পরশীমে পৌঁছানো যায়। এই টাকা সংগ্রহই নেতাদের প্রধান কাজ। কে দেবে টাকা? কোথা পাব তারে?

ট্রেস্টেড এণ্ড ট্রাস্টেড পথই শ্রেষ্ঠ পথ। দেশের নব্বইভাগ জনগণই দরিদ্র। তারা টাকা [illegible] দেবে? — প্রশাসনের দীর্ঘ ইতিহাস চিৎকার করে ঘোষণা করবে : নব্বই ভাগ নয়, ঐ দশ ভাগ দেবে। পুলিশের এবরবা কিসে? ঐ দশভাগে নয়? চিচিং ফাঁক। পুলিশ তো শুধু অপরাধীর কাছ থেকে অন্যায় সংগ্রহের লাইসেন্স [illegible] কেষ্ট খায়। তারা ফেলেদাই শুধু নয় [illegible] পুলিশকে নিয়ে থাকে। তোষ ছড়ায়। দেবতা জানে পুজো দেয়। দিন মাস বছরের হিসেবে কারবার চলে। দিন মাস বছর ভাল যায়। এই দিত এণ্ড টেক অর্থনৈতিক সারভাইভালের মূল সূত্র। সুতরাং? সুতরাং হইবেক! জনপতি হতে গেলে শিল্পপতিকে লক্ষপতি-কোটিপতি হবার পথ প্রশস্ত করে দাও। দিবে আর নিবে-র — দিত এণ্ড টেকের — মহান পুরাণী সূত্রানুসারে অংশ সংগ্রহ কর। যদি প্রয়োজন এতে না মেটে তাহলে এই কয়েকটাকার সঙ্গে অবৈধ আন্তর্জাতিক কারবারীদের, গ্যাংস্টারদের সঙ্গে হাত মেলাও, তাতেও যদি টান পড়ে তাহলে অবৈধ দেশজ কারবারের দরবারে কড়া নাড়, যারা কৌকির কারবারী তাদের

ফাঁকির পথ প্রশস্ত করে দাও এবং সংগ্রহের ঝোলা ভরে নাও। পথের হদিশ একবার পেয়ে গেলে নতুন নতুন পথ আপনিই খুলে যায়।

খুলে যায়, প্রশস্ত হয় ঠিকই কিন্তু একটা প্রধান বাধা এসে যায়, পথকে দুর্গম করে তোলে। পরাধীন থাকার কালে রাজা ছিল, গণতন্ত্র ছিল না। সুতরাং ভোটপর্ব ছিল না। মধ্যবিত্ত নেতারা মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতেন, দেশের মঙ্গলের কথা ভাবতেন এবং প্রয়োজন হলে নিজের চিত্তকে রক্ষিত করতে উচ্চবিত্ত উপার্জনের নিশ্চিত ভোগ উপভোগের জীবনত্যাগ করে দাসবৎ জীবন যাপনে সানন্দে চলে আসতেন। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক ভারতে নেতার দরকার পড়ল। নেতাদের নেতা হয়ে উঠতে হল জনগণের ভোটে। অন্যদিকে দু'শো বছরের পুলিশী চরিত্র ইতিহাসের কোন পরিবর্তনেই স্বভাব পাল্টালো না। তারা মধ্যপূর্ব খেয়ে এবং খেয়ে, বেঁধে এবং সংগ্রহ করে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। সমাজের নব্বই-দশ শতাংশ অন্ধকারের সঙ্গে তারা মানিয়ে চলছিল, মানিয়েই চলল। প্রধান বাধাটা এলো এই এখান থেকেই। ওই দশ শতাংশের অপরাধ জগতে দুইদিক থেকে ভাঙা-বাঁটোয়ারার — ভিত এবং ছাঁকের — চাপ পড়তে লাগল। তারা শুনবে কেন? অপরাধ জগতেরও তো নীতি নিয়ম আছে, হিসেব-নিকেশ আছে, উচিত-অনুচিত আছে। অন্ধকার জগৎ তার অধিকার ছাড়বে না, পুলিশ তার সুযোগ—প্রথাসিদ্ধ, কনভেনশনাল সুযোগ ছাড়বে না, কিন্তু গণতন্ত্রের নেতাদেরও সেই একই এলাকায় সিঞ্চিং-প্লামবিং না করলে নেতৃত্বের পেট্রল-টাকা সংগ্রহ হবে না। শুরু হবে সুযোগের খেলা। পুলিশের মুখোশ কর্মচারী, পলকা। অপরাধজগতের কালুয়া-ধলুয়াদের মুখোশের বালাই নেই, শিল্পপতিদের মুখও না মুখোশও তাই — দুইটি প্রফিট বা লাভের ছবি ছকে পরিষ্কার আঁকা। একমাত্র বর্ণময় জনগ্রাহ্য মুখোশের অধিকারী রাজনীতির নেতারা। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের হাতে, দেশের মঙ্গলচিন্তা তাদের অন্তরের মণিকোঠায়, বিশাল জনগোষ্ঠীর তাদেরই প্রতিনিধি। সুতরাং? সব ছক নতুন করে সাজান হল, বহমান অর্থের প্রবাহে খাল কেটে কেটে নতুন এলাকায় সেচনের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল, নতুন নতুন প্রবাহের সন্ধান করা হল পারমিট-লাইসেন্স-টেন্ডার-রাজ কায়েম হল। কিক-বাক প্রথা চালু হল। এক কথায় প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী হয়ে দাঁড়াল। নব নব প্রয়োজন, তো নব নব আবিষ্কার।

পঞ্চম নয়, নেতারাই আজি খুলে দিল দ্বার। সেই দ্বার পথে নেতা-ব্রাতা—রিক্সিকের টাকার কথা ভাবুন — মন্ত্রী-সচিব, বড়বাবু-ছোটবাবু হয়ে ধাপে ধাপে টাকার পেট্রল প্রবাহ পেতে দেরি করলো না। ধাতস্থ হতে সময় নিল ঠিকই, বুঝে নিতে মাথা ঘামাতে হল নিশ্চয়ই, কিন্তু আবিষ্কারের জননী সর্বত্রই মাথা চাড়া দিয়ে দেখা দিল। মুখোশে মুখোশে ছেয়ে গেল সব মুখগুলো। সকলেই চেঁচাচ্ছে—করাপশনে দেশ বয়ে গেল; যারা করাপট তারাও বলছে আর যারা সুযোগ না পেয়ে নন-করাপট তারাও বলছে। প্রথম দল 'উত্তীয়কে' খুঁজছে, অনির্দেশ্য তর্জনী আন্দোলনকে ভুল দিকে দিকনির্দেশ করছে। দ্বিতীয় দল মন্ত্রণায় ছটফট করে অথবা ঈর্ষার জ্বলে জ্বলে মানসিক ডিজেল মেকানিজমে আড়াল খুঁজছে।

এটাই নেতার সপ্তম পাঠ — করাপশনের দায় যে জনগণের, জনগণের সহযোগিতাতেই যে করাপশন উচ্ছেদ সম্ভব তা সঠিক ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। চুরির অভিযোগের পিছনে উত্তীয়ই যে দায়ী তা উত্তীয়দের বুঝিয়ে দেওয়া। এটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই নির্বিঘ্নে শতকরা দশ অংশের পারিবারিক ভাগ্য অবিকৃত নিশ্চিত থাকতে পারে। শক্তির উৎস যখন জনগণ তখন করাপশনের উৎস কি অন্য কোথায়ও হতে পারে? একটা বালককে যা জানেবোঝে তাকেই ঘুলিয়ে দিয়ে

পাল্লাধার-টৈল-আর-টৈলাধার-পাত্র করে তোলা চটিজুতোখানি কাজ নয়, নেতাসুলভ কাজ বটে!

প্রশ্ন করতে পারেন : ব্যাপারসমাপার যখন এমন সর্বজনবিদিত, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ, তখন এই নব্বইভাগ জনগণ এই দশভাগ অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না কেন? উড়িয়ে ফেলছে না কেন? কারণ বিবিধ, ঘটনাগত এবং পরিকল্পনাগত। ঘটনাগতভাবে সুবিধাভোগীরা ইতিহাস- সংস্কার সমর্থিত, তারা এনটুনসত — মোটায় আড়ালপ্রাপ্ত — এবং সংবিধানসম্মত মুখোশের আড়ালে সুরক্ষিত— আইন আপনার হাতপা বেঁধে রাখবে, আর সেই আইন ওরাই তৈরি করবে। জনগণের মঙ্গলের জন্যে, সেবার প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু সেই ব্যবস্থায় কুরোক্রাটরা রক্ত আদি নোংরাগত ঘটাবে, পুলিশ লাঠিবন্দুক নিয়ে একদম চুয়াল্লিশ ধারায় আর কারফু-কবলিত করে আপনাদেরই পঙ্গু করে রাখবে। বিচারব্যবস্থা? কারে কয়? বিলম্বিত বিচার নাকি অবিচার ঘোষণা। তাহলে আমাদের দেশে প্রার্থী অবিচার পায়, অপরাধী বিচার পায় — বিচার পায় কারণ ঠাকুন্দা নালিশ দায়ের করলে নাতি অপেক্ষা করে থাকে বিচারের রায়ের বা সমাপ্তির। এই ত্রিবিধ ব্যবস্থাতেই শতসহস্র ভালচার্স অধ্যুষিত পথ পার হতে হয় — পিওন থেকে শুরু। কোনও কোনও স্থানে এলাকার বাইরে দালালরাও ভালচার্স বাহিনীর অঙ্গ বলে স্বীকৃত। রামা কৈবর্ত-হাসিম শেখের কথা ছেড়ে দিন, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত জনেদের কতোজন হাত পায়ের আইনের বেড়ি খুলে লাঠি বন্দুকের প্রশাসন তৎপরতা এড়িয়ে কালো কোটের পকেটমারা থেকে বেঁচে আর বার সংসার জীবনে ফিরে আসতে পারে? তাই দেখতে পাবেন অপরাধী ঘুরে বেড়ায় সমাজের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে অবলীলায়, আর বিচারপ্রার্থী নেতার দরবারে, থানার বেঞ্চিতে, কোর্টের চত্বরে আর কালো কোটের পিছনে চটির তলা খুইয়ে ফেলছে। বিচারের কুর্সিখানা লাল সালুর আড়ালে বকের নিশ্চেষ্টতায় ধ্যানমগ্ন। একটু এদিক ওদিক করলেই জেলখানা — ইদানিং আবার স্টেডিয়ামের গেট বন্ধ করে জেলখানা বানানোর প্রথা চালু হয়েছে আমাদের দেশে। দূরেই টিয়েনানমেনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবারে পরিকল্পনাগত কারণের কথা বলি। মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে ক্যাথারসিস, রাজনীতিতে তাকেই বলে জনরোষ নিরাপদ। সুষ্ঠু পরিকল্পনার দরকার। এখানে স্বপক্ষ বিপক্ষ নেই — সরকার পক্ষ-বিপক্ষের কথা বলছি। সকলেই একই প্রবাহে ভাসিয়া দিনু মনপ্রাণ—নৌকোড়ুবোই যা আলাদা আলাদা নামে দেহারায় পতাকায় সজ্জিত। সকলেই জানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। নেতা জনা নেতাকে নয়, জনগণকেও নয়। জনগণ বিক্ষুব্ধ ধিক্কারে সম্বোধন করে, বিশ্বাস তো দূরের কথা। আইন আর প্রশাসন বিভাগ যে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ তা অনেকদিনই জনগণের জানা, বিচার বিভাগ — একই জমিতে, একই জল হাওয়ায় জন্মমৃত্যু বলে — অফুরন্ত সম্মানের ইতিহাসের সমৃদ্ধ পাতেও পদ্ম-ঘুমিতে ডাকনের পথে। মাঝে মাঝেই তাই শুনতে পাবেন বিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবেগের পদ্মঘুমিতে ধসে যাওয়া পাড়ের সলিল সমাধি — অবসরগ্রহণের পূর্বরাত্রে বিচারক 'রায়' ঘোষণা ক'রে পরবর্তী কালে 'রায় বাহাদুর' হতে চাইছে — রাজপাল না হলেও নিদেন পক্ষে বিদেশ বিভুঁই-এ বাকি জীবনটা মৌতাত-লাভ খুঁজে নিতে। [-এই এলাকার সরণে চলনই প্রথাসিদ্ধ বিধি, তাই থেমে যাওয়াই, পলায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ, বাঁচার উপায়। এমনকি মার্জার পদক্ষেপেও রক্তক্ষরণের — কনটেমপ্টের — সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমানের জন্যে এবং সকলের জন্যেই, ইশারাই যথেষ্ট।]

ভূমিকা রেখে মূল কথাটায় ফিরে আসি, ক্যাথারসিসের কথায়। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে শতসহস্র প্রক্রিয়া পদ্ধতি আছে — মিটিং-মিছিল, ধ্বনি-ঘোষণা-স্লোগান, সম্মেলন মহাসম্মেলন, বাস-রোখ-ট্রেন-রোখ-পথ-অবরোধ, গেটবন্ধ-কারখানাবন্ধ-ভারত-বন্ধ, সভা-সমিতি-প্রতিবাদ, গণস্বাক্ষর-মেমোরেন্ডাম-গণদরখাস্ত, গণবিচার-গণধোলাই ইত্যাদি। এসবের মধ্যে অন্তত দুটি উদ্দেশ্য অবশ্যই কাজ করে। একটি প্রকাশিত বা ম্যানিফেস্ট উদ্দেশ্য অন্যটি গুপ্ত অপ্রকাশ-হৃদয়বেদী গূঢ়-গভীর। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উষ্মা-ক্ষোভ ক্রোধ-বিরক্তি প্রতিবাদ-বিরুদ্ধতাকে প্রকাশ করা অবশ্যই এসবের প্রকাশিত উদ্দেশ্য। নেতা হিসেবে নেতার আবশ্যিক কাজ। অ-ন্যায় আইনের বিরুদ্ধে, অ-যোগ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে এবং অ-বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনচেতনা সংগঠিত করা এবং প্রকাশ করা রাজনৈতিক ম্যানিফেস্ট উদ্দেশ্য। কামাও বটে। কিন্তু অন্যায়ের মাত্রা, অযোগ্যতার তীব্রতা এবং অবিচারের পরিমাণ জনমনে যে পরিমাণ বারুদের — একসপ্লোসিভের—সন্নিবেশ ঘটায় তার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুমান-নিরূপণ করে নেতাকে স্ফোভ-নির্বাপণে ব্রতী হতে হয় — ক্যাথারসিস ঘটাতে হয়, ডিমিউট করে বিস্ফোরণ থেকে বাঁচাতে হয়। নিজেদের বাঁচাতে হয়, পার্টিকে বাঁচাতে হয়, এবং যা চলছে তাকে চলতে দিতে গেলে জনচিত্তের রোষাগ্নিকে স্তিমিত করার, নির্বাপিত করার পথ খুঁজে নিতে হয়। ফোড়াকে অপারেশন করে জমে ওঠা পুঁজকে বাইরে বার করে দিতে হয়। এটাই মানসিক প্রেক্ষিতে, সামাজিক-রাজনৈতিক বাতাবরণে ক্যাথারসিস।

এই কাজে ক্লিনিক্যাল প্রিসিশন লাগে — বৈদ্যসুলভ নৈপুণ্য লাগে। এই লাগে বলেই তত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গে প্রয়োগপ্রত্ত কলাকৌশলের মেলবন্ধন অনিবার্য হয়। ইডিওলজির অস্পষ্ট কচকচির প্রেক্ষাপটে স্লোগানের ধ্বনি-ঘোষণার যোগ হলে তবেই অপারেশন সফল হতে পারে। ডাক্তারকে তাই তীব্র তীক্ষ্ণ হতে হয়, 'কাটি' হতে হয়, অনুসারী হতে হয়। মেটিরিয়াল-মেটাফোরিক্যাল, ডায়োলেক্ট-ডোলাইটিক ডিসপ্লান-ডলকানিক, ফায়ারি-মেটাল এবং ইমোটিভ-ডিভাস্টেটিং হতে হয়। কানে হাত ডোঙ্গ দাও উড়িয়ে দাও, ধ্বংস কর ধ্বংস কর, নিপাত যাক নিপাত যাক, এবং আরও। 'রক্ত' শব্দটা কতোভাবে ব্যবহার হয় তা একবার ভেবে দেখতে পারেন। উত্তেজনা প্রশমনের এ-সবই আনুষ্ঠানিক নিদান। প্রত্যক্ষ, রূঢ়, নির্দয় তাত্ত্বিক এবং আবেগসর্বস্ব। কেন? তাই বলি।

গণতন্ত্রে জনগণ বলতে বোঝায় নাগরিক এবং অনাগরিক। প্রথম দল রাষ্ট্র সংগঠনের সদস্য, নির্বাচনের অধিকারী, সংবিধানের এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস। কিন্তু নামেই তারা সর্বেসর্বা, যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রথম নাগরিক! জনগণ 'মজলা' রাষ্ট্রপতি নামে 'প্রজা'। ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাই তাদের সমান অধিকার — কোন অধিকারই নেই। দোহন পর্বে এবং সেবন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত নেতারা একজন্য। অন্তকরণে সারমেয় স্বভাব না হলে পাঁচ বছর অবাধ এবং নির্বাঢ়, নিশ্চিন্ত এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু ঐ জনগণ? ওদের যে পেট আছে এবং তাতে ক্ষুধা জন্ম নেয়, ওদের চেতনা আছে এবং সেখানে জ্বালা ধরে, ওদের মন আছে যাতে বঞ্চনাবোধ দানা বেঁধে রোষের উর্ধ্বচাপ তৈরি হয়? তাই নেতারা নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত হতে, ভোগ-উপভোগের সাম্রাজ্যে স্থিত-স্থির থাকতে একদিকে ভোগায়তনের ইন্দ্রিয়তপনকে সুরক্ষিত করতে থাকে, অন্যদিকে জনগণের পেট-চেতনা-মনের অন্তরালে জমে ওঠা ক্ষুধা-জ্বালা-বঞ্চনাকে পথভ্রষ্ট কায়ারটিক প্রক্রিয়ায় নির্বাপিত করার নিতানতুন পথ খোঁজে।

নাগরিক মানে তো সিটিজেন? সত্যপথে কেন প্রতিবাদ সম্ভব নয়? জনগণের সব নাগরিক অনুরোধ অভিযোগের প্রতি মনোযোগ থাকলেই সহজ-স্বাভাবিক সমাধান পাওয়া যায়। কিন্তু মনোযোগ যদি অন্য কোন দিকে, অন্য কোন ভোগের প্রতি নিবিষ্ট থাকে তাহলে? দৈনন্দিন জীবন থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মাতা এবং সন্তান। মায়ের মন পড়ে আছে গল্পের টানে পড়শীর দিকে, অথবা চিঠির বন্ধন-রাজেশ-উত্তমের দিকে, অথবা অন্য কোনও কোলে। সন্তান মায়ের মনোযোগ চাইছে। কণ্ঠের সম্বোধনে, আঁচলের আকর্ষণে অথবা ছোট ছোট হাতের মৃদু-মিষ্টি স্পর্শে। কিন্তু মায়ের মন উপভোগের বৃত্ত থেকে সন্তানের কোলের চিত্রে সরে আসতে পারছে না। এবারে? সন্তান ধাপে ধাপে উচ্চগ্রামে চড়াবে তার দাবিকে, এবং শেষ পর্যন্ত হিস্টিরিয়া পর্যায়ে পৌঁছে যায় না? মাতা-সন্তানের ব্যক্তি-সম্পর্কে যা ঘটে ও পরিমাণে সবিশেষ, নেতাসেবক-জনগণ সম্পর্কের বেলায় সেই প্রতিক্রিয়াই অনাদর চেহারা নেবে, নির্বিশেষ হয়ে উঠবে, গ্রুপ-মনোভাবের টানাপোড়েনে সেই রূপ পরিমাণে ঘটে যাবে আমূল পরিবর্তন। সন্তানের বেলায় মা পা-লাগান, জনগণের বেলায় তাই হবে পাড়া লাগান প্রতিক্রিয়া। ভাঙচুর, লুটতরাজ, আগুন-লাগা এবং ইত্যাদি। এতো আমাদের জানা-চেনা এবং খবরে দেখা নিত্য-নৈমিত্তিক। নয় কি?

নেতা হবার সময় নেতাদের দৃষ্টি থাকে জনগণের দিকে। মন থাকে নাগরিকদের ভোটের দিকে। নেতা হবার পরে সেই দৃষ্টি সরে যায় ভোগের দিকে, আরামের দিকে আর মন ছোটে শহরের দিকে। কলকাতা-দিল্লি-ইউরোপ-আমেরিকার সম্পন্ন জীবনযাপনের হাতছানিতে ভরপুর উজ্জ্বলতার দিকে। মধ্যবর্তী নেতাদের ঘাড়ে চাপে জনগণকে সামলানোর দায়। তারা ভবিষ্যতের ছবি আঁকে বর্তমানের কণ্ঠে, কল্পনার ফেউস সাজায় স্লোগানের সন্নিবেশে, নেতৃত্বের আসন পাতে উচ্ছৃঙ্খলার তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ উত্তাল মনের অনুভবে। জনসমুদ্রের ঢেউ শান্ত হয়, রোষ-ক্ষোভ-বিরক্তির পুঞ্জ বেরিয়ে গিয়ে জনচিত্তে স্বাস্থ্য ফিরে আসে। তাদের খাওয়ার ঘরে খুনা মোষ হয়। নেতার-হবু-নেতার পুর-অধপুর ঘরে অর্জিত পূর্বাঙ্কিত সংখ্যার পাশে আরও সংযুক্তের সংখ্যা বসে। চলছে, চলবে।

ক্যাথারসিস যেমন জনমনের ইকুইলিব্রিয়াম ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া তেমনি আছে ডাইভারশান। ডাইভারশন জনচিত্তকে বিপথগামী করার পদ্ধতি। উত্তীয়কে ধরে আনা, দুর্জনলালকে হাজতে পোরা (যেখানে মদনলালকে বেঁধে আনার কথা) অথবা এনকোয়ারি কমিটি-কমিশন বসিয়ে দেওয়া (কারণ বামকেও যা জানে সেই সত্যকে ধামাচাপা দেবার জন্যে যে সময় এবং আবরণ দরকার তা এই পথেই সহজলভ্য হয়ে ওঠে)। ট্রেন মোটর জনো স্টেশন মাস্টারকে পীড়ন করা, লাইন উপড়ে ফেলা, ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া (যাকে পীড়ন করলে সত্যবাদী সুরাহার পথ খুলে যায়, তাকে পীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে মুক্তির শ্বাস নিতে সাহায্য করা)। উদাহরণ বিস্ফোরকের আকার নেবে — সকলেরই জানা। জনমন আবেগ প্রবণ তাৎক্ষণিক যৌক্তিকতার কারণে রক্তচাপের ঊর্ধ্বগতিতে তীব্র তীক্ষ্ণ। তাই তাকে ডাইরেকট করা যেমন সহজ, ডাইভারট করাও তেমনি সোজা। যারা ডাইরেকট করতে চেষ্টা করেন তাঁরা জননেতা, জনগণের মনের প্রতিনায়ক হতে পারেন, হয়েও যান। যারা সেই যোগ্যতার অধিকারী নয়, দলের নেতা, নেতামন্ত্রী নেতা তারা ডাইরেকট করে বিপদ ডেকে আনতে চায় না, ডাইভারট করে এক ঢিলে দুই বা আরও অধিক পাখি মারে: নিজের আসন পাকা-তর করা, সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, কর্মকর্তাদের নাকাল, সংগ্রহ ক্ষোভকে সুযোগ দেওয়া, গোপন হিংসা-প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করা, ঊর্ধ্বতন নেতাকে তুষ্ট করা, এবং আরও।

(৬) গণ মাধ্যমের নন্দনকাননে :

সব থেকে সমগ্রগামী ডাইভারশন কোনটি তা বলা মুশকিল — মোচা-মিছিল না ধর্মীয় ভিগির না সিনেমা-ছিশিম-ছিশিম তা স্থান কাল ও প্রয়োজনের বিচার্য বিষয়। সদ্যৎসরের ধীর-স্থির — স্লো বাট সিওর — পদ্ধতি হিসেবে সিনেমার তুলনা নেই। অন্য কারণেও সিনেমা মাধ্যমটি অনুসরণীয়। কচিকাঁচা অবস্থায় কিশোর তরুণদের জানে আইকানো যায়, পপুলেশন একসপ্লোশনের কারণে উঠতি বয়সের একটা বিরাট অংশকে চারদেয়ালের মধ্যে পেয়ে ক্যাথারটিক অপারেশন সহজ হয়ে যায়। প্রতিনিয়তের দেখা-শোনা জানা-চেনা জগতের বিরুদ্ধে ওদের ক্রমশ জমে ওঠা ধিক্কারকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগ্রত চেতনায় ডাইভার্ট করা যায়। যৌন চেতনার এনেস্থেটিকস দিয়ে, নেশাগ্রস্ত টোপ ফেলে এই কাচ দেয় ইয়াং দের মনের রাগ-দ্বেষ-ক্ষোভকে — ফোঁড়া থেকে পুঁজ বার করে দেবার মতো — বার করে দেওয়া যায়। জীন-লীন পারিবারিক জীবন, লীন-কাতর সমাজজীবন, বিমর্ষ-অবসন্ন ভবিষ্যৎ জীবন — কিশোর তরুণ যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ তাই ছুটে যায় নিজ নিজ যৌন-সুন্দর দেব-দেবীর কাছে, অবগাহন করে ডিয়েসস-মেকানিজম সঙ্গাত আইডোলাইজেশন, আইডেন্টিফিকেশনে। তখন এইসব স্বেচ্ছায় ছুটে আসা ড্রাগ-এডিকটদের মনের গভীরে অপারেশন চলতে থাকে। পুঁজ নিষ্কাশনের অপারেশন, জমে-থাকা জমে ওঠা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উৎপাটন অপারেশন।

সিনেমা জগৎ দেয় আনন্দ, পায় অঢেল টাকা। সুনাম-দুর্নাম সম্পর্কহীন নিঃস্বতা ভেসে ওঠা ডুবে যাওয়া যে কোনও ব্যবসায়ের মতো সামগ্রিক ভাবে কিন্তু সিনেমা জগৎ নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। রাজনীতির নেতারা যে এই শিল্পমাধ্যমকে কতোখানি আপন বলে ভাবে তার নমুনা এখন লোকসভা-বিধানসভার দিকে তাকালেই পাওয়া যাবে। একাধারে ক্যাথারসিস, ডাইভারশন এবং কারিসমেটিক নেতা-সংগ্রহে যে একক ক্ষেত্র দিতে পারে তার দাম অসীম।

ধর্মের কথা আগেই বলেছি। ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে জনগোষ্ঠীর ভিগির করে তুললে জনরোষের প্রশমন যেমন ঘটে তেমনি রাজনীতির সমস্যাকে ডাইভার্ট করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায় — উপসর্গের মতো কাজ দেয়। যেমন ঘটে 'ধাতু' বা ক্রিয়া পদের পূর্বে উপসর্গ যোগ হলে, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধর্ম উপসর্গের ভূমিকা বহুপ্রমাণিত পদ্ধতি। ধর্মের ভিগির জনগণকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ করে তোলে, গাঢ়-গভীর তাৎক্ষণিক উদ্দীপনায় রাসায়নিক শক্তিকে অকুতোভয় এবং অসীম বলশালী করে তোলে, ভালমন্দ বোধের বিচারবিবেচনায় অক্ষম-জান্তব করে ফেলে। তাই নেতার কাজ সহজ হয়, অপরাধপ্রবণ মনগুলো নির্বাধ-নিশ্চিন্ত কাজ করার সুযোগ পায়। রাজনীতির নেতাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। এবং একটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠীর নানা প্রয়োজনে 'নেতৃত্ব' দেবার 'মহান' সুযোগ হাতে আসে। একি কম কথা! নিঃস্ব রিক্ত জনসাধারণ তখন এইসব নেতাদের দেবদূত বলে মনে করে, মানা করে। কারণ পর্দার আড়ালে ওদের আঙুলগুলো চোখে পড়ে নি তখন, ওদের সুনিপুণ পরিকল্পনার বিশ্ববিসর্গও এই নির্বোধ জনগণের মনে ছাপ ফেলে নি। শতকরা দশ শতাংশের কিছু নেতা, কিছু মন্ত্রীমন্ত্রী — ইনসট্রুমেন্টস — অপরাধপ্রবণ বা বুরন-ক্রিমিনাল। এরা সকলে মিলে নব্বই শতাংশের দফা রফা করে চলেছে।

যে মসৃণ থানার আড়ালে এই 'সুমহান' কাজটি সম্ভব হচ্ছে সেটির নাম গণতন্ত্র। যে মন্ত্রে এই কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে তার নাম ত্রি-মন্ত্র — আইন শাসন আর বিচার বিভাগের ত্রি-মন্ত্র। এই মন্ত্রের উৎস সংবিধান।

মনে হতে পারে আমার প্রতিবাদ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে অথবা রাষ্ট্রকর্মের ত্রিতন্ত্র বিভাগের বিরুদ্ধে। তা নয়। নীতির বিরুদ্ধে নয়। এরা স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ-সম্ভব নীতি। প্রতিবাদ প্রথাপ্রকরণ — রুলস অব এপ্লিকেশনের বিরুদ্ধে। এবং অবশ্যই প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে। নীতিকে যতো সরল করেই প্রকাশ করা হোক, প্রথা প্রকরণসমূহকে — রুলস অব দি গেমস কে — যতো ঔদাসীন্যেই নিষ্ক্রিয়ই করা হোক না কেন সেই নীতি যারা অনুসরণ করবে, সেই আইন যারা প্রয়োগ করবে তারা যদি স্বার্থান্বেষী হয়, অনাচার-মতলবী হয় তাহলে সেই নীতির মাহাত্ম নষ্ট হতে বাধ্য, সেই নিয়মের ভরাডুবি ঘটতে বাধ্য। তাই চলেছে, হচ্ছে এবং যতদূর দেখা যায় হতেই থাকবে। এটাই বলতে চাই।

মুখোশের কথা থেকে কথায় কথায় ক্যাথারসিস আর ডাইভারশনের কথা এসেছিল। আবার ডাইভারশনের কথায় রাজনীতির মোচা মিছিল, ধর্মের ভিড়ির, সিনেমার ছিপিন-ছিপিন এসে পড়েছিল। খবরের কাগজ, রিপোর্টার, এডিটরদের কথা না বললে ওদের মধ্যে যারা দম আটকে মারা যাচ্ছে এবং নানাপন্থা সেই মৃতপ্রায় জীবনটি যাপন করে চলেছে তারা অনুযোগ করতে পারে। খবরের মাধ্যম বলতে অবশ্য শুধুই পত্র-পত্রিকা বোঝায় না, রেডিও টেলিভিশন অসীম ক্ষমতাধর বলে প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত — না হলে সরকার অর্থাৎ নেতাদের নেতারা কেন তা হাতছাড়া করতে চায় না?

খবরের মাধ্যমগুলোই মুখোশধারী। শুভ্রমুখগুলো কতিপয়ের জানা, প্রকাশিত মুখগুলো সকলের সামনে মেলে ধরা। চাকের বাদ্যির মতো একটা সঙ্গত প্রকাশিত মুখটির সঙ্গে সঙ্গে বেজে চলেছে — ব্যবসায়িক স্বার্থ, অন্য একটা ধ্বনি ঢেকার চাটির মতো ঝংকার তুলে চলেছে — জনস্বার্থ। নেতারা অক্ষরমহলে এই মাধ্যমের শুভ্র উদ্দেশ্যের আঘাতে বিব্রত হয়ে চলেছে — আমায় ভাসাইলিরে আমায় ডুবাইলিরে — আর বাহির মহলে তীব্র প্রতিবাদে মাধ্যমের মুণ্ডপাত করে চলেছে। নেতাদের পিয়ারের কাগজ আছে, কাগজের আছে পিয়ারের নেতা। সোনায় সোহাগা, ধুম পরিমাণ। কিন্তু অন্যে পরে লাঠি বাজে! হুড়োহুড়ি, হুলোহুলি যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সংগ্রাম। উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, নাভিশ্বাস ওঠে। আর জনগণ খড়ের গাদায় খবরের সত্য খুঁজে মরে।

সত্য খবর? খবরের সত্যাসত্য আছে নাকি? খবর প্রাসঙ্গিক হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয় — সত্য হয় কি? সত্য বলে আসলে কোন এ্যাবসলিউট সত্য যখন নেই, রিয়েল সত্য বলে যখন কোন কথা হতে পারে না, তখন সত্য আমরা খবরের মাধ্যমে জানতে চাই? ভূতনাথ দারোগার কথা না হয় বাদই দিলাম, দর্শনে বিজ্ঞানে যে সত্যের অন্বেষণ অনুসন্ধান চলে সেখানেও তো কোনো চিরসত্যের — এ্যাবসলিউট ট্রুথের দেখা মেলে না (দর্শন) কথা ওঠে না (বিজ্ঞান)। ট্রুথ একমাত্র রেলিভ্যান্ট, প্রাসঙ্গিক। [এখানে তর্ক উঠবে জানি, প্রতিবাদে কণ্ঠ-গভীরতা ধ্বনিত হবে তাও জানি। মীমাংসা হবে না, তর্ক চলতেই থাকবে। কারণ তর্কটাই প্রাসঙ্গিক, রিলেটিভ বা আপেক্ষিক — তর্ক মানে যুক্তি বা রিজনিং। প্রমাণ হয়ে যাবে যে যুক্তিও এ্যাবসলিউট নয়।]

খবর প্রাসঙ্গিক। সেই খবরেই ফিরে আসা যাক। খবর কার জন্যে প্রাসঙ্গিক হবার কথা? পাঠকের জন্যে তো? কিন্তু কে ঠিক করে দিচ্ছে কোন খবর প্রাসঙ্গিক আর কোন খবর অপ্রাসঙ্গিক? এডিটর। কোন নীতিতে সে এই কাজটা করে? মালিকের ঘোষিত এবং অঘোষিত নীতিতে। তাহলে? কাগজের খাতায় ধরে বিশ্বের সাজানো খবরের খাবার যারা পরিবেশন করে তারা আমাদের মতো গাদিবদ্ধ পাঠককে গিলিয়ে দেয় তাদেরই পছন্দের খবর।

খবরের যে কোন মাধ্যমই এবং সকল মাধ্যমই খবর গোপন করার হাতিয়ার, প্রয়োজন অনুযায়ী 'সত্য' পরিবেশনের মাধ্যম, যা যা নেতার স্বার্থে প্রয়োজন, মালিকের স্বার্থে প্রয়োজন এবং প্রতিপক্ষকে বিব্রত শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজন তাকেই 'প্রয়োজন' বলা হবে। সব বিবরণই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। প্রত্যক্ষ সত্য দেয় সুতরাং সব প্রত্যক্ষই সত্যের বিবরণ। এবারে দেখুন প্রত্যক্ষ কি অসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে — এবং অবশ্যই রিপোর্টারকে এবং কাগজের সম্পাদককে সাহায্য করতে পারে। সত্য বা ঘটনার সর্বদেহে বিচিত্র মুখোশ আঁটা আছে। আপনি যা দেখবেন, আপনাকে যা দেখান হবে তাই সত্য, তাই ঘটনা বলে প্রতিভাত হবে। কেমন করে? প্রথম কারণ সব প্রত্যক্ষই আংশিক, সুতরাং অসম্পূর্ণ। তাকে সম্পূর্ণ করতে আপনার কল্পনাকে অথবা অনুমানকে কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যক্ষে বস্তুর-দৃশ্যের শব্দের স্পর্শের ইত্যাদির একদিক, এক অংশ চোখে-কানে-ছোঁয়ায় পাওয়া যায় অন্য অংশ নয়। দ্বিতীয় কারণ পারস্পেকটিভ, তৃতীয় কারণ প্রত্যক্ষকারীর মানসিকতা প্রবণতা ইত্যাদি। চতুর্থ কারণ পরিস্থিতি-পরিবেশ আলো-আঁধার নৈকট্য দূরত্ব ইত্যাদি। আরও আছে। জটিলতা এড়াতে চাই। প্রত্যক্ষের এই বিচিত্র প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানোর মাধ্যমই 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' এবং 'সত্য' উদ্ঘাটন।

প্রত্যহদিন সকালে বিকেলে, সন্ধ্যায় রাত্রে খবরের মাধ্যমগুলো তাই খবরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লাগাতে পারে, জনগণকে মনোজ্ঞ পরিচালিত করতে পারে। করেও তাই। প্রত্যাশিত খবরকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া — ব্ল্যাক আউট করা, ডিস-ইনফরমেশন, মিস-ইনফরমেশন, ম্যাস-ইনফরমেশন — যেমন খুশি তেমন সাজান যায়। সরকারি দপ্তরের মার্ক হেড যেমন সত্যেরই জয়তে, খবরের বেলাতেও তেমনি প্রত্যক্ষ সত্যের উদ্ঘাটনই আদর্শ। সেখানেও যেমন সত্যের জয়, চিরায়ত হয়ে ঝুলে আছে দেয়ালে দেয়ালে, সব মাধ্যমগুলোর পিছনে পিছনে, কিন্তু দেয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে সরকারের কাজেকর্মে, জনগণের জীবনে-প্রয়োজনে প্রবাহ পাচ্ছে না, এখানেও তেমনি সিলেকটিভ সেনসরের বৌদ্ধিক দংশনে-পেষণে শ্রোতা-পাঠক-দর্শকের মনে পৌঁছাচ্ছে না। দেয়ালে ঝুলমান ঘোষণাতে আর খবর-মাধ্যমগুলোর মার্ক হেডে মুখোশ হয়ে পূজা স্বীকৃতিতে দিনদিন ধূপ ধুনো পেয়ে চলেছে — অনেকটাই অসাধু ব্যবসায়ীর প্রাতঃকালীন জবা-ফুল প্রণামটির মতো এককালীন, তাৎক্ষণিক বিবেক-প্রক্ষালক এবং দিনান্ত বিস্মরণযোগ্য প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠানের মতো।

খবর মাধ্যমগুলোর ঘোষিত উদ্দেশ্য জনগণকে সচেতন করে তোলা, শিক্ষিত করে তোলা এবং ঘটমান বর্তমানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। অঘোষিত সুপ্ত উদ্দেশ্য বহুবিধ। অধিকন্তু যেটা সেটা ব্যবসায়িক — লাভের অংশ বাড়িয়ে তোলা। বাকি সবই রাজনীতির নেতাদের বেলায় যেমন এখানেও তেমন। এখানেও তাই নেতার পিছনে মই ধরা, প্রতিপক্ষকে — স্বজাতীয় বিজাতীয় বাদবিচারহীন প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা, শায়েস্তা করা, ইত্যাদি আছে। আছে

কাল্পনিকপ্রক্রিয়া, ডাইভারশন পদ্ধতি। খবরের মাধ্যমে সুড়সুড়ি দেওয়া, উকনুনবাল খবরের চাটনি আচার পরিবেশন এবং অবশেষে ছিষ্টি-মোষ্টা মৌনতা, কমবেশি ক্ষমতাল ইতরদের 'খারনিপত' উপস্থাপনা। পাঠকগোষ্ঠীকে তৈরি করা, নেশাগ্রস্ত করা এবং সমরনমতো তাদের মনে বিশ্বাসের বীজ বপন করা। এই বিশ্বাস অবশ্যই কোনো বিশেষ নীতির প্রতি, নেতার প্রতি, পণ্যের প্রতি, এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের প্রতি। প্রসেস গ্লো, কিন্তু প্রনিবাম, স্টেটি এন্ড সিওর।

অর্থ অনর্থের মূল। রাজনীতিরও মূল। তাই বলে রাজনীতিকে যেন অনর্থ বলে ভুল করবেন না। বিশেষ করে আজকের দিনে যখন তা ক্ষমের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত প্রসার লাভ করে কিন্ডারগার্টেন স্তর পর্যন্ত ছোঁয়ার জন্যে উদগ্রীব।

এই অর্থের মজাটা একবার দেখুন। অর্থ তৈরি হয় সরকারী মিন্টে, উৎপাদিত হয় জমে কারখানা মাঠে, কলকারখানায় শ্রমে, আর কৃষিজাত হয় সিন্দুকে-ব্যাঙ্কে-ব্যাঙ্কে। অর্থ তৈরির প্রক্রিয়ায় মাত্রা নিয়ন্ত্রণ আর উৎপাদনে মাত্রা বৃদ্ধি তাতা রোটি-কাপড়-মকানের যোগান-অর্থ সীমার নিচে জীবন কাটায়। 'চতুরাশ্রম' শিল্প প্রধান — স্পাড, সেবার, ক্যাপিটাল অরগানাইজেশন-রূপ আশ্রম প্রধান — উদ্বৃত্ত অর্থ সভ্যতার উষাকাল থেকেই শক্তিধরের হাতে শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে। জল নিম্নমুখী, কিন্তু অর্থ ঊর্ধ্বমুখী। অর্থবিজ্ঞানে রেস্ট নিড্স টু রেস্ট, মোর নিড্স টু মোর। যাদের কম আছে তাদের কমতেই থাকে, অথচ যাদের আছে ভূরি ভূরি তাদেরই বাড়ে ভুঁড়ি। সিন্দুক সিন্দুকের জন্য দেয়। সুতরাং ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইকনমিকেই বাড়িয়ে তোলে, ক্ষমতার পরিমাণ বাড়ে, মুনাফা অধিক মুনাফার পথ প্রশস্ত করে আর ডাইভারসিফিকেশন এবং আরও ডাইভারসিফিকেশন।

জলের নিম্নগতিকে রোধ করে, বাঁধনে বেঁধে বাঁধ দিয়ে সেই জলসম্পদকে সেচনের কাজে লাগান হয়। অর্থের ঊর্ধ্বগতিকে বাঁধ দেওয়া গেলেও তা শিল্পপতি এবং জন-পতিদের স্বার্থের অনুকূল নয় — শিল্পপতিদের নয় কারণ তাতে তাদের ইনসেনটিভ-ডুইড কমে যাবে, জন-পতিদের নয়, কারণ বৃহৎ গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একাধিক সিন্দুকের প্রয়োজন পড়ে যে! তাই প্রথম পতিদের মাধ্যমে সিন্দুক-সংগ্রহের সুযোগ দিলেই প্রয়োজনমতো তার থেকে দু'চারটি দ্বিতীয় পতির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সেই গিভ এন্ড টেকের—দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবের — রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ। এই দ্বৈত-পতি-ব্যবস্থায় ভারতের জনসাধারণ প্রেক্ষিতে, সিন্দুকের রঙও দ্বিবিধ সাদা আর কালো। (অবশ্য এই কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবই — সব অর্থই সমান রক্তপ্রবাহ সমৃদ্ধকারী!) এই দ্বিপতি ব্যবস্থায় নেতা দেবে জনসমর্থন আর শিল্পপতি দেবে নেতাকে সেই জনসমর্থন ক্রয় করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান। একটা সারকুলার সাইফোন সিস্টেম যেখানে অর্থের ভিউবাটি এই দ্বিপতিত্বে বৃত্তাকারে ঘুরপাক খাবে।

মাঝে মাঝে যে কাড়িয়া-ক্ষমতাল খবরের কাগজে দেখতে পাবেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও কারণ আমাদের নেই। সেই দুই শতাংশ দশ শতাংশের 'উচ্চবৃত্ত' জীবনে আমাদের মতো — মরশুমীদের মতো — কামড়াকামড়ি না থাকলেও আমীর-লালা-আপ্পাদের মতো উত্থান-পতন আছে, এতনো পেছনো আছে ঘমর-অনাঘর আছে। তাই কখনও অর্থশক্তির সঙ্গে অর্থশক্তির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ লেগে যায়। ব্যবসা দখলের লড়াই। কখনও নেতাশক্তির সঙ্গে নেতাশক্তির চাপ-জব-ওয়ার চলে — ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগে যায়। সেই সব সময়ে জনগণকে প্রত্যেকেই 'সত্য' বিবরণ দিতে থাকে,

'প্রতিদ্বন্দ্ব' ঘটনার উদ্ঘাটন ঘটাতে থাকে। মরশুমীর জনগণ হমড়ি খেয়ে খবর খোঁজে। ওদের মিটে গেলে আমাদেরও আর প্রয়োজন থাকে না। ওদের মুখে আমরা উলুখাগড়া, ওরা নেতা হয়, নেতা থাকে, আমরা নীত হই, বিনীত-বশংবদ থাকাই আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

আর জনগণ হিসেবে গণতন্ত্রে আমাদের কাজ? মাঝে মাঝে ওদের দেওয়া সময়ে স্থানে এবং নামে একবার একবার ছাপ মেরে নেতা বানিয়ে দেওয়া। সেই ছাপটা যে আমাদের হাতেই মারা হবে তার কোনও স্থিরতা নেই — জনগণকে সবসময়ে বিশ্বাস করা যায় কি? — তাই আমাদের নাম করে সেই ছাপটাও ওরা নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে ফেলবে (সৌজন্যে, নলিনী সিং)।

(৭) মুখোশের আমি ও আমার মুখোশ :

নিজেকে জানতে বেরিয়েছিলাম। নো দাইসেলফ্। কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের নিজেটাকে খুঁজতে খুঁজতে কোথা থেকে কোথায় এসে গেলাম। শৈশব থেকে শুরু করে সময় ভেদে কাল ভেদে নিজেকে খুঁজলাম। সংসার পরিবারে দেখতে চাইলাম। শিক্ষা-সমাজ-সভ্যতার আলো ফেলে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পেলাম কি? আমাদের প্রত্যেকের নিজেটা — নিজগুলোই তো নানাভাবে চারদিকে, কাজে কর্মে অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে আছে। এই বিন্দুর মধ্যেই, এই বিচিত্র-বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যেই কি আমি বা আমাদের নিজ নিজ নিজত্বটা ধরা আছে, জড়িয়ে ছড়িয়ে আছে? তাহলে জানব কাকে, কোন প্রকাশটাকে কোন আবরণ খোসাটাকে? অন্তর্নিহিত একক কোন স্থির শাশ্বত আমি কি আছে? থাকতে পারে? সবই যদি পরিবর্তনশীল, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পল বিপল অনুপল জীবন যদি কোথাও দুদণ্ড স্থির-অবিচল-অপরিবর্তনীয় না থাকে তাহলে তো অন্বেষণটাই অকারণ হয়ে যায় — যা নেই তার অন্বেষণ হয়ে দাঁড়ায়। অথবা বলতে হয় যে এ দীপ শিখাটাই তুমি — পরিবর্তনশীল কিন্তু ক্ষণিক নয়, অ-নিত্য কিন্তু নিতি নব প্রবহমান। যেমন নদী। প্রবাহটাই নদী, যদিও একই জলে দু'বার হাত দেওয়া যায় না। কোনো জলই স্থির দাঁড়িয়ে নেই কিন্তু সব মিলে নদী বয়ে চলেছে।

আমরা কেউই নিজের নিজের মুখ দেখতে পাই না। মুখোশটাই আয়নায় ধরা পড়ে — দেয়ালের আয়নায়, মনের আয়নায়। অপরের মনের দর্পণে, নিজের মনের দর্পণে। তার মধ্যেই আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন আমি হয়ে ধরা পড়ি, তুমি হয়ে প্রকাশ পাই। নদীর মতো বয়ে চলি, প্রদীপের মতো জ্বলে জ্বলে একদিন নিবে যাই। কিন্তু সংখ্যাকই নদী হয়ে বয়ে চলি, অধিকাংশই নিবে যাই। খুঁজব কাকে? মন কই, মুখ কোথায়? মুখোশটাকেই তো বয়ে চলি।

অথবা এমন কি হতে পারে না যে প্রশ্নটাই এমন যে দেখে মনে হয় সঠিক আসলে বেঠিক, ভুল? একটা ভুল প্রশ্নের ভুলভুলাইয়াতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছি সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই। যেমন সত্য, যেমন ঈশ্বর, ঠিক তেমনি আত্মা-আমি-নিজ, নো দাইসেলফ্?

দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রশ্নটার স্বরূপ দার্শনিকদের বিচার্য থাক। আমরা দৈনন্দিন-সামাজিক নিত্য-সাংসারিক এবং নৈর্ব্যক্তিক-রাজনৈতিক বাস্তবরূপে সুপ্ত আমি প্রকাশিত আমি, অভিপ্রায়ের আমি আর উদ্দেশ্যের আমির মধ্যে অত্যন্ত বাস্তব প্রভেদ বিভেদ দেখে দেখে জেনে গেছি যে প্রশ্নটা ভুল নয় অনিবার্য ঘটনা। পেঁয়াজের খোসা, মুখোশের ক্রম-অন্বয় প্রকাশ। ভেদ ক'রে, মুখোশের পিছনের

ব্যক্তিকে খুঁজতে গিয়ে আর একটি মুখোশের সামনেই থমকে দাঁড়াতে হয়। খোঁজটা মিথ্যে নয়, প্রাপ্তিটা সব সময়েই একটা ধাঁধা, একটা আড়াল, একটা — আর একটা মুখোশ।

অনুসিদ্ধান্ত

দীর্ঘ-আলোচনার শেষে আমরা কোনও গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম কি? মুখোশ অনিবার্য দেখা গেল, আবশ্যিক বলে দাবি জানাল। প্রাণিজগতের পটভূমি ছেড়ে, শৈশবের প্রকৃতি নির্ধারিত জীবনটুকু পার হয়েই মুখোশের দেখা পাওয়া গেল — মুখোশ ব্যবহারের। আবার প্রকৃতির অস্বীকারেই যদি সভ্যতা হয়, সভ্য হতে গেলেই যদি জৈবক্ষুধা আর যৌন আক্রমণ থেকে মানুষকে প্রথাসিদ্ধ আহার আর সমাজ সিদ্ধ বিহারে সামিল হতে হয়, তাহলেও মুখোশকে আবশ্যিক হতে হয়। এরকম একটা সিদ্ধান্তে মন সায় দিতে চায় না। মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। মুখোশ মানেই তো ধোঁকা দেওয়া। মানুষ সম্পর্কে এমন একটা কথা সঠিক হতে পারে না, সত্য হতে পারে না। তাহলে?

এই তাহলের উত্তর খুঁজতেই আবরণ-আভরণ ভূষণ-আচ্ছাদন মুখোশ [মুখ-কোশ] ছদ্মবেশ শব্দগুলো তারা করে এলো। এসবই তো বাইরে থেকে আরোপ, প্রাণিপোশাকে মানবিক আড়াল, প্রকৃতির সুন্দর-অসুন্দরকে সভ্যতার সুন্দরে-অসুন্দরে প্রকাশ করা। শিল্প চেতনার ক্রম পরিশীলনে, সংস্কৃতিচেতনার ক্রমপ্রকাশে এই সব আবরণ আভরণ তৈরি হয়েছে, চলেও আসছে। এসব অনিবার্যও বটে আবশ্যিকও বটে। কিন্তু মুখোশ? ছদ্মবেশ? সেখানেও তো দেখি মানুষ তার শিল্প সংস্কৃতির প্রকাশে-উপস্থাপনায় মুখোশকে ব্যবহার করছে — ছদ্মবেশকে মনোরঞ্জক করে তুলছে — বহুরূপী উপস্থাপনায়।

এখানে এসেই মনে হল, উত্তরটা পেয়ে গেলাম। উদ্দেশ্যটাই আসল, মাধ্যমটা নয়। মানুষ মানুষকে ধোঁকা দেয়, বোকা বানায়, শোষণ করে, দুস্থ বানায়, স্বার্থসিদ্ধির কারণে প্রতারণা করে, ক্ষমতার অধিকার চিরস্থায়ী করতে অপরকে চির-অক্ষম করে রাখতে চায়। নিজেরা আরো ঝলমলে জীবন ভোগ করতে অনেককেই অজ্ঞতার-নিরক্ষরতার অন্ধকারে ঠেলে দিতে চায়, শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে আইনের ধারাভাষ্যে ফাঁকফোঁকর রেখে দেয়, প্রশাসনে অপশাসনের বীজ প্রবেশ করে, বিচারের নামে প্রার্থী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এইসব কাজ করতে, এই সব উদ্দেশ্য — ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মুখোশের দরকার হয়। গরিবদের জন্যেই যে সব কিছু, জনগণের জন্যেই যে যাবতীয় সমাজ-সরকার-রাষ্ট্রের সবকিছু এটা বোঝানোর জন্যেই মুখোশ। বোকা বানানোর জন্যেই মুখোশ, সমস্যাকে ঠেকিয়ে রাখা অথবা অন্যদিকে চালিত করার জন্যেই, তাইতারই করার জন্যেই মুখোশ। তাই আইনের মুখোশ, ন্যায়ের মুখোশ, স্লোগানের মুখোশ এমন কি বিচারব্যবস্থারও মুখোশ আছে। গৃহে, সমাজে সরকারে রাষ্ট্রে। মুখোশের রঙ রূপ প্রকৃতি যুগে যুগে পালটায় এখনও পালটাচ্ছে। কারণ যাদের জন্যে মুখোশ তারা টের পেয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। উদ্ভাবনী মস্তিষ্কসকল নিয়োজিত আছে এই মুখোশ 'ব্যবসায়ে'। কিন্তু মস্তিষ্কে যতো বুদ্ধিই থাকুক দরিদ্র পীড়িত শোষিত মানুষের বোধ শক্তির কিন্তু অভাব নেই — তারা প্রত্যক্ষ অনুভবে মুখোশকেও যেমন টের পায়, মুখোশের পিছনের মুখটাকেও তেমনি দেখতে পায়। দেখতে পায় কিন্তু করণীয়

খুঁজে পায় না, পথ দেখতে পায় না। যদি কোনদিন পথ দেখতে পায় তাহলে মুখোশধারীদের দুর্দিন দূরে থাকবে না।

এই দুর্দিনের খতিয়ান দেখে নেওয়া যাক। যৌথ পরিবার। মুখোশের প্রধানা নেতাকে — কর্তাকে — স্বার্থরক্ষার আইন-প্রশাসন-বিচার ব্যবস্থার প্রয়োগে আগ্রহী করে তুলেছিল। করাপশন, নেপোটিজম এবং হাই হ্যান্ডেডনেস কর্তাকে বর্তমান আমলা-মন্ত্রীদের মতোই দুর্বিনীত করে তুলেছিল। কর্তাদের হাতে পুলিশ থানা ছিল না। পরিবার তাই ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। যোগসূত্রহীন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। (কর্তা-পক্ষের উকিলরা অন্য কথা বলবে, অন্যের কারণ দেখাবে। তখন আমাদের বিনীত প্রস্তাব থাকবে 'প্রভার' পক্ষের — ছেলেমেয়েদের এবং বৌদের পক্ষের উকিলের কথাগুলোও শোনা হোক। শুধু পশ্চিমকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কেবল মাত্র আধুনিক শিক্ষাকে দায়ী করে লাভ কি? ক্ষমতার কেন্দ্রায়ণ যে ক্ষমতার কেন্দ্রকেই ভিতর থেকে নষ্ট করে দেয় — এ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপটস এ্যাবসলিউটলি — তা তো আর অস্বীকার করা যায় না!)

তার পরে সমাজকে দেখুন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত তর্কালঙ্কার তর্কচূড়ামণিতে মিলে সমাজের কি দুঃসহ হাল করেছিল সেও আমাদের অজানা নয়। তাদের হাতে যদি ধোপা-নাপিত ছাড়া পুলিশ-মিলিটারি থাকত তাহলে তারাই কি তাদের অধিকার-ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হাতছাড়া হতে দিত? সামন্ততন্ত্র-জমিদারতন্ত্র মার খেল কেন? তাদের হাতে লাঠিয়াল ছিল, ভারতীয় দণ্ডবিধির যাবতীয় দণ্ডযোগ্য অপরাধই তারা নির্বাধে ঘটিয়ে যেতে পারত। কিন্তু চলল না। কারণ বন্দুকের বারুদ, লাঠির আঘাতের চাইতে অধিক কার্যকর। অর্থাৎ ওদের হাতে পুলিশ ছিল না।

এবারে সরকার এবং রাষ্ট্রকে দেখুন। ক্ষমতার মুখোশের আড়ালে — পুলিশের বন্দুকের আড়ালে — স্বার্থসিদ্ধির মেলা বসে গেছে। শক্তির চাইতে শক্তিধর কি? অধিকতর শক্তি নয় কি? পুলিশের তুলনায় অধিকতর শক্তির কেউ এলে এই বর্তমানের মুখোশধারী স্বার্থমেলার অবসান নিশ্চিত। সেই শক্তিধর কি? কে?

ভালিয়ানওয়ালাবাগ ব্যর্থ, তিয়েনানমেন ধূলিসাৎ। কিন্তু মিথ্যা কি? বার্লিনের দেওয়াল? কসেসকু? ইউ এস এস আর? পুলিশে-মিলিটারিতে কি হল সেখানে? বলতে পারেন ভবিষ্যৎ এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু বর্তমানটা? আর, কোন ভবিষ্যৎ কবে প্রতিষ্ঠিত বলে আগেই জানা যায়? ভবিষ্যৎ অপ্রতিষ্ঠ বলেই তার নাম ভবিষ্যৎ, অ-দৃষ্ট, অ-দৃশ্য। কেবলমাত্র কল্পিত। জীবনের নব নব অভ্যুদয়।

ছেলে-মেয়ে-বৌরা ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছে যৌথ পরিবার — কর্তার অ-ন্যায় অ-বিচার, প্রিয়াপোষণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে সেই পারিবারিক যুদ্ধে পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সমাজের নেতৃত্বে ধৃষ্ট নির্বুদ্ধিতা, মাথাভারি-টিকি-ধারীদের ক্ষমতা লোলুপতা যথেচ্ছ অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সমাজস্থ লোকেরা বিদ্রোহের মশাল জ্বেলে সেই ব্যবস্থাটাকেই পুড়িয়ে দিয়েছে। (ধর্মপ্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোথাও কোথাওও তা যে এখনও আছে, আবার কোথাওও তাকে যে আরবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে তা মানুষের পক্ষে অশেষ দুর্ভোগের কারণ। সময় কোন মুখোশকেই ছাড়বেনা, ছিঁড়ে দেবে। দি মুখোশ ইজ ডেড, লঙ লিভ দি মুখোশ!)

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রমিক শক্তি ক্রমে ফুঁসে উঠছে বারে বারেই। কিন্তু মুখোশধারী নেতারা এবং লাঠি বন্দুকধারী পুলিশরা উদ্বৃত্ত-মুনাফার কেন্দ্রায়ণে মদত দিচ্ছে। শ্রমিকরা জানে বোঝে। ওদের শক্তি এখনও সংহত, একাট্টা হতে পারে নি। বিধ্বংসী তাণ্ডবের অপেক্ষায়

মুখোশধারীরা আয়েসালিরির শীর্ষে বসে আছে মাত্র। মুখোশের নিপুণ কুশল ধোকাবাজীতে দীর্ঘদিন সেই সুপ্ত আচরণ চুপ করে থাকবে কি?

আর কৃষি শ্রমিকরা? দেশের অধিকাংশ শ্রমিককে 'কৃষক' বলে বিচ্ছিন্ন করে রাখা আছে শিল্প শ্রমিকদের থেকে। (এমন কি নিম্নবর্গে পুলিশসহ অন্যান্য শ্রমজীবী জনতা থেকে। এটাই মুখোশের — নেতৃত্বের — কৌশল।) আইন-প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থার সুনিপুণ প্রয়োগে মুখোশধারীরা ছড়িয়ে আছে এই ত্রিবিধ শ্রমজীবী জনতার এলাকায় - নেতৃত্বের নির্বেদিতপ্রাণ মুখোশগুলো এরাই। বিভেদ। শাসন। সবাই, সব নেতাই কালনেমী। নেতারা সকলেরই বন্ধু। সকলেই করজোড়ে বলছে — এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও। বন্ধুরা বোঝা নামানোর ট্রাজিক্যাল দম্ভস্পর্শে বোঝাকে বাড়িয়েই চলেছে।

মধ্যসত্ত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নির্বোধ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বাঘের মায়েরা — নেতার বৈঠকখানায় বসার অধিকারী। উর্ধ্বমার্গে পৌঁছনোর অভিলাষী। তাই এদের হতমশক্তি অসীম। আপনপর বোধহীন সভাতার কাণ্ডারীরা আপনদের ত্যাগ করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে — তাই বলে ডাক ছাড়ি গলা দেন ছিঁড়ে — পরদের গৃহাঙ্গনে প্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমাণ। ক্রমশই উৎস থেকে উৎপাটিত নাগরিক হবে নেতাদের জলসেচনে সজীব এই মধ্যবিত্ত কবে ঘরে ফিরবে? সেদিন?

ছিধারার মিলন হলে প্লাবন অনিবার্য। কৃষিধারা শিল্পশ্রমিক ধারা এবং এই অন্যান্য জনমজুরের ধারা। পুলিশ কি রোবট? সংসার নেই? সন্তান-সন্ততি? ঘুষের পয়সায় ক্ষমতার নেশায় কতোজনকে কতোদিন ধরে রাখা যাবে?

তাছাড়া নেতাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তরকলহ নেই? ক্ষমতার এবং সম্পদের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কাক-চিল-শকুনের কামড়াকামড়ি?

সামনেই বিস্ফোরণ। অবধারিত। মুখোশ ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যাবে নিজেদেরই টানাটানি কামড়া-কামড়িতে। মধ্যবিত্ত, হতাশ, অবদমিত, প্রতিবাদী, মধ্যবিত্ত ঘুরে দাঁড়াবে। ঘুরে দাঁড়াবে? তাহলেই টিয়েনানমেন, রেড-স্কোয়ার, নর্মদা ভ্যালি। তিয়েনানওয়ালাবাগ আর সম্ভব হবে কি? কালাচারাল রিভার্সিফিকেশন ঘটিয়ে কয়েক লক্ষ দেশবাসীকে ইতিহাস করে দেওয়া যাবে। হয়তো যাবে। কিন্তু শতাব্দীর শেষ দশকে সেই পদ্ধতি মুখোশকে কতোটা আটুট রাখতে পারবে? বরং ইনভেস্টমেন্ট হবে না তো?

তাই সময় থাকতে মুখোশ খুলে মুখগুলো দেখে নিলে সকলেরই মঙ্গল। এক বীরাপ্পানকে বাঁচাতে শত শত নাগরিককে বলি দিতে হবে? লালা-রসিদ-টাইগারকে বাঁচাতে?

জমির ফসল যদি ক্ষুধা মেটাতে পারে তাহলে দেশের ফসল — জনগণ কি সমাজ-সভ্যতার, সরকার রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়? কতোটা জমি চাই মৃত্যুর পর? কতো মন কাঠ?

সুতরাং শিক্ষাকে সকলের জন্যেই প্রাপ্য করা হোক, আর সমাজের সব কাজে জনগণকে অংশীদার করে নিতে ডিসেন্ট্রালাইজ করে সকলকেই ইনভলভ করে দেওয়া হোক। এটাই বাঁচার পথ। শতকরা দুইভাগ পেশী শক্তি অপরাধী মানসিকতার ভিতে নেতৃত্বের পিরামিডকে দাঁড় করিয়ে আট ভাগের রক্তচোষণে না নির্ভর করে শতকরা নব্বই ভাগের পিরামিড ভিতে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা হোক। প্রশাসন ও শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ এটা করতে পারে। জনগণের যোগে, ইনভলভমেন্টে গণতন্ত্র সঠিক পথ ধরুক, জনতার ঘাড়ে চেপে নয়।